যাবজ্জীবন

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬০

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

কেন এ বই লেখা ?

অনেক কাজকর্ম'ই হিসেব ছাড়া আমার জীবনে। বহু কাজ ও অকাজ করতে করতে দিন কাটে, আর সে সব কাজের মধ্যে লেখার মতো অনেক কিছু অবশ্যই থাকে, আমি লিখি না। কেন না যাদের নিয়ে কাজ করেছি, তাদের লেখার বিষয়বস্তু করে তোলা যায় না সবসময়। লিখলে ওদের অপমান করা হতো।

একসময়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, অথচ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরেও মুক্তি পায়নি এমন মানুষদের প্রার্থনায় কিছু সাহায্যের চেষ্টা করি। এখন নাকি যাবজ্জীবন মানে ২০ বছর নয়, সত্যই আজীবন, এও শোনা কথা। সত্য কি না জানি না। বছর দুই আগেও এটা ছিল বিশ বছরের কারাদণ্ড। চোদ্দ বছর বাদে জেলকর্তৃপক্ষ এঁদের আচরণ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলে আইন মন্ত্রকে মুক্তি-সুপারিশ করতেন। সুপারিশের পরেও যাঁরা মুক্তি পাননি, তাঁরাই আমার কাছে যে ভাবে হোক, আবেদন জানান। আমি তাঁদের সপক্ষে আইনমন্ত্রকে তাড়া তাড়া তালিকা পাঠাতাম, এই পর্যন্ত। আমার দৌড় চেষ্টা চালানো অবধি।

আমার "লাইফার" বিষয়ক ধারণা ছিল অতীব অস্বচ্ছ। মুক্ত লাইফারদের কাছে জেনেছি, বিশ বছরকে চোদ্দ বছরে নামাবার অনেক নিয়ম আছে। যথা, স্বেচ্ছায় বারবার রক্তদান, জেলে সাপ বেরোলে সাপ মারা, কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার জন্য কাজ করা, এমন সব। এ ছাড়াও কারা-কাহিনীর অনেক রহস্য। তা কোন লাইফার লিখলে লিখবেন, আমি শুনে গেছি মাত্র। যে সব ব্যাপার কারাব্যবস্থায় কায়েমি হয়ে ঢুকে গেছে, তার সবটা জানতে হলে যথেষ্ট সময় দিতে হয়, যা সম্ভব নয়।

আমার লাইফারদের কাহিনীগুলি ওদের জীবন নিয়ে নয়। অন্তত সীতেশ ও আবিরের কাহিনী বিষয়ে এ কথা সত্য। আন্নার কাহিনী অবশ্যই অন্যরকম।

আমার ঘরে বসেই লাইফারদের বিষয়ে একটি কথা বারবার জেনেছি। মধ্যবিত্ত ও অন্য শ্রেণীর (উচ্চবিত্ত নন। উচ্চবিত্তদের জন্য সবাই আছেন, যাঁরা ক্ষমতাশালী) মানুষদের আপনজনেরা, এঁদের মুক্তির জন্য কি ব্যাকুল! একটি কিশোর মুসলিম, ঝুলঝাড়ু পালকের ঝাড়ন বিক্রি করত, ওর বাবার জন্য হাহাকার করত। তার পিতা মুক্ত না হওয়া অবধি অনেক-বার অনেক ঝুলঝাড়ু কিনেছি, বিলি করেছি, ইত্যাদি। অধিকাংশ জনই আপনজনদের মুক্তির জন্য ব্যাকুল, এমনই দেখেছি।

যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞা খাটছেন, প্যারোলে বেরিয়েছেন, আবারও ঢুকেছেন, এমনও দেখেছি।

আর বেরিয়ে এসে ফিরে গেছেন পুরনো মেহনতী জীবনে, বা নতুন কোন জীবিকা খুঁজে নিয়েছেন, এমন মানুষদেরও দেখেছি।

আমার সীতেশ ও আবিরের কাহিনী একেবারে অন্য জগতের। যারা নিম্নমধ্যবিত্ত (আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বার্ষিক উপার্জন নাকি অন্যরকম), যাদের পুরনো পাড়াতেই বাস করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে তাদের আপনজনদেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হয়। অরাজনীতিক এরা, হত্যাপরাধের পিছনে কোন আদর্শবাদিকতার প্রেরণা নেই, অতএব তেমন শক্তসমর্থও নয়,—লাইফার-এর প্রত্যাবর্তন এদের আপনজনদের জীবনে অনেক প্রশ্ন তোলে। মূল্যবোধ ও স্নেহমমতা বলে, সন্তান / ভাই / দাদা / স্বামী, একে বর্জন করতে পারো না। কিন্তু তাকে নিয়ে বসবাস করতে পারি, তাও যেন সহজ হয় না। এমন কয়েকটি মানুষকে জানি, যারা তাদের আপনজনদের মুক্তি দিয়ে অন্য নামে অন্য পরিচয়ে অন্যত্র চলে গেছে। জন্মান্তরিত হতে হয়েছে এদের। যে সময়ে এরা জেলে গিয়েছিল, আর যে সময়ে ফিরে এল, তার মধ্যে সমাজ অসম্ভব বদলে গেছে। অথচ সে যথেষ্ট বদলে যায়নি, কেন না বহির্জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্নই ছিল।

কোনদিন হয়তো এমন সরলরৈখিক কাহিনী নয়, খুবই বহুস্তরীয় কাহিনীর কথাও কোন লেখক ভাববেন, যাতে হত্যাকারী, হত্যাকারীর পরিবার, নিহত ব্যক্তি, নিহতজনের পরিবার, এদের চিন্তাও থাকবে। বর্তমান কাহিনীগুলির নিহতজনেরা "নিধনযোগ্য" বলা চলে, অবশ্য টাপু তা নয়। হত্যা-ঘাতক-কে-কেন ইত্যাদি নিয়ে আমি একদা অনেক লিখেছি। "ঘাতক" সে পর্যায়ে সবচেয়ে সত্যের কাছাকাছি এক রচনা। তার শেষ লাইন ছিল, "প্রকৃত ঘাতক কখনো হাতে ছুরি ধরে না।" আজকের সমাজে নিয়ন্তারা সেই প্রকৃত ঘাতক। তাদের কথা কিছু লিখেছি, বিষয়বস্তুটি থেকে মন উঠে গেছে, ফিরে আসবে কিনা জানি না।

এর মধ্যে আন্নার কাহিনী একেবারে অন্য বৃত্তের। সীতেশ বা আবিরের নয়, অন্য শ্রেণীর মেয়ে। কাহিনীটির পিছনের ঘটনা কাল্পনিক, না সত্য, তা বলার প্রয়োজন দেখি না। এদের সমাজে বালিকারা মাংসের কারণে প্রত্যহ কেনাবেচা হয়, অনেকেই জানেন। এখন তো প্রথম বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্বে বালিকা-বালক যৌনকর্মী শিল্প প্রোমোট করছে। কিছুটা রাখঢাক ছিল, সে সব উড়িয়ে দিয়ে যৌন কর্মকে বৃহৎ শিল্পে পরিণত করার ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি। এশিয়ার কিছু দেশে এ ব্যবসা জেঁকে বসেছে বলেই জানি। ভারত কি বাঁচবে, না "সেক্স-ট্যুরিজ্‌ম"-এর ফাঁদে

পা দেবে, খাল কেটে আনবে কুমির, তা আমাদেরই ভাবতে হবে। নাবালক-নাবালিকা যৌনকর্মী-ব্যবসায় আইনত নিষিদ্ধ ও দণ্ডযোগ্যই থাকবে মনে করি। আইনটুকু আছে বলে খানিক বাঁচোয়া। আইনকে তুচ্ছ করেই অন্ধকার জগতের এ কাজ চলে। জনমত ও জনসংগঠন সক্রিয় না হলে আইনের ভরসায় থাকলে এটা কমানো যাবে না। এ সবের কাজের নিয়ন্তারা "প্রকৃত ও পেশাদার পাপী", তাদের দেখা যায় না। বালকরা কি মধ্য প্রাচ্যে যায়? বালিকারা এ উপমহাদেশেই কি এখানে সেখানে? আমরা উত্তর খুঁজব, না খুঁজব না? এর চেয়ে বেশি আমার কিছু বলার নেই।

প্রকাশক চেয়েছিলেন, তিনটি কাহিনীকে গ্রথন করে দিই। সেটা করা গেল না। কাহিনীগুলির মধ্যে গ্রথনসূত্র একটাই! মুক্ত জীবন থেকে বন্দী জীবন বলব না। আন্নাদের জীবন শৃঙ্খলিত, মধ্যবিত্ত জীবন অন্যভাবে নিজ মূল্যবোধের জগতে থাকে। এ মূল্যবোধের চরিত্র নিরূপণ আমার উদ্দেশ্য নয়। মানবিক মূল্যবোধ অবশ্যই প্রার্থিত। তা আছে যেখানে, সেখানেই আছে জীবনের লক্ষণ। গ্রথনসূত্র একটাই. সীতেশ জেল থেকে বেরোবার আগেই বুঝেছিল, তার ফিরে আসা, পরিবারের পক্ষে খুব স্বস্তির হবে না। তাকে বাদ দিয়েই তাই, বোন ও স্ত্রী যে-যার জীবন গড়ে নিয়েছে। মা-বাবার পক্ষেও তার উপস্থিতি হয়তো শেষ অবধি ওঁদের জীবনের অভ্যস্ত প্যাটার্ন ভেঙে দেবে। তাই সে ফেরার ঝুঁকিটা নিলই না। এই না-ফেরাটা বাবা-মা কী ভাবে নেবেন, তা সে জানে না।

আবির ফিরে এসে বুঝল, তার প্রতি ভালবাসা ঘরেও আছে, বাইরেও আছে। তবে সে যদি থেকে যায় তার পরিবার অভ্যস্ত নিয়ম ভেঙে নতুন এক জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য। আবির চলে যায় ঠিকই, কিন্তু অনেক প্রাপ্তির অনুভূতি নিয়ে যায়!

আন্না আগে লাইফার ছিল না, এখন যে লাইফার হয়ে যেতে পারে. কিন্তু তার কাছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইত্যাদি অনেক তুচ্ছ। সে শাস্তি দিতে চেয়েছিল, তাই সে দেয়। মেয়েদের পেলে সে আর একটা জীবন গড়ে নিত, তা হল না। কারাগারে যায়, কিন্তু সে মনে করে না সে অপরাধী। সেই বিচারক, দণ্ডদাতাও বটে।

কোথায় গ্রথনসূত্র, তা পাঠকরা বুঝবেন।

মহাশ্বেতা দেবী

চলে যায়

॥ বাবা ॥

আমি, হিতেশ, সকালেই বুঝতে পারলাম, কাল রাতে যে ঘুমোইনি, তা প্রতিমা ধরে ফেলেছে।

ধরে ফেলবেই, প্রতিমাও তো ঘুমোয়নি কাল। সকালে উঠে ও বলল, আরও খানিক শুয়ে থাকো। এখনই না উঠলেও চলবে।

আগে বলত, রিটায়ার করেছ, সাত সকালে উঠে তো আর তাড়া করতে হবে না।

তখন সত্যি ছ'টায় উঠে পড়তাম।

একফালি জমিতে সযত্নে লাগানো আমার কামিনী, গন্ধরাজ, জবা, নয়নতারার সঙ্গে কথা বলবার সময় তো ভোরবেলা। তখনও বেদেপাড়ায় (সুন্দর বসু সরণি নামটা অভ্যেস হয়নি আজও) ভোরবেলাটা ভোরের মতো ছিল। মাঠ ছিল, পুকুর ছিল, জনবসতি কম ছিল। এ কবেকার কথা। আমার ছেলেমেয়েরাই ছোট ছোট ছিল।

ভোরে উঠে গাছদের পরিচর্যা করতাম, জল দিতাম, গোড়ার মাটি আলগা করে দিতাম। বাগান বিষয়ে খুব কড়া ছিলাম। কেউ হাত দেবে না। কেউ ফুল ছিঁড়বে না, খুব সাবধান।

তারপর এক কাপ চা খেতাম, কাগজটার হেডলাইনে চোখ বুলিয়ে রেখে দিতাম।

সন্ধ্যায় ফিরে তারিয়ে তারিয়ে পড়তাম।

সকালে চা খেয়ে যেতাম বাজারে। রেললাইনের ওপারে বাজার বসত। সেখান থেকেই কিনে-কেটে আনতাম। ততক্ষণে ছেলেমেয়ে পড়তে বসে গেছে। বাজার নামিয়ে, জামাটা ছেড়ে টিউবওয়েল থেকে খাবার আর রান্নার জলটা তুলে দিতাম আমি। প্রতিমার কষ্ট হতো খুব। কল ঝাঁকাতে।

খুব, খুব নজর থাকত আমার। রবিবার বাথরুম ঘষে ঘষে ধোব, উঠোনে জমতে দেব না শ্যাওলা। বাড়িটা যেন আমার। শুধু আমার দায়িত্ব।

আমার বউ, ছেলেমেয়ে থাকবে, ওরাও তো আমারই। সবই যখন আমার, আমাকেই তো দেখতে হবে।

শোভনবাবু আমার গার্জেন ছিল তখন।

সে গর্ব করে বাড়িটা দেখাত লোকজনকে। দেখ, হিতেশের বাড়ি দেখ। যেন ঝকঝক করছে।

তারপর স্নান করে খেয়ে দেয়ে অফিস রওনা হতাম। প্রতিমা রোজই বলত, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী।

প্রতিমার স্কুলের চাকরি তো ছিল। মেয়েদের স্কুলের কাজ।

চোখ বুজলে আমি তখনকার বেদেপাড়া দেখতে পাই। চোখ খুললেই দেখি মাঠ নেই, জল নেই, আছে শুধু বাড়ির জঙ্গল।

চোখ বুজলে সব দেখতে পাই।

আমি আর শোভনবাবু। আপিসে এ-ওকে দাদা বলত, শোভনবাবু শোভনবাবুই থেকে যায়। কিছুদিন পরেই জানলাম, 'বাবু' হল মধ্যনাম, পদবী ও'র মিত্র।

অর্থাৎ উনি শোভনবাবু মিত্র।

শোভনবাবু হাত চিতিয়ে বলত, কি করবে? নিয়তি কেন বাধ্যতে। বংশের ধারা হল মধ্যনাম 'বাবু' অর্থাৎ 'ব' দিয়ে কি হয় বল? প্রপিতামহরা ছিলেন 'বল্লভ', পিতামহরা হলেন 'বিহারী'—গুষ্টি তো রাবণের গুষ্টি। ফলে নামের অকুলান···বুঝলে ভায়ারা?

—আমার জ্যাঠা ছিলেন ভাবুক মানুষ। কবিপ্রকৃতি যাকে বলে। বিয়ের পদ্য লিখতেন···কেউ মরে গেলে শোকসংগীত লিখতেন। সে সব হারিয়ে গেছে কবে।

—তা আমার জ্যাঠামশাই তখন আমাদের লাইনে। মানে আমার ঠাকুদ্দার লাইনে সবার মাথা। তিনিই বললেন বল্লভ হল, বিহারী হল, এখন সব 'বাবু' হবে। তাতেই গুষ্টি জুড়ে অমলবাবু মিত্র, বিমলবাবু মিত্র, শোভনবাবু মিত্র।

আমরা হাসতাম।

—হাসচ? হাসো। তবে নামের রীতি তো পালটাচ্ছে দিনে দিনে। আমাদের ছেলেপিলে কি নামের সাথে 'বাবু' রাখবে? রাখবে না।

রাখেও নি। শোভনবাবুর ছেলে তপন, আর নাতি না কি গৌতম।

মানুষটি বড় সামাজিক, বড় পরোপকারী ছিলেন বলতে হবে। আপিসের দারোয়ান, চাপরাশী, ক্যান্টিনের লোকজন, এদের বিপদে বা মেয়ের বিয়েতে এক টাকা করে চাঁদা তুলতেন। বলতেন, সব কিছুতে ফিলসফি আছে রে ভাই। ১৯৬০ সালে দশ টাকা চাইলে ট্যাকে টান পড়বে। একটা টাকা দেয়া যায়।

আপিসে কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, এসব দায়দায়িত্ব এগিয়ে পড়ে গায়ে নিতেন। সর্বদা হাসি মুখ, পানের ডিবে বোঝাই ছোট ছোট খিলি।

বলতাম, আসেন সেই বালি থেকে। বউদি কখন পান সাজেন।

—কেন, কাকভোরে উঠে?

—রান্নাবান্না করেন কখন?

—কেন কাকভোরে উঠে?

—ভাল বউদি পেয়েছেন।

—আমাদের সব ঘরে ঘরে রে ভাই। আমার গিন্নি হলেন আমার নিজের মেজবউদির মাসতুত বোন। ওদেরও বৃহৎ পরিবার। এ বাজারেও অতিথি খেয়ে যায়। বাড়িতে দুবেলা চল্লিশ খানা পাতা পড়ে। বিয়ে করতে হলে এমন পরিবারই দেখতে হয় রে ভাই। বড় পরিবারের মেয়ে হলে, পাঁচজনকে নিয়ে চলতে জানে, মনটা বড় হয়।

অবনী ছিল ঠোঁটকাটা। বলত, এমন দিন থাকবে না শোভনবাবু। বউরা হাঁড়ি ঠেলবে, স্বামীরা ঘুরে বেড়াবে, সে আর হবে না।

—এখনও তো হচ্ছে। রান্নার কথা যদি বলো, আমার মেয়েরা খুব কাজের, মাকে সাহায্যও করে। কিন্তু উনি হেঁসেল ছাড়বেন না।

এই শোভনবাবুই আমাকে বেদেপাড়া নিয়ে আসেন। এখনও মনে আছে, বণ্ডেল গেট পেরিয়ে পুবমুখো হাঁটছি আর হাঁটছি।

বড় বড় বিল, বড় বড় মাঠ, গাছপালা অনেক। আমি বলছি, দেখতে তো ভালো লাগছে বেশ। তবে এসব জায়গা তো একেবারে···

—দেখে নেবেন, দশ বছরে পালটে যাবে। কলকাতা কি কলকাতায় থাকবে মশাই? পশ্চিমে গঙ্গা, তাই পুবে, দক্ষিণে, উত্তরে ছড়াবে। বাড়ি না করুন, কিনে ফেলে রাখুন না কেন। বোঁদেল গেট পনেরো মিনিটের রাস্তা। এ জায়গার দাম কি হবে দেখে নেবেন।

—বলছেন?

—বলছি। পূর্ব পাকিস্তানে সম্পত্তি বিনিময় করে আপনার শেয়ার তো পেয়েছেন কিছু। চাকরি খারাপ করেন না। জমি কেনা, সোনা কেনার চেয়ে লাভজনক হবে দেখবেন।

—কিন্তু···

—বউমাকে দেখিয়ে নিয়ে যান। তিনি আপনার চেয়ে অনেক বুদ্ধি ধরেন। হবে না? বাপ রে। গ্র্যাজুয়েট হওয়া কি সোজা কথা?

—এখন তা নয়। আমাদের আপিসেই তো কত মেয়ে কাজ করছে। কে গ্র্যাজুয়েট নয়?

—সে বটে। কিন্তু ওনাকে দেখান।

গ্র্যাজুয়েট শব্দের ওপর শোভনবাবুর খুব দুর্বলতা ছিল। কেন, তা জানি না। প্রতিমা চা করে দিলেও বলতেন, গ্র্যাজুয়েট মেয়ের হাতের চা আলাদা স্বাদের।

এমন কিছু ক্ষ্যাপামি তো ছিলই।

যাবার সময়ে দুটো ট্রাম ছেড়ে তিন নম্বর ট্রামে উঠতেন। কেন, তা জানি না।

জীবনবীমা খুব অপছন্দ ছিল। বীমা করালেই নাকি মানুষ মরে যায়।

'পানাগড়' নাম শুনলেই বলতেন, না না, পানাগড় খুব নচ্ছার জায়গা।

কেন বলতেন, জানতাম না।

এই শোভনবাবুই প্রতিমাকে নিয়ে এলেন। প্রতিমা তো জায়গা দেখেই মন ঠিক করে ফেলল। বলল, ছেলেমেয়ে হাত-পা মেলে খেলতে পারবে। দূরে কোথায় এমন? পনের মিনিটেই রেল ক্রসিং পেরিয়ে যেতে পারছ?

—বাড়ি এখনই করে মানুষ?

—কখন করে? শেষ বয়সে? দেখলাম তো আমার বাবাকে। শেষ বয়সে রিটায়ার করার পর বাড়ি করলেন। দশ বছরও কাটল না। আর, ছেলে মেয়ের সঙ্গে অনেক বছর কাটানো, সে ভাগ্যের কথা বলতে হয়।

—ওরা পড়বে কোথায়?

—বাঃ। স্কুল তো আছেই। কিছু লোক তো ভদ্রগোছের বাড়িও করেছেন। তাঁরা ছেলেমেয়েও পড়াচ্ছেন, ডাক্তারবদ্যিও পাচ্ছেন নিশ্চয়।

শোভবনবাবুর জন্যে তিন হাজার টাকা কাঠায় পাঁচ কাঠা জমি কেনা হয়।

বাড়িটা শোভনবাবু আর প্রতিমাই করিয়েছিল। দোতলার ভিত হয়। নিচে চারটে আর ওপরে চারটে ঘরের প্ল্যান হয়। তবে একটা ঘর, কল ও বাথরুম, রান্নাঘর হতেই আমরা চলে আসি।

বাকিটাতে হাত দিলাম পকেট বুঝে। প্রতিমা সংস্কৃত অনার্সের জোরে বিরাজমোহিনী বিদ্যালয়ে কাজও পেয়ে গেল। দুজনে মিলে···ধীরে ধীরে··· কিন্তু প্রতিমা আর দোতলা তুলতেই দেয়নি।

আমার বাড়ির ভিত দোতলার।

বাড়িটা একতলা।

প্রতিমা বলেছিল, আর না, থাকুক। ছেলেরা পারলে করে নেবে···যদি পারে···আজকাল ছেলেরা তো! কলকাতাতেই থাকবে, এ কথা বলা যায় না

সীতেশ, সীতেশ, সবকিছুর মূলেই সীতেশ। ছয়বছর রিটায়ার করেছি আমি। রিটায়ার করার পর মল্লিক কনস্ট্রাকটর অ্যান্ড ল্যান্ড ডেভলপারে অ্যাকাউন্ট দেখব এ আমার ও সুষেণ মল্লিকের কথা হয়েই গিয়েছিল। সুষেণ

বাবু বলেছিলেন, আপনারাও মল্লিক, আমারও। হলে বা বাঙাল, স্বজাতি তো।

সীতেশ বলল, ওখানে কাজ করবে? কেন?

—রিটায়ার করে কি বসে থাকব?

—কেন জীবনটা উপভোগ করো। বেড়াও দেশ দেখ, লাইব্রেরি যাও, পড়াশোনা করো···

নীতেশ বলেছিল, সেটা বাবা পারবে না দাদা।

—যা বাবা। ভালো কথা বললাম···

—সংসার চালাবে, গীতির বিয়ে দেবে...

—আমাকে শোনাচ্ছিস কথাটা?

না না, আমি শোনাবার কে? আমি কি হব। বড় জোর কেরানী। বিয়ে করলেই ল্যাজে গোবরে ··বাবা মাকে তো নিজেদের ব্যাঙের আধুলি ভাঙিয়েই খেতে হবে।

—সেই এক কথা।

সীতেশ বেরিয়ে যেত।

সীতেশ সংসারের কথা ভাবত না। বি. এস. সি. পাশ করে কোনও কাজের চেষ্টা করবে না। বাড়ির কোনও দায়িত্ব নেবে না, এ তো কল্পনাও করিনি।

নীতেশ আর গীতি অন্যরকম। ওরা নিজেরাই চালিয়েছে।

আমার ও প্রতিমার সম্পর্ক খুব নিকট, খুবই। বাবা ও মার সম্পর্ক ভালো থাকলে ছেলেমেয়েরা মানসিকভাবে ভরসা পায়, সুস্থ ও স্বাভাবিক হয় তারা, এ কথা সর্বদা শুনছি, কাগজেও দেখতে পাই।

সমাজেও কি দেখি না?

নীতেশ বা গীতি যে দূরে সরে গেল, সে তো সেই ভয়ংকর দিনের পরে।

আমরা তেমন দম্পতি যে সাধারণ কর্তব্যগুলো করে যাই, সামান্যে খুশি হই, ছেলে মেয়েকে 'বাবা' বাছা' অথবা 'সুইটি পাই' বলে আদর দেখানো যায়, এটা জানিও নি, দেখাইও নি।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক শোভন ও সুন্দর। পাড়াপ্রতিবেশী বরাবর বলেছে, এই একটা বাড়ি, যে বাড়ি থেকে জোর গলায় চেঁচামেচি শুনিনি।

আমরা তো খুব বড় আশা করিনি।

ছেলেরা, মেয়ে, ওদের পড়াচ্ছি। পাশ করে কাজকর্ম করবে, বিয়ে হবে সংসার হবে।

বলা যায় উচ্চাশা ছিল না।

আমি সরকারী কেরানী, প্রতিমা শিক্ষিকা। রবিবার মাংস রান্না হতো, সেটা

একটা আনন্দের দিন। মাঝে মাঝে বাংলা ছবি দেখা, সেও ঘটনা।

সপরিবারে বিদেশ ভ্রমণ কি করিনি? করেছি। পুরী গেছি একবার, দীঘা বার তিনেক, শান্তিনিকেতনও ঘুরে এসেছি।

প্রতিমা ওর স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে একবার হাজারীবাগও ঘুরে এসেছে।

নীতু আর গীতুকে স্কুল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম, বা রাঁচি—নেতারহাট যেতেও মানা করিনি কখনও।

এটা সত্যি, যে বড়বেশি পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতাম আমরা। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব আমরা করতাম না। করার দরকারও তো মনে করিনি।

খুব সরলরেখ মধ্যবিত্ত জীবন। যেমন জীবন গিয়ে মেলে সন্তানদের অনুরূপ মধ্যবিত্ত জীবনে।

তিন ছেলে মেয়ে বড় হতে না হতে পেয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র ঘর।

আমার ভায়রাভাই রমাপতি বরাবর বলেছে, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। নিজেরা দুটো ঘরে থাকতেন, দুটো ভাড়া দিতেন, পয়সা তো আসত।

প্রতিমা বলত, সে আপনারা দেখাচ্ছেন বটে। একটাই মেয়ে, নিজে বড় চাকরি করেন—দেড়খানা ঘরে গাদাগাদি করে থাকবেন, বাকি ঘরে ভাড়াটে, থাকেন কি করে তাই ভাবি।

—মাস গেলে আড়াই শো টাকা পাই।

—আমি একদিনও পারব না।

রমাপতি কোলইণ্ডিয়াতে টাইপিস্ট তারপরও জীবনবীমা করাত লোককে। তারপর ধরল চা বেচাকেনা। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কবে—এখনও টাকার পিছনে দৌড়ায়।

অনিমাকেও তো সুখীই দেখি, মানে শেষ যখন দেখেছি।

রামায়ণে পিতার কারণে পুত্র নির্বাসনে গিয়েছিল এমন লেখা আছে।

কেমন করে বলব, কাকে বলব, পুত্রের কারণে আমি, প্রতিমা, নীতেশ, গীতি, কাজল, মল্লিকা, চৌদ্দ বছরের এক নিষ্পাপ কিশোর ঋষি, কি ভীষণ নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছি। কি শাস্তি আমাদের দিয়ে গেছে সীতেশ, কি পাপ বোধ আগাদের।

সে পাপ আমাদের কর্মফলে, ব্যবহার বা আচরণ ফলে সৃষ্ট নয়।

যা ঘটেছিল, সেটা পাপ কিনা তা জানি না বলব না। পাপ, অপরাধ,—সীতেশ তো রক্তমাখা হাত ধুচ্ছিল বাথরুমে, প্যাণ্ট ও জামা ছাড়ছিল···

অপরাধ? পাপ?

জানি, 'জানি' নরহত্যা পাপ,—দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রমাণ হলেই যাবজ্জীবন—ফাঁসি তো এ রাজ্যে হয় না বলতে গেলে।

এটাও জানি প্রমাণই সব। আর এটা তো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে সীতেশই সুষেণদের কনস্ট্রাকশন সাইটে ডেকে নিয়ে গিয়ে টাপুকে খুন করেছিল। শুধু অনেকগুলো হিসেব মেলাতে পারিনি।

টাপু সমাজবিরোধী ছিল, সবাই জানত। টাপু কণ্ট্রাকট নিয়ে কাজ করত। সুষেণ মল্লিক তার সহায়তা নিয়েই দূরে, বহুদূরে, বুঝি বা পুবপানে সূর্য ওঠার দিগবলয়ের কাছাকাছি যারা বহুবছর ঝোপড়ি নিবাসী,—যাদের জীবিকা তখনও বিদ্যমান কাজিয়া—বেদেপাড়া খাল থেকে মাছ ও ঝিনুক তোলা ও চুনারিদের কাছে ঝিনুক বেচা,—সেখান থেকে দুশো ষাটটি পরিবারকে উচ্ছেদ করেছিল। বাধা দিতে গিয়ে দু'চারটি লাশও নাকি পড়ে যায়।

'সূর্য ওঠার দিগবলয়' কথাটা কাব্য হয়ে গেল। সূর্য কোনখান থেকে ওঠে, তা কেউ দেখতে পায় না। বিস্মৃত অতীতে না কি, যখন এসব জায়গা বাঘের জঙ্গল, সে সময় এক সন্ন্যাসী এখানে ছিলেন, ধর্মঠাকুর পূজা করতেন। পুরাতন রেকর্ডে—এ আগ্রহটা কাজলের কাকা তারকবাবুর, যিনি 'পরগনার ইতিহাস' স্বখরচে ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন। আমি পড়েছি, সেজন্যই সন্ন্যাসীডাঙা ধর্মতলা মৌজার নাম পাওয়া যায়। তারকবাবুর বইয়ে এমন অনেক কিংবদন্তী পাওয়া যায়।

সেই সন্ন্যাসীর মৃত্যুসময় আসন্ন হলে 'তিনি এক এক পদক্ষেপে দশক্রোশ অতিক্রম করিতে করিতে পূর্বদিকে, সূর্যোদয়ের উৎস সন্ধানে গমন করেন।'

এ কিংবদন্তী বর্তমান সুন্দর বসু সরণির ১১/২/১—বি বাড়িতে বসে মনে হয় শৈশবের রূপকথা। আমি সজ্ঞানত বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চাই, পারি না। বর্তমান আমাকে গ্রাস করেছে। চোদ্দ বছর নির্বাসনে আছি, বড় অসহায়।

সেই জায়গা ও জমি এখন বিশাল এক কৃত্রিম সার উৎপাদক কারখানা। সুষেণ মল্লিকদের নয়। কোন এক জালোটার। কোন বিশাল কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সে সেইসব সার তৈরি করে যাচ্ছে। যার বিরুদ্ধে এখন অনেক লেখালেখি।

আমার ছেলে সীতেশ টাপুকে খুন করেছিল। তখনও জরুরি অবস্থা চলছিল, যখন সীতেশ টাপুদের সঙ্গে ভিড়ে যায়, অথবা সুষেণ মল্লিকের সঙ্গে।

সে তো জানিয়েই দিয়েছিল, আমাকে বলে লাভ নেই বাবা। তোমার মতো কেরানী হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

অবশ্য একথারও পুরাকথা আছে।

ওর জন্ম ১৯৫৬ সালে, স্বাধীনতা ওর চেয়ে নয় বছরের বড়। জন্ম পনেরই আগস্ট। এমন ছেলের নাম স্বদেশ বা স্বাধীন, বা স্বরাজ রাখতে পারিনি।

সীতেশ নাম দিয়েছিল প্রতিমা।

জরুরি অবস্থার বছরে ও গ্র্যাজুয়েট হয়। শোভনবাবু বললেন, কি দেখছ ভায়ারা? একটা বাড়িতে তিনটি গ্র্যাজুয়েট, আরও দুটো হবে। ঘরে দু'খানা দেওয়াল আলমারিতে কত বই। হিতেশ ভায়ার আবার ফুলের শখ আছে। ওদের বাড়িতে চা কখনও প্লেটে ছলকায় না, কাচের গেলাসে ডিমের গন্ধ থাকে না, পর্দায় হাত মোছে না কেউ। যাকে বলে কালচার বাড়ি।

তিন নম্বর গ্র্যাজুয়েট, বা স্নাতকটির নামও কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে লেখানো হয়। সীতেশ বলল, ফালতু!

—কেন?

—এক্সচেঞ্জের ডাক কবে আসবে বলে কে বসে থাকে? আমি পারব না।

অবুঝ, খুবই অবুঝ ছিল।

কিংবা যা আরও সত্য, সর্বদা রাগে জ্বলত।

- যাব না বাজার। থলি বইতে লজ্জা নেই, যদি তা থেকে ভালমন্দ জিনিস উঁকি মারে। ছোট মাছ আর কচু ঘেঁচু ইত্যাদি ইত্যাদি…পারব না।

মাঝে মাঝেই চেঁচাত, জ্বলত, এমন সব কথা বলত, যে আমাদের ধাঁধা লেগে যেত।

—কেন আমার আরও শার্ট প্যাণ্ট থাকবে না? যা আছে, তারই বা কোয়ালিটি কি।

—কেন সকালে বিকেলে হাতরুটি আর আলুচচ্চড়ি খাব?

- শরীর থাকে না প্রোটিন না খেলে।

প্রতিমা একদিন খেতে বসে বলল, সীতু! যেটুকু করি, তার বেশি সাধ্য নেই আমাদের। তুমি কাজ করো, টাকা আনো, নিজের পিছনে খরচ করো, —কিন্তু বাড়িতে এমন আবহাওয়া তৈরি কোর না। আমি আর তোমার বাবা খেটেখুটে আসি। আমাদের অসুবিধা হয়।

—হ্যাঁ · আমার উপস্থিতিই তোমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

—তুমি উলটো বুঝলে খুশি হও, বোঝো।

প্রতিমা গলা নিচু রেখেই বলেছিল। কি ভাবে বাড়ি করেছি, কিভাবে তোমাদের পড়িয়েছি…

—সে সকলেই করে মা।

—এর বেশি আমাদের সাধ্য নেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত…রাত করে ফিরত…ভাত বাড়া থাকত…

গীতি একদিন বলল, দাদাকে কিছু বোল না তোমরা। ও তবে চলেই যাবে।

প্রতিমা বলল, গেলে যাবে, কি করব।

—ও···টাপুর সঙ্গে··· খুব···

টাপু সীতেশদের চেয়ে সিনিয়ার। বাহাত্তরের গণটোকাটুকির বছরে বি. এ. পাশ করা ছেলে। শরীর চর্চা করত। ফুটবল ক্লাব ওর হাতে গড়া। ওদের বাড়িতে ছিল খোলার চাল, ওর বোনরা যেত আচার-জেলির কারখানায় কাজ করতে।

এই টাপুকেই সুষেণ মল্লিক কাছে টেনে নিল।

আজ ১৯৯৪ সালে, জমি হাতানো, পুকুর বোজানো, হাইরাইজ তোলা, জমির ফাটকাবাজি করা, এ সব জলভাত হয়ে গেছে।

পদ্ধতিও পাল্টাচ্ছে। খুব চুপচাপ হয়ে যায় সব। গীতির বর বলে, কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার যেতে এত প্রমোদউদ্যান, এত হলিডে হোম, সব তো চাষের জমি নিয়েই। যে সব ধানক্ষেত ইত্যাদি দেখি, সব চোখের সামনে মরীচিকা। কারখানার জমি সব,—কারখানা।

—বাঙালীর ?

—মেশোমশাই! প্রধানত অবাঙালীর। কিন্তু বাঙালী অবাঙালীতে কি এসে যায় ? ওদের একটাই জাত অথবা ওরা জাতিহীন। ওরা জমিভূমি ধ্বংস করে মুনাফা তুলছে। সাদা টাকার কারবারই কম।

সুষেণ বাবু এটা অনেক আগে বুঝেছিল। কিভাবে জমি কিনছিল, দখল করছিল, বাড়াচ্ছিল সাম্রাজ্য !

আজকের মতো তো সফিসটিকেটেড হয়নি কার্যপদ্ধতি। তখন সত্তরের মাতামাতির পর জরুরি অবস্থার সুযোগে সুষেণ বাবুরা মদমত্ত।

জানতাম, ওর বাড়ি ছাড়িয়ে পুব-দক্ষিণে ওদের সীমানাভুক্ত বাঁশবাগান ও পুকুর খুব কুখ্যাত।

পুলিশের ভ্যান ঢুকত অনেক রাতে, পুকুর পেরিয়ে আরও দূরে গিয়ে থমকে থামত। গুলির শব্দ। সকালে বাজারে সবাই মুখ নামিয়ে বাজার করে সরে সরে যেত।

সীতুকে প্রতিমা বলত। সাবধানে থাকিস! পুলিশ তো যাকে তাকে ধরে।

—আমাকে ধরবে না।

গভীর আত্মবিশ্বাস।

কারণ, টাপু ওকে মাঝে মাঝে ডাকছে।

যদিও আমরা তা জানতাম না।

আমি একদিন বললাম, (ভাবি বোকা ছিলাম, না অন্ধ ?) টাপুদের বাড়ির ওদিকে হঠাৎই চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। আশ্চর্য। বাড়ি চেনা যায় না ! জলছাত হয়েছে, বাড়ি রং হয়েছে, আরও ঘর উঠছে।

সীতু বলল, হিম্মত আছে করেছে।

প্রতিমা বলল, ওদিকে যাও বা কেন ?

—আরে ? ওদিকে হাঁটতে গেলেই তো লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। সুবেণ বাবুও হাঁটতে বেরোয় তো !

—তাতে তোমার কি ?

—আহা ! একটা বাঙালী···ব্যবসা করছে·· পয়সা করেছে ··ভালো তো ! আমাদের কালে···

সীতু বলল, কি হতো বাবা, তোমাদের কালে ?

—বাঙালী দানধ্যান করত। ইস্কুল, হাসপাতাল···তা ইনিও তো স্কুলে ডোনেশান দিলেন·· ক্লাবঘর পাকা করে দিলেন···

প্রতিমা বলল, এঁচোড় নেবে আরেকটু ?

আমরা এক সঙ্গেই খেতাম। বারান্দাতেই খাবার টেবিল, ঢাকা বারান্দা, গ্রীলে ঢাকা। সীতু ঈষৎ হেসে বলল, সুষেণবাবুর বুদ্ধি আছে বটে।

গীতির বয়স খুবই কম, তখন তেরোই হবে, কিন্তু খুব নীতিবাগীশ· পাকা পাকা কথা।

সে বলল, বুদ্ধি কিসে দেখলি দাদা ?

—আছে। একটা বিশাল জমি নিচ্ছে ··

নীতু হঠাৎ বলল, কোম্পানির মাঠ তো ?

—তুই জানলি কি করে ?

—পরেশরা বলছিল। ওরা সবাই ঘরপিছু তিন হাজার টাকা পাবে, কিন্তু ওরা ছাড়বে না।

সীতু বলল, দেখা যাবে।

পরে নীতু বলল, দাদা টাপুদের লোক হয়ে যাচ্ছে বাবা···পরেশের বাবা বলছিল · কোম্পানির মাঠ কি কেউ কিনতে পারে ?

ওই দেড়শত বিঘা জমির নাম কেন 'কোম্পানির মাঠ' তা 'পরগনার ইতিহাসে' লেখা নেই। শুনেছি মালিকরা টাকি অঞ্চলের মুসলমান। তাঁরা বহু শরিকে বিভক্ত। অনেকে ওপার বাংলায় চলে গেছেন। এখন শরিকদের কেউই ও জমির সুসমাধান করবার মতো লোকবল, বা অর্থবলের অধিকারী নন।

ওই জমি ইতিহাস। সুষেণবাবু ও জমি আদালত মাধ্যমেই হাসিল করেন। এবং সরকারী হাউসিং বোর্ডকে পরে তা মোটা মুনাফায় বিক্রি করেন। আজ তো সেখানে পরপর সরকারী হাউসিং এস্টেট। নামও গালভরা, এমারেলড গ্রীন।

এ সময়েই সীতু নামে-যশে সুষেণবাবুর কনস্ট্রাকশন ইত্যাদির কাজে

টাপুর সঙ্গে লেগে পড়ে।

টাপু ঝকঝকে জামাকাপড়ে মোটরবাইকে এসে দাঁড়ায়।

সীতু বেরিয়ে যেত।

আমি বলেছিলাম, কি করছিস, ভেবে চিন্তে এগোস সীতু।

—তোমাদের জেনারেশান বড় বেশি ভেবেছে বাবা…কাজ করেছে কম… আমরা ভাবি কম, কাজ করি বেশি।

—কিন্তু এ তো ফাটকাবাজির কাজ সীতু…

—ল্যাণ্ড স্পেকুলেশনের ভবিষ্যৎ তুমি ভাবতে পার না…

—তুই কি চাকরি করছিস ওখানে?

—এখন কাজ করছি…জমি ডেভলপ করার সময় মাটির কাজ করবে টাপু …আমি সঙ্গে থাকব।

—টাপু তোর চেয়ে বড় না?

—ও 'দাদা' বলা পছন্দ করে না।

কিন্তু টাপু তখন পাড়ার দাদাই বটে।

সুষেণবাবু এক রবিবার, কি বিস্ময়, আমার বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল।

—কি হচ্ছে? বাগান পরিচর্যা?

আমি অপ্রস্তুত। বললাম, এই কয়েকটা গাছ…যা পারি। যত্ন করি…

—ভালো, খুব ভালো। আমি তো স্বপ্ন দেখি অনেক…একটা ফুলের নার্সারি করব, ফলের চারা বানাব…আমার ভাগ্না কল্যাণী থেকে এগ্রিকালচারে পাশ করে ইউ. পি পুশায় গেল…

—আসুন, ভেতরে আসুন…

—হ্যাঁ, এলাম যখন…বেশ বাড়ি করেছেন…যেন পাখির বাসাটি…

নিজেই হাসলেন জোরে জোরে।

আমি বললাম, চা খাবেন?

—ওইটি চলে না মশাই। চা নয়, কফি নয়, পান ছাড়া অন্য নেশা নেই। তো বলছিলাম কি…সীতেশকে নিয়ে আপনারা ভাববেন না।

আমি নীরব।

প্রতিমা ভেতরের ঘরে বসেই শুনছিল।

গলা নামিয়ে বললেন, এখনকার ইউথ…ওদেরকে যাকে বলে ভালোবাসতে হবে। দেখলেন না কি কাণ্ড হয়ে গেল দেশে…এখনো হচ্ছে…মানে ইউথকে দিতে হবে…

—আইডিয়াল, সুষেণবাবু?

—কাজ। গোদা কাজ। রোজগারের সাহায্য করতে হবে। চাকরির আশা দুরাশা…পাঁচ জাত এসে এই কলকাতাতেই যা হোক করে পয়সা কামায়,

বাঙালী ছেলে শুধু চাকরি খোঁজে…সীতুকে কেন, পাড়ার বিশটা ছেলেকে আমি ইউজফুল এমপ্লয়মেণ্টে রেখেছি।

—ও বলে…টাপুর সঙ্গে কাজ করবে ··

—টাপু কেন, আমার সঙ্গে…মানে আমি সর্বদা নজরে রেখেছি, ভাববেন না…ছেলেটা বড় ভালো আপনার। হবে না ? সর্বদা বলে বাবা মা আমাদের কণ্ট করে মানুষ করেছেন…তাই তো আমার ছেলেকে বলি…সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছ যে কালে মানুষ তুমি হবে না · ভাববেন না। আমি ওদের রাশ টেনে রেখে দিচ্ছি…নইলে ওইসব লাকসালদের মতো মিসগাইডেড ইউথ হয়ে যাবে। এদের ধরে রাখা আমাদের কর্তব্য। আমি তাই মনে করি।

সুষেণবাবু উঠে পড়লেন।

বললেন. এবারে গান্ধীজির জন্মদিনে এদিকের প্রাইমারি স্কুলে কল-পাইখানা ডোনেট করব। দেখেছেন বোধ হয়, চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি খুলেছি বাড়িতে ?

উনি চলে গেলে প্রতিমা বলল, খুলেছে বটে, তবে তা ইনকামট্যাক্স বাঁচাবার জন্যে।

—সে যাই হোক গে।

—কি ভাবছ ?

—সীতুর কথা বলতে এল কেন ?

—সীতু ওর আসার সুযোগ করে দিয়েছে, বলতে এল।

সুষেণবাবু কোম্পানির মাঠ ঝটিতি খরিদ, ঝটিতি হাউসিং বোর্ডকে বিক্রি, কিছু কাল বাদে, এর মাঝখানে প্রশ্নচিহ্নের মতো ঝুলছিল পরেশদের মতো অনেক মানুষদের বসতিটা।

সেই বসতির পাশেই তো ছিল তারকবাবু, তার ভাইঝি কাজল, কাজলের দাদা বরুণ, যে জরুরি অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়।

ওই বসতি উচ্ছেদ করতে গিয়ে যে হাঙ্গামা বাধে, সে সময়ই না কি কাজল ও সীতুর পরিচয়।

এ সব আমি পরে শুনেছি। যা জানি, তা হল সীতু হাজার টাকা হাতে পেয়েছিল। সে সময় হাজার টাকা অনেক টাকা।

প্রতিমা আর আমি! পাড়ার সকলের মতই রাত জেগে হট্টগোল, বোম বাজি শুনেছি—

পুলিশের গাড়ির সাইরেন,—উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গঠনের উদ্যোক্তাদের ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। আমাদের তখন যে কাজ করত, সেই গৌরী বলে গেল, এৎ পুরুষের বাস, ছাড়তে পারে ? বলে আদালতের রায়। আমরা

জানলাম না, রায় হয়ে গেল, বলচে, জমির কাগজ নেই, কিন্তু নেই, সে তো আদালতে থাগবে কিছু। শুনে আসচি নিষ্কর জমি, হঠাৎ মল্লিকবাবু এল কোথা থেকে ?

প্রতিমা বলল, তুমি তো থাকো ডাক্তারবাবুর বাড়ি।

—আমি হেতা মা ! কিন্তু ঘর তো ওখানে আচেও। বোনঝি থাকে, তার সোয়ামি রেক্‌শা চালায়।

—তোমরা টাকা পেলে কিছু ?

—সে সব মল্লিক বাবুরা যাকে যেমন বোঝাচ্ছে···

গৌরী বিকেলে কাজে এল না, পরদিনও না। ডাক্তারবাবুর মেয়ে গীতির সঙ্গে পড়ে। প্রতিমা বলল, একবার দেখে আয় তো গীতি। ও না এলেও যমুনার মা কাজ করে দেয়। সেও এল না। ডাক্তারবাবুর বাড়ি গৌরী থাকত, রাঁধত রাতে, আর আমাদের বাড়ি কাজ করে দিয়ে যেত। ঠিকে লোক বলতে কোম্পানির মাঠেরই মেয়েরা আসত। তখন জানি না, পরে কি অবস্থা হবে। এখন তো ঠিকে লোক মেলা দুষ্কর। ট্রেনে চেপে দক্ষিণ থেকে মেয়েরা আসে। তারা জেনে গেছে, আমাদের ওদেরকে দরকার ! ওরা বিনা আমরা অসহায়।

গীতি মুখ সাদা করে ফিরে এল। তারপর শুনলাম খুব কাঁদছে।

গেলাম ঘরে।

—কি হয়েছে গীতি ?

মেয়ের নামটি এতই ছোট, যে ওকে আর ডাকনাম দেওয়া হয়নি।

প্রতিমা নীরস গলায় বলল, গৌরী কাজ করবে না। আর কোনও ঠিকে লোকও মেলা দুষ্কর।

—কেন, কাজ করবে না কেন ?

—যারা ওখানে ভাঙচুর, মারপিট, বোমাবাজি করেছে তাদের মধ্যে সীতুও ছিল। ওর বোনঝি ওকে বলে গেছে।

—ওঃ।

কে যেন নিশ্বাস ফেলল।

—কে, কে ওখানে ?

—নীতু। এখন তুমি কি করবে ? সুষেণবাবু ইউথকে কি কাজ দিচ্ছে, তার সূচনা তো দেখলে।

—বাড়ি আসুক সীতু।

সীতু সবটা অস্বীকার করে গেল। হ্যাঁ, ও গিয়েছিল। আদালতের নোটিশ পাবার পরেও তো ওরা নড়েনি। আর সুষেণবাবু প্রদত্ত পরিবার পিছু তিন হাজার টাকা নেবার পরেও কামড়ে পড়েছিল।

নীতু, আমার স্বল্পভাষী, জেদী, বুকচাপা ছেলে নীতু বলল, ক'জন টাকা পেল দাদা? সুষেণবাবুর তো সর্বদিকে লাভ হল। তিনপুরুষ আগে কাদের জমি দেয়া হয়েছিল, এখন তার গুষ্টির গুষ্টি কে থাকছে, নাম মেলে না, বলতে পারে না, নিরক্ষর সব,—এটা…তোরা…কি…করলি ··

—আমি কিছু করিনি।

—গিয়েছিলি তো?

—দেখছিলাম।

দেখছিলে? কি দেখছিলে সীতু? মানুষের কান্না, চীৎকার…ভয়?

প্রতিমা, সীতু বড হবার পর এই প্রথম, ঠাস করে সীতুর গালে চড় মেরেছিল।

আর ক্রোধের প্রচণ্ডতায় মাথায় বোধহয় রক্ত উঠে যায়, অজ্ঞানও হয়ে যায়।

নৈঃশব্দ্য, নৈঃশব্দ্য চীৎকার করছিল ঘরে। তারপর গীতি চেঁচাল মা-আ-আ।

ডাক্তারবাবুকে নীতু ধরে এনেছিল। তিনি প্রেসার দেখলেন। বললেন, বয়স?

—পঁয়তাল্লিশ।

—ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। টেনশান নয়, গণ্ডগোল নয়, আর এগুলো খাবেন না…

তিনি তাঁর কাজ করে বিদায় নিলেন। সীতু তার ঘরেই থেকে গেল। বেরোল না, খেল না।

রাতে সীতু দাঁড়িয়েছিল আমাদের খাটের পাশে এসে। আমি বুঝতে পারছিলাম, ও ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়েছে। মা'র জন্য ভাবছে। বলতে পারছে না।

কথা বলবার সাহসও পাচ্ছে না।

আমিই বললাম, শুয়ে পড় গে সীতু।

—মা'র…প্রেসার আছে?

—এতকাল তো·· তোর মাতামহ অবশ্য এরকম হঠাৎ প্রেসার চড়েই মারা যান।

—আমি…ছিলাম না বাবা দেখে…পালিয়ে এসেছিলাম…দূরে দাঁড়িয়েছিলাম।

নিশ্বাস ফেললাম। বললাম, শুতে যা সীতু। পরে কথা হবে, কেমন? আর·· কাল আমার আপিসে একটা…মা'র স্কুলে একটা খবর দিস।

—দেব।

—যা শুয়ে পড়।

যেখানে পাঁচজন পাঁচজনকে নিয়ে থাকে,—মাছের মাথা ছোড়দা খাক…

দাদা! পরোটা আর গুড় খা'…কাঁঠাল এনো তো। গীতি ভালোবাসে… নীতু কলমি শাক আনতে পারলি না? তোর বাবা এত ভালোবাসেন…

এ রকম সব নির্টিপিটি ছোটখাট জিনিসে যাদের সুখদুঃখ কেন্দ্রিত—সে পরিবারে অসহজ আড়াল উঠে গেলে বাঁচা মুশকিল। সকাল হলে কি হবে, আমার ভয় করছিল। এতকাল যে ভাবে জীবন চলে এসেছে, তাতে যে এগোতে এগোতে দেখা যাচ্ছে সামনে ধস নেমেছে।

গীতি আর নীতুর ভূমিকা কখনও ভুলব না। আমি তখনও রাতজাগার ক্লান্তি কাটাতে পারিনি, গীতির গলা শুনলাম, এই দাদা। চটপট চা খেয়ে নে। কাল রাতে খাসনি, আয়, মজার জলখাবার করে দেব।

—তুই?

—আজ্ঞে। আর কে করবে শুনি? ছোড়দা তো মাকে বাথরুমে নিচ্ছে, মুখ ধোয়াচ্ছে।

—চল, আমি যাচ্ছি।

মা পড়ে আছে, এ দৃশ্য আমার ছেলেমেয়ে দেখেনি কখনও। আমি প্রতিমার পাশে বসেই থাকলাম। ওরাই হাতাহাতি বাসন মাজল, জল তুলল সব করল। একটা সময়ে ভাতে ভাতও রান্না হয়ে গেল।

আমরা খেলাম, প্রতিমা খেল!

কিন্তু সীতুর সঙ্গে কথা বলল না।

সীতু বেরিয়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। নীতু দাদাকে খুঁজতে গেল। বলল, ওদের কাছে যেতে দেব না।

তারপর…অনেকক্ষণ বাদে নীতু, সীতু আর কালো ছিপছিপে একটি মেয়ে ঢুকল। খুব সহজভাবে বলল, আমি কাজল সীতুর বন্ধু। প্রতিমা পাশ ফিরে চোখ বুজল।

কাজল বলল, সীতু একা পারছিল না—ওর সঙ্গে আমিও গেলাম—টাপুও গেল। সুষেণ মল্লিকের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে।

—টাপু তোমাদের সঙ্গে গেল?

—ওর…গেল তো।

—এসব কথা এ ঘরে না-ই বললে মা।

—বলতেই হবে। শুনুন মাসিমা…সুষেণ মল্লিক প্রত্যেক পরিবারকে হাজার টাকা করে দেবে। যাদের বাড়ি ভাঙচুর করেছে, তাদের আরো পাঁচশো করে দেবে। অনেককেই ফাঁকি মেরেছিল।

—তুমি…বরুণের বোন না?

—হ্যাঁ। দাদার বন্ধুরা থাকলে কি আর…তবে কাকা—আমাদের অঙ্ক

সার···আর একপাল মেয়েছেলে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—রাজী হয়েছে ?

—হতেই হবে। না হলে ছাড়তাম আমরা ? সেই ভোর থেকে বসে আছি না ? বলল, পুলিশ ডাকব। বললাম, ডাকুন। পুলিশ দেখে দেখে আমার ভয় চলে গেছে !

—সত্যিই দেবে টাকা ?

—দেবে, দেবে মেসোমশাই। সহজে কি দেয় কেউ ? আদায় করতে হয়। টাপুতো প্রাণের ভয়ে গেছে। ওর ওপর যাদের রাগ আছে, তাদের ভয়ে গেছে।

প্রতিমা বলল, সীতু···আর যাবে না তো ?

—সেটা···সীতু ঠিক করুক। তবে কাজ করেছে তপন দা, আপনারা চেনেন না। কারা ক্ষতিপূরণ পেল না, নামের ফর্দ তৈরি করে টরে...উকিল তো... সব জানে।

গীতি বলল, সকাল থেকে খাওনি, কিছু খাবে ?

—না ভাই। কাকা না খেয়ে বসে থাকবে। চলি···কেমন ? মাসিমা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন।

প্রতিমা দিন ছয়েকেই সামলে গেল।

এরপর একদিন সীতু হাজার টাকা আনে।

প্রতিমা বলল, সুরেশবাবু দিল ?

সীতু বলল, হ্যাঁ। কাজ ছাড়ার টাকা।

—ওটা...তুই রেখে দে। তোরই হঠাৎ লাগবে।

—হ্যাঁ...থাক···তুমি তো নেবে না !

—তুই এখন···কি করবি সীতু ?

—দেখি।

এই ঘটনার পর আবার ঠিকে ঝি পরিস্থিতি সামান্য সরল হল। যারা পাড়ায় কাছে পিঠে থাকত, যেমন গৌরী, তারা কাজে এল।

অন্যরা যে কে কোথায় গেল, জানি না। শহরের দরকারে যারা উচ্ছেদ হয়ে যায় তারা কোথায় যায় ? এতগুলো মানুষ হাঁড়িকুড়ি, বিছানামাদুর, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে গেল কোথায় ?

গৌরী বলেছিল, জেনে কি করবে বাবু ? তোমরা তো উচ্ছেদ হবে নি।

আমরা উচ্ছেদ হই না, ওরা হয়। এটা দশ বছর পরে হলে কিছু হৈচৈ হতো, জনমত তৈরি হতো, উচ্ছেদবিরোধী সংগঠন তৈরী হতো। কাগজে বেরোত।

জরুরি অবস্থায় সম্ভব ছিল না কিছুই। তবু মাঝে মাঝে ভাবি, সেদিন ওরা কোথায় যেতে পারে। কাজল বলত, কিছু তো গোবরা, তিলজলা, এখানে

ওখানে চলে যাবে। কিছু যাবে ধাপার দিকে। ততদিনে কাজল আমাদেরও আপনজন।

কাজলকেই বলেছিলাম, টাপুর সঙ্গ তো ছাড়তে পারছে না সীতু। ওর সঙ্গেই কি ঠিকাদারি কাজ করে?

—ছাড়তে চাইলেও পারবে না।

—কেন?

—ধরা সোজা। ছাড়লে···টাপু তো অ্যাণ্টিসোশাল। মল্লিক ওকে কম খাইয়েছে?

—সীতু কিসের মোহে যে গেল···

—বলে তো মাটি ভরাটের কাজে ওর কোটা পূরণ হলেই ছেড়ে দেবে। তবে টাপুকে চটালে বিপদ আছে। টাপুর সঙ্গে সুষেণবাবুর সম্পর্কও ভালো যাচ্ছে না। টাপু তার প্রাপ্য টাকা বুঝে পেলে দূরে চলে যাবে। তাই যেতেও হবে।

—কেন?

—ও যাকে বিয়ে করবে সে তো এখানে থাকবেই না।

—নয় আরেকটা বিয়ে করবে।

—টাপু খুব নোংরা ছেলে। কিন্তু বিয়ে সে কোকিলাকেই করবে।

—সেই নার্স কোকিলা?

—হ্যাঁ মাসিমা।

—ভালোই তো। বিয়ে করে ভদ্র জীবন যাপন করুক···

—সমাজবিরোধী কাজে একবার জড়িয়ে গেলে বেরোনো খুবই মুশকিল।

—সীতুকে···তুমি একটু বোঝাতে পারো...

—টাপুর সঙ্গে মাটির কাজে যাচ্ছে, জানেন?

—না জানি না।

—টাপু ওকে সঙ্গে রাখে...একা ভয় পায়।

—কী দরকার সীতুর, বল?

আমরা বুঝিনি এবং এই না-বোঝার ক্ষমা নেই, বুঝিনি যে সুষেণবাবুদের সঙ্গে টাপুরা প্রত্যক্ষ ভাবে, সীতুরা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়লে চক্রব্যূহ থেকে বেরোনো যায় না।

এখন তো সেইসব চাপা সংক্রমণ সমস্ত দেশের দেহে অসংখ্য ক্যানসার ক্ষত হয়ে বেরিয়েছে, দগদগ করছে। রাজনীতির সমাজবিরোধিতা দরকার, না সমাজবিরোধিতার রাজনীতির? না সবই এখন ঐকসঙ্গীত? ভাবি না, আর ভাবি না। ছেষট্টি নয়, মনে হয় একশো ছেষট্টি বছর বয়স হয়েছে আমার।

কাজল একদিন সীতুকে, ওর ঘরে বসেই বলেছিল, ন'মণ তেল পুড়িয়ে রাধা

নাচে না সীতু। কোন কাজটা সেরে তবে টাপুর সংস্রব ছাড়বি রে তুই ?

—ওর কাছে আমি টাকা পাই।

—তোরা ভাবিস তোরা খুব চালাক। সুষেণ মল্লিক তো নজর রাখছে। তোরা কাজিয়া-দেবপাড়াতে মাটির কাজ করছিস তো মিত্রবাবুর ?

—জানি, মিত্রবাবু ওর কে হয়।

—ওর কাজই করছিস। মিত্রবাবু শিখণ্ডী। কেন করছিস ? এত কি দরকার তোর ? পাঁচ না সাড়ে পাঁচ হাজার জমল। কার জন্যে ?

—যদি বলি…তোর জন্যে ?

—ছিঃ।

কাজল বেরিয়ে গেল হনহনিয়ে। ততদিনে আমরা বুঝেছি যে সীতু কাজলকে মনে মনে আঁকড়ে ধরেছে।

কাজল আর সীতু এক বয়সী নয়, কাজল একবছরের বড়।

কাজল ওর কাকা তারকবাবুর কাছে থাকে। কাজলরা একটা জুনিয়ার হাইস্কুল করেছে মেয়েদের—যা কোন-না-কোন দিন অনুমোদন পাবে বলে ওর কাকার বিশ্বাস। কাজল সেখানে পড়ায়, কোচিং-এ পড়ায়। ওর কাকা শিক্ষকতা ও কোচিং করে করেই কাজলদের বড় করেছেন।

সীতু কাজলের প্রতি আকৃষ্ট, এর ব্যাখ্যা পেতাম।

কাজল কেন সীতুকে পথ দেখাবার চেষ্টা করত, তা বুঝতাম না। প্রতিমা বলত, ও সীতুর ভালো চায়।

আমি, প্রতিমা, নীতু ও গীতি, সীতুকে একলা করে দিচ্ছিলাম কি ? ও যে টাকা আনতো, তাকে মনে করতাম অসৎ পথের টাকা,—ও মনে মনে একলা, একরোখো, সেজন্যই কাজলকে আঁকড়ে ধরেছিল। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যাচ্ছিল কি ?

ভাবলেই আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি।

সাতাত্তরে বামফ্রন্টের বিপুল জয় তখন দেশকে উত্তাল করে রেখেছে। আমাদের সকলের মন থেকে যেন একটা পাষাণ নেমে গেছে।

এমন একটা সময়েই জানা গেল, যে-সব বন্দী মুক্তি পেয়েছে, তার মধ্যে বরুণ নেই।

কাজল গুম হয়ে গেল। বলল, কোনও কেসই প্রমাণ করতে পারেনি, তবু দাদাকে ছাড়ল না ?

সীতু বলল, ভাবিস না।

—কাকাকে কতকাল কষ্ট দেব ? সেও তো হাঁপানির রোগী, কতদিন বাঁচবে ?

—আমি তো আছি।

—সেটাই বলতে এসেছিলাম সীতু। তুমি টাপুর সঙ্গ ছাড়বে, তারপর বলবে 'আমি তো আছি'। তুমি তা পারবেও না, আর যোগাযোগ রেখো না।

গীতি প্রতিমাকে বলল, দাদা যদি বুঝত, তাহলে কাজলদি ওকে বিয়ে করত।

—তোকে বলেছে!

—আহা! তোমরাই জান না, আর সবাই জানে।

—গীতি! তুই না ছোট সব চেয়ে?

—ছোট থাকতে দিলে তোমরা? যা হোক, এটা জেনো যে দাদা কাজলদিকে বিয়ে করলে আমি আর ছোড়দা খুব খুশি হব।

খুশি তো আমরাও হব। বলব কাকে?

কয়েক রাত সীতু ঘুমোয়নি। অনর্গল পায়চারি করেছে আর ভেবেছে।

তারপর হঠাৎই একদিন শুনলাম, সীতু টাপুর সঙ্গে কাটকুট করে বেরিয়ে গেছে।

ও বলে না কিছু, আমরাও বলি না।

সুষেণবাবুর কি সব টাকাপয়সা নিয়ে টাপুও চলে গেছে এও শুনলাম।

মাঝখানের সময়ের কথা অনেক, অনেক। সীতু বি. এ. পাশ করেই সরকারী চাকরির জন্য ঘুরতে থাকল। গীতি আমাদের বেজায় খুশি করে প্রথম ডিভিশনে পাশ করলো এগারো ক্লাসে।

বললাম, দুটো টিউশানি কম করলে লেটার পেতিস। ও বলল, ও একটা অভ্যেস বাবা।

আর সীতু একদিন একটা গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট নিয়ে ঢুকল।

কপাল মুছে বলল, 'সী ফোম' সাবানগুঁড়োর এজেন্সি নিলাম। দারুণ, দারুণ সাবান।

সকলের দিকে তাকাতেও পারে না। যেন ও আসামী, আমরা বিচারক।

প্রতিমা বলল, আমাকে দে।

সীতু মুখ না তুলেই বলল, পরে হয়তো কোম্পানিতে নিয়ে নেবে। এখনও ...খাটলে মাসে শ' পাঁচেক পাব। খাটতে হবে।

প্রতিমা বলল, কাজলকে বলে আয়।

—সুষেণবাবু সভায় ডাকবে তোমাদের।

—কিসের সভা।

—নতুন এম. এল. এ.-র সংবর্ধনা সভা। সুষেণবাবুদের···কখনওই... কোনও অসুবিধা হয় না...

সত্যিই তাই। সুষেণবাবু নেই এখন—তাঁর ছেলে সুসীম আমাদের

কাউন্সিলার, ক্রীড়াজগতের পৃষ্ঠপোষক, পুরীতে হোটেল মালিক, ইত্যাদি ইত্যাদি—

সুসীমদের কোনও অসুবিধা হয় না···

সুষেণবাবু আমাদের ডাকেনি, ডাকলেও আমরা যেতে পারতাম না, কেন না 'সী ফোম' বেচতে বেচতেই কাজল আর সীতু বিয়ে করে ফেলে।

সইসাবুদে বিয়ে। কাজল কাকাকে ছাড়তে চায়নি। তারকবাবু বলল, ওসব হবে না। তুমি তোমার জায়গায় থাকো, আমি আমার জায়গায় রইলাম।

ছোটখাট একটি উৎসব তো করতেই হল। প্রতিমার স্কুলের কাজলের স্কুলের শিক্ষিকারা, আমার ক'জন সহকর্মী, গীতি ও নীতুর ক'জন বন্ধু।

আমার ছাতেই হল। শোভনবাবুর কথা বারবার স্মরণ করলাম। তিনি কি খুশিই হতেন।

শোভনবাবু মারা গেছেন বছর খানেক।

বরের বয়স বাইশ, কনের বয়স তেইশ, তাকে কি এসে যায় ?

বলতে পারি, উনআশি সালের আগে অর্থাৎ আটাত্তরের পুজো অবধি আমরা খুব আনন্দে কাটিয়েছি। কাজলও তার স্কুলে যায়। সীতু আমি ও প্রতিমা কাজে যাই। নীতু চাকরির খোঁজ করে আর পরীক্ষা দেয়, গীতি যায় লোঁড ব্রেবোর্নে পড়তে।

প্রতিমা বলল, দেখো, ওরা পরে ওপরে ঘর তুলবে। তিনজনেরই অংশ থাকবে, কি বল ?

—নিশ্চয় থাকবে।

আটাত্তরের ডিসেম্বর নাগাদ হঠাৎ শুনলাম টাপু ফিরে এসেছে। সে বলে বেড়াচ্ছে, সুষেণবাবুর সঙ্গে তার হিসেবনিকেশ আছে। সে এখনও সুষেণ-বাবুর কাছে ক'হাজার টাকা পায়।

সীতু আর কাজলের কথা কাটাকাটি এই প্রথম শুনলাম। একদিনও শুনিনি।

—টাপু ডাকলেও তুমি যাবে না।

—কী বলব ওকে ?

—ও নিজের হিসেব বুঝুক গে।

সীতুর গলায় এসময়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা, হতাশা ও রাগের চাপা মিশ্রণ শুনলাম, তা এখনও মাঝে মাঝে আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

—ও যা বলেছে তা তো সত্যি। সুষেণবাবু···আমার সামনেই ওকে বলেছিল ··কোম্পানির মাঠ থেকে···ওদের তুলে দিলে···পনের হাজার টাকা দেবে···আমাকে···পাঁচ·· আমি পালিয়ে আসি···টাকা নিই নি···ওই যা হাজার টাকা অ্যাডভানস···

—জানি আমি।

—না—আ, সব জান না। তুমি জান না—কেউ জানে না…একা সুষেণবাবু জানে · কোথায় গেল ··গৌরীর সেই…কে যেন ?

—ওর বোনঝি জামাই তো নয় ?

—না, না…কে যেন লোকটা ··

—যাকে রাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়…?

—হাসপাতালে নয়। ও মরে গিয়েছিল।

—টাপু মেরেছিল ?

—না—আ। জানি না কে·· টাপুই বলল, এ কি করলে কালী ?

—তারপর ?

—হাসপাতালে নয়, সুষেণবাবুর কথায়…টাপু তাকে…বোধহয় ধাপার মাঠে…

—সেই টাপুর কাছে তুমি যাবে কেন। ওর সঙ্গে সংস্রব রাখবে কেন ?

—রাখব না…তুমি জান না…টাপুই বলেছিল, আমি তো ভসকা হয়ে গেছি সীতু, তুই কেটে যা। ভালো বাপ মা তোর, এ লাইন তোর নয়। ও না বললে তো আমি কেটে আসতে পারছিলাম না।

—কৃতজ্ঞতা বোধের জন্যে যাবে ?

—আমি শুধু যাব, সুষেণকে বলব, আমার সামনে ওকে সেদিন অনেক টাকা দেবেন বলেছিলেন। আমি সাক্ষী আছি। আমি বললে ও দেবে। টাপু টাকা পয়সা নিয়ে গেছে এ তো সুষেণবাবুর রটনা।

—টাপু টাকা পেলে তোমাকে ভাগ দেবে ?

—আমি ভাগ নেব না। নিলে নিতে পারতাম আগেই। টাপু আর কোকিলা তুমি আমায় নিষেধ ক'রো না। তুমি 'না' বললে আমি নড়তে পারি না।

—আমার ভয় করছে কেন আজ ? আচ্ছা যদি না যাও, কি হয় ?

—টাপু অনেক অন্যায় করেছে…ও কিছু টাকা পেলে যদি অন্যরকম জীবন একটা…সুষেণবাবু ওকে সামনে রেখে তো অনেকবার লক্ষপতি হয়ে গেল কাজল।

আমি শুনলাম প্রতিমাও শুনল।

কত ক্ষণস্থায়ী ছিল আমাদের সুখের কটা মাস ?

তারপর তো সব জানাজানি।

সুষেণ মল্লিকদের কনস্ট্রাকশন সাইটেই গিয়েছিল সীতু। টাপুর ওখানেই থাকার কথা ছিল।

আমি ঘুমোইনি, প্রতিমাও ঘুমোয়নি। কাজল জেগে বসেছিল।

সীতু ঘণ্টাখানেক না যেতেই দৌড়ে ফিরে আসে। ফিরে এসে বমি করতে শুরু করে। ভাঙা ভাঙা বিকৃত শব্দ টুকরো টুকরো·· যেন এলোপাথাড়ি ঢিল ছুঁড়ছে কেউ·· টাপু···মরে গেছে কাজল···আমি···বুঝতে পারিনি...ও পড়েছিল···ওকে চিৎ করতে গিয়ে...

বমির শব্দ।

আমি এটা বিশ্বাস করি।

কাজল বিশ্বাস করে।

সীতুর সেই অন্ধকার সময়েও ও খুন করেনি কাউকে। নীতু সীতুকে বিশ্বাস করে।

গীতিও তাই।

প্রতিমা তো বটেই।

কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন।

কেন না কত দ্রুত চলে এল পুলিশ। কি অসম্ভব তাড়াতাড়ি সেজে উঠল কেস। কত সাক্ষী জোগাড় হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি।

সীতু তো ছোরাটা তুলে ধরেছিল, টর্চ ফেলে দেখেছিল টাপুকে। টর্চও ও ফেলেই আসে।

বাড়ির লোকদের সাক্ষী দাঁড়ালই না।

কাজল একই কথা বলে গেল, সীতু ওকে যা বলেছিল।

কিন্তু স্ত্রী, বা বাবা, বা মা, বা ভাই, বা বোন তো আপনজনকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেই।

রাজ্য বনাম সীতেশ মল্লিকের কেসে দায়রা আদালত থেকে হাইকোর্ট, আমরা উকিল দিতে দিতে জেরবার হয়ে যাই।

কোকিলা বলল, টাপু বলত, সীতু আমার কাছে ঋণী। ওর কাছে আগে যাব।

টাপুর বাবা ও বোনেরা আমাদেরই গালাগালি করত আদালতে, বাইরে, বাজারে।

সুষেণবাবু বলল, পার্থ (টাপুর ভালো নাম পার্থ, তা জানতামই না) আর সীতু তো সমাজবিরোধী হয়ে গিয়েছিল। ওদের মধ্যে টেনশান চলছিল শুনেছি। আমার কাছে এলে আমি ফয়সালা করে দিতাম···তবে সীতু যে এমন কাজ করবে, তা ভাবিনি।

আমার সামনেই দেখলাম উকিলের জেরায় জেরায় সীতুর ইমেজ কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকল।

যেন সীতুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়নি, যেন আমরা দণ্ড পেলাম।

চোদ্দ বছর, আজ চোদ্দ বছর যাই ওকে দেখতে। আমিই যাই। দমদম, আলিপুর সেণ্ট্রাল, মেদিনীপুর, বহরমপুর, আলিপুর প্রেসিডেন্সি।

লাইফারদের তো এই পাঁচটা জেলেই ঘোরায়।

আমরাই তছনছ হয়ে গেলাম।

কাজল দণ্ডাদেশ শুনে বেরোবার পর বাড়ি ফিরে এসে কয়েকদিন বাদে জানালো, সে চলে যাচ্ছে।

গীতি বলেছিল, বউদির সন্তান হবে!

প্রতিমা বলল, 'না' বলব কোন মুখে? কিন্তু বাড়িতে তো তোমার কাকা। আর এ তো তোমারও বাড়ি।

কাজল আমাদের 'বাবা' বা 'মা' বলেনি কখনও।

ও আস্তে বলল, এখানে সন্তান হলে সে শৈশব থেকে জানবে ওর বাবা খুনের আসামী।

—তা তো সত্যি নয় কাজল।

—এখন ওটাই সত্যি। আমাকে স্বার্থপর হতেই হবে মাসিমা। সকলের চোখে চোখে অবিশ্বাস…আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, মিথ্যে হলে তা প্রমাণ হল না কেন,—আমাকে যেতে দিন।

—কিন্তু…

—দাদা ছাড়া পেয়ে যাবে। কাকা আছেন। আমি চিরকাল জীবনের সঙ্গে লড়াই করেছি…আমি সীতুর মতো নরম নই মাসিমা। আমি পারব।

গীতি বলল, একশোবার যাবে। ও তো আমাদের মতো এখানে থাকতে বাধ্য নয় মা।

কাজল একদিন চলে গিয়েছিল।

আমার অফিস, প্রতিমার স্কুল, দরজার বাইরে পা দিলে বাইরের জগৎ: আমরা যেন বধ্য জন্তু, মানুষের চোখগুলো ব্যাধ। কত তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল মানুষ। রাস্তায়, 'কি! কেমন আছেন' অবধি বলে না কেউ।

গীতি একদিন এসে বলল, কলেজে যাব না আর।

—কেন?

—সবাই শুধু দাদার কথা বলে। শেষে চীৎকার করে বললাম, আমার দাদা খুন করেনি, তবু সে খুনী বলে প্রমাণ হয়েছে। এ তো তোমরা জানো। আমার কাছে আর কি জানতে চাও?

নীতু বলল, ভুল করছিস গীতি?

—কিসে?

—আমরা মাথা উঁচু করেই চলাফেলা করব। দাদার ঘটনা তো চাপতে

পারব না। কিন্তু দাদা লাইফার বলে আমরা কি মরে যাব? মা স্কুলে যায় না? বাবা অফিসে যায় না?

—দাদা আমাদের মেরে রেখে গেল। আমি ও প্রতিমা নিশ্চুপ।

কিসের ভূতে ধরল ওকে। খাওয়া শোওয়া নিয়ে স্বার্থপর ছিলই। সে তো অনেকেই থাকে। তারা তো টাপুর মতো ছেলের সঙ্গে মিশতে যায় না।

প্রতিমা বলল, সেও তো মরল।

গীতি বলল, ও অমনি করেই মরতো। এত খুনজখম, এত সন্ত্রাস করে, ও কি বিছানায় পড়ে মরতো?

কোকিলাদির জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।

নীতু বলল, সে আসানসোলে শাড়ির দোকান করেছে। এত কিছু কষ্টে নেই।

—অবাক কাণ্ড টাপুদের বাড়ি। বাপ বা বোনদের দেখলে কে বলবে···

আমি বললাম, অর্থাভাবও নেই।

নীতু ঈষৎ হেসে বলল, সুষেণবাবু আছে না? আদালতে গিয়ে জলজ্যান্ত মিছে কথাগুলো বলল, কিসের জোরে? সব দিকে আটঘাট বেঁধে ওরা কাজ করে।

প্রতিমা বলল, টাকার জন্যে ছেলেকে খুন করাল যে··

—মানুষ বাস্তববাদী হতে শিখেছে মা। কোকিলাদির দোকান হয়েছে এদের পয়সা মিলেছে···টাপুর মেজবোনটা তো মল্লিক কনস্ট্রাকশানের অাপিসে রিসেপশনিস্ট। মরতে মরলাম আমরা।

গীতি বলল, এ আমাদের জীবনে সঙ্গের সাথী হয়ে রইল। আমি আর ক্লাসের ফার্স্ট হওয়া মেয়ে নই। আমি সীতেশ মল্লিকের বোন।

নীতু বলল, এখানে থাকতেও হবে।

প্রতিমা খাবার বাড়তে বাড়তে বলল, কাজল চলে গেছে। তোরাও কাজকর্ম পেলে সরে যাস।

—এ বাড়ি বেচা যায় না মা?

—বেচলে যা পাব, তাই নিয়ে কলকাতায় আর থাকা যায় না। লক্ষ্মীকান্ত-পুর যেতে হয়।

গীতি বলল, তা হয় না ছোড়দা। দাদার ব্যাপার নিয়ে আমরা যেন গর্তে পড়ে গেছি, চোখ আটকে যাচ্ছে দেয়ালে। এভাবে ভাবলে তো হবে না। বাবা একান্ন মার উনপঞ্চাশ তোর একুশ, আমার সতেরো পুরে যাচ্ছে,—আমাদের তো বাকি জীবন বাঁচতে হবে।

—হ্যাঁ···এটা নিয়েই বাঁচতে হবে।

—আমরা পালাব কেন? আমরা কিছু করেছি?

প্রথমবার আমি ও প্রতিমা দুজনেই যাই সীতুকে দেখতে। সীতু বলল, তোমাদের কিসের মধ্যে ফেললাম ?

প্রতিমা বলল, এখন আর ভাবিস না।

—কাজল ওর কাকার কাছেই গেল (প্রতিমা বলে, রূঢ় সত্য হয়তো আঘাত দেয়, তবু তা লুকালে ক্ষতি করা হয়)।

—চলে গেল…

—ওর…সন্তান হবে…

—ও!

শুনেছি, পরে কাজলও গিয়েছিল, ওদের কী কথা হয়েছে আমি জানি না।

কাজলের কাকা তারকবাবু একদিন এলেন সাইকেল রিক্শা চেপে। বুড়ো লোক, কিন্তু চোখ জ্বলজ্বলে। সাদা চুল, অথচ কালো ভ্রূ। কাছে এলে কবিরাজী ওষুধপত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। হাঁপানির রোগী। আমাকে এক কপি 'পরগনার ইতিহাস' দিলেন। বললেন, বাড়িটা শোকসভা করে রাখবেন না। মানুষের রোগ হতে পারে, ধরেন বহুমূত্র, অথবা অঙ্গহানি, ধরেন একটা পা কাটা পড়ল, তাই নিয়াই বাচতে হয়। কাজলের জন্য ভাইবেন না। ও ঠিকই থাকব।

—বরুণ ফিরেছে ?

—এই, আজ কি কাল। ভাল থাকেন। কতদিন দুঃখ করা যায় ?

—সবটাই তো মিথ্যে।

—মিথ্যে জানলেই লাভ ? মল্লিকের উপর শোধ নিতে গ্যালে আপনের এই ছেলেকেও মারকাট করতে হয়। ওই লাইনে আমরা পারি না। আমার মুখের ভাষা…পদ্মা-গঙ্গার মিশ্রণ এখন। ভাল থাকেন সবাই।

প্রতিমা বলল, কাজল ভালো আছে ?

—সে ভাল থাকতে জানে। আসবে সে, কারো উপরেই তার অভিযোগ নাই। আমি চলি। আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে চারটি চারাপোনা কিনে নিয়ে গেলেন। বললেন, কাজলের এখন…

এই তো আমাদের ইতিহাস। চোদ্দ বছরে গীতি, নীতু, কাজল, যে-যার জীবন গড়ে নিয়ে সরে গেছে। সীতুর ছায়া তাদের ওপরেই প্রলম্বিত।

আমরা দুজন নির্বাসনে আছি। আমি অষ্টআশি সালে রিটায়ার্ড, প্রতিমা নব্বই সালে!

এখন আমরা সহজভাবে বেরোতে পারি, যদি চাই। পাড়া তো অন্যরকম। অনেকেই আমাদের চেনে না, আর 'সীতেশ মল্লিক' নামও অনেকে জানে না। আমাদের কাজের মেয়ে রিনা বলল, এত পয়পরিষ্কার করাচ্ছেন, ছেলে বুঝি আমরিকান থেকে আসচে ? শুনছি সেতা খুব পয়পরিষ্কার থাকে সব। রিনা

সুভাষগ্রাম থেকে ট্রেনে আসে সালোয়ার কামিজ পরে, দশটা থেকে তিনটে কাজ করে, তিনশো টাকা নেয় সর্বদা শুনিয়ে চলে, হনুমান অ্যাপার্টমেন্টে একেক বাড়িতে চারশো-পাঁচশো হরদম দিচ্ছে।

শুনে যাই।

প্রতিমা বলে, ভালো পেলেই চলে যেও রিনা।

এমন কথাবার্তা তিন বছরই চলছে। চৌদ্দ বছরে কম কাজের লোক তো আসেনি, যায়নি।

এ নির্বাসনও সয়ে গিয়েছিল। তারকবাবুর কথা মতো এসব নিয়েই বসবাস করে যাচ্ছি।

কিন্তু নির্বাসনকাল অবসান কী ভয়ংকর, কী ভয়াবহ, আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, কেন না এখন কী করব তা জানি না।

সীতু যে-কোনও দিন ফিরে আসছে।

তারপর ?

॥ মা ॥

খুব বুঝতে পারছি উনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ভেবে মরছেন আমরা কে, কীভাবে গ্রহণ করব ব্যাপারটা।

সীতেশের ফিরে আসা।

স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে মেয়াদ কমতে পারে, এজন্য অনেকেই রক্তদান করে চলে। সীতেশ দু'একবার রক্তদান করতে পারে, কিন্তু মেয়াদ হ্রাসের জন্য সে কোনও পীড়াপীড়ি করেনি বারবার।

আমি ওকে দেখতে দু'একবারই গেছি।

ওখানে স্বাভাবিক থেকেছি।

বাড়ি এসে অসুস্থ হয়েছি।

তারপর ও লিখল, মা। বাবাই তো আসে। তুমি আর এসো না! বুঝতে পারি বাড়ি গিয়ে তোমার শরীর খারাপ হয়। বাবাও...মাঝে মাঝে এলেই পারে। তাকে জোরাজোরি কোর না।

সীতু আর আমার মধ্যে মন খুলে কথা তো কবে থেকেই হয় না। ও ধরা পড়ার চারবছর আগে থেকে। কিন্তু ও আমাকে যেমন চেনে, তেমন অন্য সন্তানরা চেনে না।

ও বুঝত, ওর বাবা যে যান, সে আমার পীড়াপীড়িতে। আমি তো কান্নাকাটি করতাম না। আমাদের দুজনের সম্পর্ক এমনই, যে আমি তাকালেই উনি বুঝে নেন। দু'জনে চা খেতে খেতে বড়জোর বলেছি, বহরমপুরে অনেকদিন হয়ে গেল···একবার···

আমার পীড়াপীড়ি অতটুকুই। তবে সেবার মেদিনীপুর লোকালে ফেরার সময় ট্রেন অস্বাভাবিক লেট করল, ফিরতে অনেক দেরি হল, অসুস্থই হয়ে পড়লেন।

সেই থেকে আর বহরমপুর বা মেদিনীপুর যেতে দিইনি। আলিপুর সেণ্ট্রাল, আলিপুর প্রেসিডেন্সি, দমদম। খবর রেখেছি, পুজোর পর অনেক খাবার করে পাঠিয়েছি। বারবার লিখেছি, ওখানে যা পাও, আহারে খরচ করো।

না, আমার এবং ওর বাবার মধ্যে সম্পর্কটা এমন করিনি, যে ওর কথা বলতে লজ্জা পাব। আমরা তো মা বাবা। শুধু এই বাড়িতে ওর কথা বলা চলে।

কাজল ঋষিকে বলেছে তার বাবা নিরুদ্দেশ। তার খবর জানা যায় না।

গীতি যখন এখানে আসে, জেনে যায় দাদার কথা। অমিয় এবং ওর, ভাব-ভালোবাসার বিয়ে। অমিয় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে কাজ করে। গীতি দমদমে একটা কলেজে ইংরিজি পড়ায়। ওরা থাকে লেকটাউনে। এখনও ভাড়া বাড়িতে, তবে নিজেরা বাড়ি করবে। গীতির যমজ ছেলে বুটুন (তপোময়) আর কুটুন (শুভময়) ওদিকেই পড়ে।

ওদের বিয়ের প্রাক শর্ত, সীতুর কথা ওরা বলবে না। অমিয় এবং গীতিও সে সময়ে একরোখো ছিল এবিষয়ে। এখন জানিনা, অমিয় নমনীয় হয়েছে কি না।

বুটুন আর কুটুনও জানে, ওদের বড়মামা নিরুদ্দেশ। ওরা সপরিবারে মাঝে মাঝে আসে। খায় দায়, থাকেও কোনও কোনও দিন। গীতি আর ছেলেরা।

অমিয় চলে যায়। বলে, একতলায় থাকি, রাতে না-থাকা বিপজ্জনক।

গীতি একদিন নীতুকে বুঝিয়েছিল, দাদা লাইফার, সেটা মেনে নিয়েই চলতে হবে। এতে আমাদের লজ্জার কী আছে?

সেই গীতিই অনেক আপস করে নিল।

নিক। একটি সাবালিকা, শিক্ষিকা, চাকুরিরতা মেয়ে স্বনির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করেছে। পণযৌতুকের ব্যাপার নেই। অমিয়র মা বাবা থাকেন শিলিগুড়ি। ও'দের বড় ছেলের বউ এক নেপালী ক্রিশ্চান ডাক্তার, মেজ ছেলে বিয়ে করেছে মাসতুত বোনকে—এক মেয়ে বিয়ে করেছে এক লাফাঙ্গা চীট ফাণ্ড

ব্যবসায়ীকে—ছোট মেয়ের বর এক বয়স্ক মুতদার উকিল,—অমিয়র মা-বাবার পরিষ্কার কথা, যে যার খুশিতে বিয়ে করো। আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দাও।

না, গীতির বিয়েও এখনকার নিয়মে রেজিস্ট্রেশান এবং দু'পক্ষের খরচে রিসেপশান।

আমার বোন অনিমা বলে, দিদি সবই নিখরচায় সেরে দিল।

খরচা করতাম কোথা থেকে? সীতুর কেস যখন ওঠে, তখন আমরা দুজন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড লোন নিয়েছি, সযত্নে সঞ্চিত সবই গেছে, আমার সামান্য গয়নাও বেচতে হয়েছে।

বিয়ের সময়ে, পরে দীর্ঘকাল অমিয় একটি ব্যাপারে কঠোর ছিল।

নো স্ক্যানডাল।

গীতিকেও অনেক আপস করতে হয়েছে। নীতুকে ভাইফোঁটা দিতে এসে দাদার নামে দেয়ালে ফোঁটা দিয়ে গেছে। না, সীতুকে ও দেখতে যায়নি কখনও। নীতুও যায়নি। ওর বিয়ে, নীতুর বিয়ের কথা বলতে গিয়ে ওর বাবার গলা কেঁপে গেছে। কিন্তু সীতুই বাবাকে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? আমার কথা রেখে ঢেকেই ওদের চলতে হবে, সে তো আমি জানি। কেমন বিয়ে হল বলো। কেমন আছে বলো।

ভাইবোনের কথা ও যত জানতে চায় জেলে যাবার পরে। এই উদ্বেগ ওর মধ্যে আগে দেখিনি।

এসব কথা যখন কাজলকে বললাম, কাজল চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, সীতু আগে খুব অপরিণত ছিল। এখন যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠেছে। আমি মনে করি, ও যখন বেরোবে, তখন অনেক আত্মস্থ, ভালো এক মানুষ হবে ও।

হ্যাঁ, উনি সীতুর সঙ্গে যোগ রাখেন।

আমি আর কাজল পরস্পরের সঙ্গে ক্ষীণ হলেও যোগ রাখি।

গীতি সেদিন হঠাৎ এসেছিল।

দেখলাম খুব উত্তেজিত, খুব বিচলিত।

বলল, সারাদিন থাকলে তোমার অসুবিধে হবে?

—বোকার মতো কথা বলিস না।

—কাগজে অমিয়র ভগ্নীপতির কথা তো দেখেছ।

—দেখেছি।

—কোন কাগজে বেরোয়নি। অমিয় মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে এখন।

—গীতি!

—কি মা?

—তুই কি অমিয়কে কথা শুনিয়ে এসেছিস ?

গীতির মুখ ছোট্ট হাঁ হয়ে গেল।

—তুমি বুঝলে কী করে ?

—তোমাকে চিনি বলে। বলেছিস, শুধু আমার পরিবারে স্ক্যানডাল নেই। তোমার পরিবারেও আছে। না, আরো কিছু বলেছিস ?

—বলেছি, আমার দাদাকে তো ফাঁসিয়েছিল। সে নিজেকে আর পরিবারকে ছাড়া কারোকে বিপন্ন করেনি। তোমার ভগ্নীপতির চীটফাণ্ডের কারণে একটা নির্দোষ এজেণ্ট আত্মহত্যা করেছে, ক'হাজার গরিব পরিবার ভিখারি হয়েছে, এ স্ক্যাণ্ডাল তো চাইলেও চাপতে পারছ না ?

—ঠিক করিসনি।

— বিয়ের পর থেকে দাদার কথা চেপে রাখতে রাখতে···

গীতি ঠিক বলছে না। আমরা বড় অতীতকে ভুলে যাই, আর, কোনও অতীত ঘটনার কথা মনে করতে গিয়ে এখন যেমনভাবে দেখছি, সেইমতো ব্যাখ্যা দিই।

সীতু টাপুদের সঙ্গে মিশেছিল। এটাই গীতি ও নীতু সমর্থন করতে পারেনি। ওদের কিশোর মন দাদার ওপর বিষিয়ে যাচ্ছিল।

সেটাই স্বাভাবিক। আমরা ভালো, আমরা কোনও সাতেপাঁচে থাকি না, আমরা শিক্ষিত, চেঁচামেচি করি না, এইসব ছিল আমাদের গর্ব। যে গর্বে সাদামাটা পোশাক পরেই মাথা তুলে চলাফেরা করতাম।

সীতু গর্বের জায়গাটাই ভেঙে দেয়।

সীতু খুন করলে কি হতো জানি না, খুন না করেও তো লোকজানাজানি, কেচ্ছা কেলেঙ্কারি এড়ানো যায়নি।

গীতি ও নীতুর বেড়ে ওঠার কিশোর, কোমল বয়সে সীতু একটা প্রচণ্ড ঘা দেয়।

যে জন্য অমিয়কে বিয়ে করার অনেক আগে থেকেই গীতি দাদাকে দেখতে যেত না।

নীতু তো যেতই না।

বললাম, স্নান কর, খা। আয় সবাই একসঙ্গে খাই। মাথা ঠাণ্ডা কর। অমিয় এমন কোনও কাণ্ডকারখানায় অভ্যস্ত নয়। ওর এখন তোর সঙ্গ দরকার। ছেলেরাই বা কী ভাবছে ?

—ঝগড়া নয় মিটিয়ে নেব। কিন্তু ওর বোন...ছি ছি ছি...সর্বদা টাকার বড়াই...সর্বদা বড় বড় কথা...এতগুলো লোকের চোখের জল ··

—সময়টাই যে এরকম। ভোগবাদী সভ্যতার যুগ···

—কী করে এ নিয়ে চলব ফিরব ?

—তোরা তো ইনভেসট করিসনি কিছু ?

—পাগল হয়েছে ? কিন্তু মা·· এটা মেনে নিয়ে চলা···

—আমার বাড়ি থেকে মল্লিকদের হাইরাইজ দেখা যায় গীতি। দেখতেই হয়।

সত্যি !

গীতি কেঁদে ফেলল। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। ছোটবেলায় ও বলত, আমাকে তোমরা ছোট থাকতে দাওনি।

হয়ে ওঠেনি গীতি। সীমিত আয়ে বাড়ি করব, ছেলেমেয়েদের মানুষ করব, ভদ্রতা রেখে চলব, মাথা যেন উঁচু থাকে, সব কিছু করতে গিয়ে তোদের শৈশব বা কৈশোর কি কেড়ে নিয়েছিলাম ?

জানি না।

অনেক কেঁদেকেটে ও শান্ত হল।

আমরা একসঙ্গে খেলাম।

ওর বাবা বললেন, খাবি জানলে ভালো মাছ আনতাম···

—আরেকদিন এনো। বাড়িতে মাছ হয় কোথায় ? বাপ আর দুই ছেলে আগের জন্মে অন্য রাজ্যের লোক ছিল। ডাল, আচার, পাঁপড় ভাজা, ঘি, আলুর যা করবে তাই।

—এখানে এলে তো খায় !

—ভদ্রতা করে খায়। মাংসও তেমন চায় না। তবে ডিমটা খায়।

খাবার পরে ঘরে এসে ওর বাবা বললেন, একটা ভালো খবর দিই।

—কি, বাবা ?

—জেলে ওদের আঁকা শেখায়, মূর্তি গড়তে শেখায়। সীতু খুব মন দিয়ে ছবি আঁকছে। শুনলাম, দেখতে তো পেলাম না।

গীতি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, দাদা সব সময়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীতে পোস্টার আঁকত···দেয়াল লিখত···মনে নেই ?

এই পর্যন্তই।

উনিশ থেকে তেইশ সীতু যা যা করল, তাতেই আমরা আজও আচ্ছন্ন। তার আগে ও কি কি করেছে, যা গুণ বলে গণ্য হয়, সে আমরা ভুলে গেছি।

গীতিকে শুধু বললাম, অমিয়র সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আর ঝগড়াঝাঁটি করিস না।

—দাদা তো···বছর দেড়েকেই ছাড়া পাবে, তাই না বাবা ?

—জানিনা মা। পাওয়া উচিত। আবার শুনি ষোল সতের বছরও কেটে যায়।

—বউদির দাদা···

—সে তো রাজনীতিক বন্দী ছিল।

—বউদি আসে, মা ?

—খুব কম। এত বছরে···

—তুমি যাও ?

—যাই। সেও বছরে দু'একবার।

—ঋষি কোথায় পড়ছে যেন...

—হস্টেলে।

আমি জানি, ঋষিকে অনেক কষ্টে কাজল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে রেখেছে। কাউকে বলিনা হস্টেলের নাম। বলাবলি থেকেই জানাজানি হয়। কাজল ওর ছেলের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। বাঘিনীর মতো।

—কোন হস্টেলে তা জানতে চাইনি কখনো···

—তুই যাস ?

—কখনো ক্বচিৎ।

—ঋষির বয়স এখন চোদ্দ হব হব। কাজল আর চার পাঁচ বছর ওকে আগলে রেখে বড় করে দিতে চায়। সে জানে, তার বাবা নিরুদ্দেশ।

—হ্যাঁ মা···জানি।

গীতি সেদিন ফিরে যায়। তারপর ও আর অমিয় এসেছে, ছেলেরাও এসেছে।

গীতিই বলে, সে লোক তো হাজতে। এদের পরিবারে যে ধুন্ধুমার লেগেছে, কি বলব।

শুনেছি সবই, ছেলেরা হাত ধুয়ে ফেলে দিয়েছে।

বড় মেয়ের স্বামী এদিকে উকিল, ওদিকে গুরুভক্ত। তিনি সব শুনে বলেছেন, জয় গুরু!

ছোটবোনের টাকা পয়সা বাজেয়াপ্ত। সে মেয়েদের নিয়ে বাপ মা-র কাছে থাকছে বাক্যবাণ শুনছে।

অমিয় তার তুষার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি আছে, না যাচ্ছে, এই দুশ্চিন্তায় গুমরে মরছে।

গীতি বলল, সম্ভবত অমিয়ও গুরু ধরবে। ভাগ্য। নিয়তি। এসব এত বলে।

আমি বলি, অমিয়র মনের জোর কম। তোর উচিত ওকে ভরসা দেওয়া।

—মল্লিকারও হাজার পাঁচেক টাকা গেছে, ছোড়দা লিখেছে।

—হ্যাঁ...মল্লিকাও তো আরো বড়লোক হতে চায়! এখন যদি শিক্ষা হয়।

আমার ছোটছেলে নীতু, 'দাদার জন্যে এ শহরে থাকা যাবে না' বলতে বলতে কলকাতা ছেড়েই দিল।

অল্প বয়স থেকেই বুকচাপা, মিতভাষী ছেলে।

কোনও মতে কোনও কাজ জোগাড় করবে, বড়জোর কেরানী হবে, তাই সে বলত।

কার্যকালে পরীক্ষা দিয়ে ও ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরে ঢুকল উনিশশো আশি সালে। চাকরি হল জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি মালদা কুচবিহার আবার জলপাইগুড়ি।

উত্তরবঙ্গ থেকে যাওয়া-আসা করতে পারত না তেমন।

প্রথম প্রথম টাকা পাঠাত।

একবার আমিই বললাম, আমরা তো চালিয়ে নিচ্ছি নীতু। টাকা তুই জমা। তোর দরকার-অদরকারে লাগবে। কতই বা পাস!

—দাদার কেসের সময়ে তোমাদের···

—চলে তো যাচ্ছে নীতু। দূরে থাকিস, তুই বরং ক' বছর দেখে বিয়ে কর।

—যাক না কিছুদিন।

—তোরই দরকার বেশি।

নীতু আমার ঘরোয়া ছেলে, সংসারগত প্রাণ। ওর বাবার সঙ্গে ওর খুব মেলে। টিউশানির টাকা থেকেও কখনও একটা সাবান, কখনও চারটে আম কিনে আনত। রবিবার নিজের জামাকাপড় কাচত, ইস্ত্রি করত। রথের বাজার থেকে বাবাকে গন্ধরাজের আর সাদা অপরাজিতার চারা ও-ই এনে দেয়।

নীতু একলা থাকে বলে আমি বার দুই ওর কাছে গিয়ে থেকে এসেছি। জলপাইগুড়িতে যখন প্রথমবার যাই, ও আমাকে দার্জিলিং দেখিয়ে এনেছিল।

মল্লিকা জলপাইগুড়িরই মেয়ে। খুব রক্ষণশীল পরিবার বলতে হবে। বড় মেয়ে ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছে, ওর বাবা অসবর্ণ বিয়ে মেনে নেননি। মল্লিকার বাবার চায়ের ব্যবসা শিলিগুড়িতে। জলপাইগুড়িতে ওদের পরিবারের বাস একশো দশ বছর ধরে।

মল্লিকার বাবা মেয়েকে বি. এ. পাশ করিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন বিয়ে দেবেন বলে। খুঁজছিলেন এমন ছেলে, যে কাছাকাছি থাকবে।

ছোটমেয়ে অত্যধিক আদরের। ভদ্রলোকের তিন মেয়ে। বড় জন উইলেই বণিত। সে সস্বামী লণ্ডনে থাকে, ওখানে বাড়িও কিনেছে। সে আর এদেশে আসবে না।

মেজো মেয়ে থাকে হরিয়ানা। ইনি কেন নীতুর সঙ্গে মল্লিকার বিয়ে দেবার জন্যে এমন ব্যস্ত হলেন, তা জানি না।

বারবার লিখতে লাগলেন।

শেষে কলকাতা এলেন, আমাদের বাড়িতেও এলেন।

এত দেব, তত দেব... বাধা দিয়ে নীতুর বাবা বললেন, ওসব কথাই বলবেন

না। আমার মেয়ের বিয়েতেও পণযৌতুক দিইনি, ছেলের বেলাও নেব না। কিন্তু আপনি আমার ছেলেকে নির্বাচন করলেন কী দেখে? আমি কেরানী, স্ত্রী শিক্ষিকা, এই তো বাড়ি আমাদের।

ভদ্রলোক নিশ্বাস ফেলে বললেন, নির্বাচন তারাই করেছে। আমার মেয়েরই অসম্ভব জেদ।

—নীতুরও?

—সে সম্মত না হলে আমি জোরাজোরি করতে পারি?

—তাহলে তো চুকেই গেল।

—খোঁজ আমি নিয়েছি।

ভদ্রলোক চৌকো, বলিষ্ঠ, ছাঁট চুল, দু' হাতে আংটি, দামী ধুতিপাঞ্জাবী ও একটি দামী ছড়ির যোগফল।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, সবই জানি। মেয়েকে বলেছি অনেক, সে মানবে না। এখন ··এ খবর···

আমি বললাম, আমরা প্রচার করে বেড়াই না...তবে এ কথা তো অনেকেই জানে।

—ওখানে...মানে...জলপাইগুড়িতে সবাই জানে নীতেশ এক ছেলে...

আমি নীরব।

উনি বললেন, নীতেশও তাই বলে?

—না, সে কিছুই বলে না। মানে এ কথা জানাজানি হলে···বড় মেয়ের অসবর্ণ বিবাহ...আমাদের বংশে কেউ...

—তা হলে তো আপনার বড়ই মুশকিল। আমার বড়ছেলেও বিবাহিত, মেয়েও,—সবই অসবর্ণ বিয়ে।

—ইশ্‌শ্‌ই। জন্মলগ্নের দোষ হবে···

—তারা বিয়ে করেছে আমরা মেনে নিয়েছি। নীতু যদি সবর্ণে বিয়ে করে তাও মেনে নেব।

—বিয়ে জলপাইগুড়িতেই হবে।

—নিশ্চয়!

—কিন্তু বউভাত···ফুলশয্যা?

—হয়ে যাবে। সব ঠিকমতো হয়ে যাবে। তবে অনেক ঘটাপটা করতে পারব না।

—এখানেই?

আমাকে অবাক করে উনি বললেন, না···বাড়ি ভাড়া নেব। ভাববেন না।

—নীতেশের জন্ম টাইম মতে কোষ্ঠি...হাত গণনা...আমি করিয়েছি। ছেলে সুলক্ষণ। বেটার বাপ হবে।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

আমি বললাম, কী করে বললে বাড়িভাড়া নেব ?

—নীতুর জন্য। নীতু নিশ্চয় মেয়েটিকে খুব ভালোবাসে। নইলে এমন করে রাজী হতো না ··এত শর্তে। আমি আর তুমি কে ? সন্তানরাই সব। আর প্রতিমা। সীতুর নাম যে এক নিষিদ্ধ নাম, সে তো শুধু নীতুর ক্ষেত্রেই নয়, গীতির ক্ষেত্রেও। তফাৎ এই যে, বিয়ের পর অমিয় তার মনোভাব জানায়,—এরা মোটা দাগের মানুষ, তায় পয়সা আছে, আগেই জানাল।

—বাড়িভাড়া নেবার খরচ জান ?

—রিটায়ার করতে দু' বছর আছে···অফিসে অবনীরা আছে···হয়ে যাবে।

নীতু অবশ্য ছুটি নিয়ে এল। খুব কিন্তু কিন্তু মুখ, অপ্রস্তুত অপ্রতিভ।

আমি বললাম, ছবি দেখাবি না ওর ?

—তাই দেখাতেই তো এনেছি।

যথেষ্ট সুশ্রী, গোলগাল গড়নের সালংকারা একটি মেয়ে।

—বয়স কত রে ?

—চব্বিশ পূর্ণ হয়নি।

—দেখতে তো ভালোই নীতু···আর উনি যা বললেন তা অযৌক্তিকও নয়। বাড়িতে কে কে আছে ?

—মা, ঠাকুমা ওর বাবা এক পিসি···কেমন এক সম্পর্কের কাকা···বাজার দোকান করে...চাকরবাকর···ড্রাইভার···

—খুব বড়লোক ?

—অবস্থাপন্ন। জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়িতে অনেক বড়লোক আছে মা।

—তুই একে বিয়ে করতে চাস তো ?

—মেয়েটি ভালো। তোমার ভালো লাগবে। ঘরকন্নার কাজ তেমন জানে না···করে না তো···

আমার মনে হল, ঘরকন্নার কাজ জানলেই বা কি। সে তো থাকবে না আমাদের সঙ্গে।

নীতু আমার নীরব, নীতিবাগীশ ছেলে, একটু অন্যায় যে সইতে পারত না,—সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে বিয়ে করতে চাইছে, আমি কী বলতে পারতাম ?

বললাম, ভালোই করেছিস নীতু। এতদূরে থাকিস···তোর জন্য আমার চিন্তা হতো···আটাশ বছর বয়স হল···বিয়ে করবি কবে ?

এরপরের কথাটা নীতু সরাসরি বলতে পারেনি। গীতিকে দিয়ে বলিয়েছিল।

গীতি বলল, মা, ছোড়দা ওই বাড়িভাড়া নেওয়া, বৌভাত, ফুলশয্যার খরচ,

এসব বাবদে টাকা দিতে চায়, তোমরা নাও।

আমি আর ওর বাবা আলোচনা করলাম। ওর বাবা বললেন, আসলে নীতু অপরাধী বোধও করছে…এতরকম শর্ত মেনে বিয়ে…

—তাই হবে।

নীতু যা দিল তা দিয়ে বউকে গহনা (যেমন তেমন), আর গায়েহলুদের তত্ত্ব করলাম। আমার সহকর্মীনিরা এসেই উদ্ধার করলেন। খুব অল্প লোকজন ডেকে, বাড়ি ভাড়া নিয়ে নীতুর বউভাত হয়।

নীতু গিয়েছিল কাজলের কাছে।

কাজল একটা শাড়ি দেয়।

মল্লিকাকে জীবনে সেই প্রথম ও মনে করি শেষ দেখা। দেখতে টুকটুকে, কিন্তু কম কথা বলে। নীতুর দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকে। সে সময়ে চোখ দুটি নরম, মমতা মাখা। অন্য সময়ে চোখ দেখে মনের ভাব বোঝা যায় না।

গরদ নমস্কারী পেলাম।

গীতি তো একটি সুটকেস বোঝাই জামাকাপড় হেনতেন কত কি।

বউভাতের পরদিনই ওরা দার্জিলিং চলে গেল মধুচন্দ্রিমায়।

ব্যবস্থা অবশ্যই নীতুর শ্বশুরের।

গীতি বলল, মা। ছোড়দাকে ও সত্যি ভালোবাসে। ছোড়দাও ওর বিষয়ে উচ্ছ্বসিত। বড়লোকের মেয়ে বলে কোনও অহংকার নেই…

নীতুর বাবা ঈষৎ হেসে বললেন, হঠাৎ-বড়লোক তো নয়। কয়েক পুরুষ ধরেই বড়লোক।

—ছোড়দাকে কেন…

আমি বললাম, ভালো ছেলে খুঁজছিলেন হয়তো। আর, বিয়ে হল তো মেয়ের জেদে। অন্যত্র বিয়ের কথা বললেই মেয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাত।

—যাক। ছোড়দা সুখী হলেই আমরা সুখী।

নীতুর শ্বশুর সত্যিই সদর্থে বৈষয়িক। জীবিতাবস্থাতেই দুই মেয়েকে সব ভাগ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মল্লিকার নামেই টাকা, বাড়ি ইত্যাদি…

নীতু অর্থলোভী নয়। টাকার লোভে ও বিয়ে করেনি নিশ্চয়।

কী করতে পারে ও, বউয়ের বাপ যদি ধনী হয় ?

নীতু নিয়মিত চিঠি লেখে, পুজায় টাকা পাঠায়। বছরে কয়েকবার আসে।

মল্লিকা আসে না।

মল্লিকা আসে না, আমরাও বলি না, কেন আনিস না ? তবে বিজয়াতে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লেখে। একেবারে পুরনো দিনে ইস্কুলের রচনাপুস্তকে চিঠি লেখার যে মডেল থাকত, তার অনুকরণে লেখে।

'ওঁ। শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদম, বাবা। আপনি ও মা আপনি ও মা আমার'রী বিজয়ার প্রণাম নিবেন। আশাকরি ঈশ্বর কৃপায় আপনারা ভাল আছেন। আপনাদের আশীর্বাদে আমরা কুশলেই আছি। আর কি। প্রণামান্তে আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষনী মল্লিকা।'

গীতিকেও চিঠি লেখে। অমনি গতে বাঁধা চিঠি।

নীতুকে বলতে ইচ্ছে করে, কলকাতায় আসিস না দুজনে, তা তো নয়। মল্লিকা কোথাও থাকে, তুই দেখা করে যাস। একবার বললে ও কি আসে না?

বলি না। গীতিকে নীতু লিখেছে, মল্লিকা একটা বিষয়ে অনড়। বাবা মা দাদার সঙ্গে যোগ রাখেন+দাদা এমন জঘন্য কাজ করেছে+দাদা লাইফার=ও কোনও দিন আমি ছাড়া কারও সঙ্গে যোগ রাখবে না।

আমি নীতুর মুখ দেখি। কোথায় যেন ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব। বলি, তুই যেখানে আছিস, সেখানেই মন বসিয়ে থাক নীতু। আমাদের জানালেই হবে, কেমন আছিস।

নীতু তার উত্তরে সামান্য হাসে। আমাকে এড়িয়ে যায়

একবার তো শুনলাম, নীতু চাকরি ছেড়ে দিতেও পারে।

শ্বশুরের চায়ের ব্যবসা দেখবে।

জানিনা ও কী করবে।

তবে মল্লিকা ওর বিষয়ে অসম্ভব অধিকারপ্রবণ, এটা বোঝাই যায়।

বিয়ের চার বছরের মধ্যে ওদের দুটি মেয়ে জন্মেছে। একটি ওখানে আর একটি কলকাতায়।

নাতনিদের ছবি দেখেছি।

অনেক কথাই জানতে পারব না।

নীতু যখন বদলি হয়, মল্লিকা কি সঙ্গে যায়? মনে হয়, যায় না।

সীতু জেলে। কিন্তু ওর ছায়া তো লম্বা হতে হতে আমাদের সকলের জীবনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

ইদানীং নীতুকে এমন কথাও বলতে শুনেছি, দাদা যদি রাজনীতি করেও জেলে যেত!

—মল্লিকাদের চোখে তার ইজ্জত বাড়ত কি?

কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্য। কিছু কিছু নৈঃশব্দ্য আছে, যা কানের কাছে অনেক ট্রেনের অনেক বাঁশির মতো গগনবিদারী। সহ্য হয় না।

আবার কিছু কিছু নৈঃশব্দ্য বিস্ফোরণের মতো।

নীতু বলল, না। ওদের কাছে 'জেল' শব্দটাই···

—জানি।

—দাদা তো মুক্তি পাবে। এখানেই আসবে নিশ্চয়। আর কোথা যাবে?

—আমি জানি না নীতু। সীতু কী করবে, কী করে বলব ?

— তখন যে আমি কী করব...

—যেটুকু আসিস, তাও আসবি না। রাগ করে বলছি না নীতু। তখন তো সম্ভবই নয়। মল্লিকাকে বিয়ে করেছ, তোমরা ভালো থাকো।

—তোমাদেরই যে কী হবে।

—আর ভাবিস না।

—এটাই তো বোঝে না মল্লিকা। আমার চেয়ে তোমাদের অবস্থা অনেক বেশি মর্মান্তিক।

—নীতু, তোর প্রোমোশান কি সীতুর জন্যে আটকে যায় ?

—না মা!

—আমাদের জন্যে···ভাবিস না। আমরা ওর মা বাপ। আমরা ওকে অনস্তিত্ব করে দিতে পারি না

—না, তা কি করতে পার ?

সীতু 'নেই' হয়ে গেলেই কি নীতু বা গীতি স্বস্তি পেত ? তাও তো মনে হয় না।

যেটা চোদ্দ বছরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে দেখছি, সীতু যে খুন করেনি, তাকে যে ফাঁসানো হয়েছিল, সে কথাটাও দিনে দিনে ভুলে গেছে সবাই। সীতুর আপনজনেরাও।

হায়! অনেক আপনজন তো আমাদের ছিল না। আমরা পাঁচজনই পরস্পরের আপন ছিলাম।

তখন কত না একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে।

খেলার মাঠে ঠ্যাং ভেঙেছে নীতু। সীতু ওকে পিঠে বঁয়ে নিয়ে দৌড়েছে হাসপাতালে।

গীতির চোদ্দ বছর বয়সে কোনও ছেলে একটা চিঠি ছুঁড়ে মেরেছিল, যাতে লেখা ছিল 'আই লাভ ইউ'। সীতু আর নীতু তাকে বেদম চড়চাপড় মেরে-ছিল।

হঠাৎ ট্রামবাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ওদের বাবার আসতে রাত নটা বেজেছিল দু'ভাই রেললাইনের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ।

সেভেন থেকে এইটে উঠল নীতু। সীতু লাফাতে লাফাতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে, নীতু সেকেণ্ড হয়েছে। নীতু সেকেণ্ড হয়েছে।

হাসিদির মতো জয়মঙ্গলবার, বা অন্য পুজোপাঠ করিনি কখনও। তবে লক্ষ্মীর আসন একটা পাতাই থাকত, এখনও আছে। জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠীতে ওদের কল্যাণে পুজোও পাঠাতাম, আর পাঠাই না। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো ছেলেদের খুব পছন্দ ছিল। রাতে লুচি, পায়েস আর খিচুড়ি ভোগ হতো।

তিনজনের প্রতিযোগিতা, কে কত খাবে।

এবাড়িতে এমন সব স্বাভাবিক ব্যাপার একদা ঘটেছে। এখন, কতকাল, বাড়িটা নীরব, নিশ্চুপ।

নীতু বা গীতিকে বলিনি কখনও, সীতু ওদের খুঁটিনাটি খবর নেয়।

কাকে বলব ?

বড়ভাই হয়ে এটা দিনে দিনে জানা, যে ভাই বা বোন তাকে সত্যিই বাতিল করে দিয়েছে, সেটা কী মর্মান্তিক তাই ভাবি।

জনারণ্যে নয়। অন্ধকারে, অন্তরালে। যেখানে এক একটা মিনিটকে মনে হয় এক এক ঘন্টা…এক এক ঘণ্টাকে মনে হয় এক এক দিন। এক এক দিনকে মনে হয়…

কত আর ছবি আঁকতে পারে সীতু, কত আর বই পড়তে পারে ?

আমরা দু'জন তো বন্দী নই। কিন্তু আমরা যেন জেলেই থাকি ওর সঙ্গে। সীতু নিজে বন্দী, আবার আমাদেরও বন্দী করেই রেখেছে।

কাজলের জীবনেও তো সীতুর ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে আছে। না যাক, না খবর নিক, 'সীতু' নাম নিয়েই তো ওর নিরন্তর চিন্তা !

ঘরদোর রং করানো আর পেরে উঠব না। কয়েকদিন ধরে ইস্কুলের বেয়ারার ছেলেকে ডাকিয়ে এনে টাকা দিয়ে বাড়িটা সাফসুতরো করাচ্ছি। এক সময়ে বাড়িটাকে এত বড় মনে হতো না।

এখন যেন প্রাসাদ মনে হয়।

ছেলেটা বলে, ঘর পায় না মানুষ, আপনারা দু'জন লোকে চারটে ঘর নিয়ে আছেন ? এ পাড়ায় তো ভাড়াও অনেক পাবেন।

এ ছেলেটা ঝুলঝাড়া, বাড়ি ধোয়া মোছা পরিষ্কার করা, এসব কাজ তো করেই। ইলেকট্রিকের টুকটাক কাজও জানে। কাজ করতে করতে বলল, আমাকে একটু জায়গা দিলে আমি অনেক কাজও করে দিতাম।

এমন একটা বিশ্বাসী-ছেলে থাকলে আমরাও তো বেঁচে যাই। কিন্তু রাখব কী করে ?

ঘরদোর সাফ করালাম ক' দিন।

কাজের মেয়েটাকে দিয়ে বিছানা কাচালাম ; নতুন পর্দা বানালাম।

নিজেই আসবাবপত্র ঘষে ঘষে সাফ করলাম।

সীতুর ঘরে এখন ওর খাট বেডকভারে ঢাকা, টেবিল ঝকঝকে। ওর বই-গুলো গোছানো, ধুলোঝাড়া—দেয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার।

এসে যেন দেখে ঘরটাও ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

যে কোনও দিন, যে কোনও দিন ও আসবে।

তারপর কী হবে ?

কাল কাজলের কাছে একবারটি যাব।

॥ স্ত্রী ॥

মাসিমা এসেছিলেন। আমিও যাই না বলতে গেলে, উনিও আসেন না। ক্বচিৎ কদাচ যখন যোগাযোগ হয়, দুজনেরই হিসেব থাকে, যে ঋষি যখন হস্টেলে তখনই যোগাযোগ হবে।

শুনলাম, সীতু যে কোনও দিন ছাড়া পাবে।

এটুকুই বললেন মাসিমা। ঋষির ছবি দেখলেন। প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখলেন।

—মাধ্যমিকে ভালোই করবে, কি বলো ?

—উচ্চমাধ্যমিকটাই তো সমস্যা। কলেজে পড়ানো ভালো নয়, স্কুলে হলেই ভালো।

—নরেন্দ্রপুর।

—অগত্যা তাই। তবে সেও কলেজ।

—দেখ। সব কর্তব্য তো তুমিই করলে।

—আর কে করত ? আপনারা সবই করতেন, জানি। কিন্তু আমি তো চাইনি...জানেন তো সব।

—কাজল ! সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন এবং অনধিকার চর্চা। তোমাকে আগে বলেছি, পরেও বলেছি, তুমি একতরফা ডিভোর্স পেতে পারতে, বিয়েও করতে পারতে, কেন করলে না। কুমার তো খুবই ভালো ছেলে ছিল।

—'বিয়ে' শব্দটাতে আর বিশ্বাস পাইনা মাসিমা।

—বড় নিঃসঙ্গ জীবন তোমার।

—তা বোধহয় নয়। ও দুটো ঘরে কোচিং সেণ্টার খুব ভালো চলে, খুব। কাজ করতে করতে সময় কুলিয়ে উঠতে পারি না। আর···মাসিমা·· ঋষি জানে, বিয়ের একবছরের মাথায় ওর বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

—একটা সময় মনে হয়েছিল কুমার···

—না মাসিমা। আমি কুমারকে বুঝিয়ে বলেছি। আমার বয়সও উনচল্লিশ পুরতে চলল। ঋষি জানে, মা তাকে কষ্ট করে পড়ায়। তাকে ভালো রেজাল্ট করে ভালোভাবে মানুষ হতে হবে। এখন ওর যা বয়স, তা থেকে আর

বছর ছয়েক গেলে ও শক্তপোক্ত হয়ে যাবে।

—তাই !

—ঋষিদের প্রজন্মটা অন্যরকম। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক অন্যরকম। পারলে ওকে দূরে পাঠাতাম। কোথায় পাঠাব। ভরসা পাই না।

—বরুণ এখন কোথায় ?

—ওরা তো অনেকদিনই ঝাড়গ্রামে। ওখানে বাড়িও করবে, জমি কিনেছে।

আমার চোখ কোথায় যেন চলে গেল। বললাম, দাদার এক মেয়ে, আমার এক ছেলে, গীতির দুই ছেলে, নীতুর দুই মেয়ে, এরা কেউ কাউকে না চিনে বড় হচ্ছে। কী করা যাবে বলুন ?

—হ্যাঁ···সীতুর ছায়া সবার ওপরে।

—ও তো আপনাদের কাছেই আসবে।

—মনে করি তাই। কিন্তু কী বলব ? আমি আসি তাহলে।

—ভালো থাকবেন মাসিমা।

—ভালোই আছি। উনিও ভালো আছেন।

মাসিমা চলে গেলেন। ওঁকে আর বললাম না, এ বাড়ি বেচে দিয়েছি। বাঁশদ্রোণীতে কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাটে চলে যাব যে কোনও দিন। কুমার এ উপকারটা করে গেছে। বাঁশদ্রোণীতে বারোজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে নিজেরা ফ্ল্যাট করাল বলেই আড়াই লাখে ছ'শো বর্গফুটের ফ্ল্যাট হল। দুটো শোবার ঘর, একটি মেজ ও একটি ছোট বাথরুম। একটু বসার ও খাওয়ার জায়গা,—এক চিলতে বারান্দা একটি রান্নাঘর। দোতলায় ফ্ল্যাট। একতলা নিলে একটু জায়গা পেতাম বাগান করার। কিন্তু দোতলা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

মা ও ছেলের দুটো ঘরই দরকার !

সীতুদের বাড়ির ওই ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লেগেছিল। প্রত্যেকের এক একটি আলাদা ঘর। ঋষি যখন নরেন্দ্রপুরে পড়বে, ও বাড়ি এসে আলাদা একটা ঘর পাবে।

হতো না, এ সব কিছুই হতো না। কাকা যদি ওভাবে আমাকে আগলে না রাখতেন।

যখন বুঝলাম আমি সন্তানসম্ভাবিতা, তখনি তো চলে আসি। কাকা একটা প্রশ্নও করলেন না। বললেন, যা যা ! হাতে মুখে জল দে। স্নান করে ফেল।

—কিন্তু···

—সব পরে হবে। পুলিশ এসে নকড়াছকড়া করবে, সে কি নতুন কথা ? আমি ভাতে ভাত চাপাই। কাঁদিস কেন ? এমনই তো হবার কথা ছিল।

—সীতু তো খুন করেনি ···

—কে বলল ? মল্লিক প্রমাণ করেই ছাড়বে সীতু খুন করেছে। টাপুকে সরানো তো ওর দরকারই ছিল। টাপু অনেক কাজের সাক্ষী। সীতু গাধার মতো টাপুর সঙ্গে মিশে, জগাখিচুড়ি পাকিয়ে…মল্লিক তাকে পাঁঠা বানাল।

—যদি না যেত…

—তাহলে টাপু তোদের বাড়ি বোমা টপকে দিয়ে তার রাগ জানাত। আরে সমাজবিরোধী হতে হলে কড়াচামড়া থাকা চাই। সীতু গর্দভ · বাপে কেরানী মায়ে শিক্ষিকা… তুই যাস টাপুর চেলা হতে ? কোনও পরিণত হয়নি চরিত্রে …গেলি স্নান করতে ?

স্নান করে ভাতেভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

কী আশ্চর্য ঘুমিয়েও পড়লাম।

আমি আর দাদা কাকার কাছেই মানুষ।

আমার শৈশবে বাবা, কিছুকাল পরে মা মরে যায়। আমাদের যৌথ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা হবার কালে কাকা আমাদের ভার নেন ! এটাকে তিনি কোনও বড় বা প্রশংসাযোগ্য কাজ বলে ভাবতেন না।

বলতেন, সবাই তো শরিক। আমিই নিকটতম। স্বদেশীয় পোকা ছিল, ফলে অকৃতদার। সহোদর দাদার ছেলেমেয়ে পালন করা কি বড় কাজ হল ?

এই তিনখানা পাকা ঘর, টালির রান্নাঘর, এবং সবশুদ্ধ চার কাঠা জমি কাকারই কেনা। স্বাধীন ভারতে কাকা রাজ্য-আবগারিতে চাকরি পেয়েছিলেন। বছর পঁচিশ কাজ করে কাজ ছেড়ে দেন।

সীতুর ব্যাপারে করা যায়নি কিছু। তার তো যাবজ্জীবনই হল !

কাকা বললেন, এখন পেটেরটা সুপ্রসব হোক, তা বাদে অন্য কথা।

ঋষিকে কাকা যে ভাবে তেল মাখাতেন, সে দেখার জিনিস। বলতেন, অবাক হবার কী আছে ? তোকেও করিয়েছি। তোর মা তো…চিররুগ্ন ছিল।

—আমার বাবা ?

—দুর্বাসার পুনর্জন্ম।

বিয়ের পর আমি কাজল রায় মল্লিক লিখছিলাম, ফিরে এসেও তাই। কোনও দিন ঋষি বড় হলে, বুঝবার মতো পরিণত হলে ওকে তো সবই খুলে বলতে হবে। ঋষিই ঠিকই করবে, ও কী করবে।

দাদা ফিরে এল, সব শুনল। বলল, তুই চাইলেই ডিভোর্স পেয়ে যাবি এক তরফা।

—কী বলব ? সীতু খুনী ? খুনের অপরাধে জেল খাটছে তা যেমন সত্যি, খুন করেনি তাও তেমনি সত্যি। আমি ডিভোর্স করলে সেটা অনৈতিক হয়।

—তুই কি সীতুর কাছে আবার…

—দাদা! সে সব আমি ভাবছি না। আমি এসময়টা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না পারতপক্ষে, সীতুর সঙ্গে তো নয়ই। ঋষিকে আমি এ-জেনে বড় হতে দিতে চাই না, যে ওর বাবা একজন লাইফার।

—বাঁচাবি কী করে?

—যেমন করে পারি।

—তুই কি পারবি?

—কাজ খুঁজে নেব। বাঁচব।

কাকা বললেন, স্কুল তো অনুমোদিত এখন। কাজলের কাজের অসুবিধা হবে না।

দাদার সূত্রেই কুমার যাওয়া আসা শুরু করে। কুমারের সূত্রেই আমি দেড় বছরের শিশুকে তিলজলা 'হোয়াইট রোজ' মিশনারি কিন্ডারগার্টেন ও ক্রেশ-এ ভর্তি করি। চার ক্লাস ওখানেই পড়াই। ক্লাস ফাইভ থেকে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে,—সেও কুমারের চেষ্টায়।

ঋষিকে রেখে বেরিয়ে এসেছিলাম। ট্রেনে ফেরার সময়ে কুমার কী উদ্বেগে বারবার দেখছিল, আমি ঘুমোচ্ছি কি না। কাঁদছি কিনা।

আমি বললাম, ঘুম হয়তো হবে না। তবে আমি কাঁদব না কুমার।

কান্না তো আমার কাছে বিলাসিতা এখন।

সেদিন বা কী কী নিয়ে কাঁদতাম?

সীতুকে জেলে যেতে হল বলে?

লাইফারের বউ সন্তান নিয়ে কী করবে বলে?

দাদা, আমার দাদা এমন নিষ্পর হয়ে গেল বলে?

দাদার পরিবর্তনটাই দুর্বোধ্য লাগে।

আর, কী তার কারণ!

দাদার সঙ্গে কুমারের বোন বিনীতার বন্ধুত্ব ছিলই। গা ঢাকা দেবার সময় দাদা অনেকবার ওদের বাড়ি থেকেছে।

দাদা মুক্তি পেল। বিনীতা তখন খুব আসে যায়। কুমাররা বেশ ক'জন তখন চাকরিতে ঢুকে গেছে। কুমারই বলল, ঝাড়গ্রামের কাছে এই নতুন আবাসিক স্কুল হয়েছে। ইংরিজি আর অঙ্কের লোক নেবে। চেষ্টা করব?

মাসখানেকের মধ্যেই দাদা আর বিনীতা কাজ নিয়ে ওখানে চলে যায়।

ওরা ওখানেই স্থিত হয়ে বসেছে।

জমি কিনেছে কোথাও, বাড়িও করবে।

ওরা কাজ পেয়ে চলে গেল। এলটেকনো কোম্পানির ল-অফিসার কুমারকে নিয়ে কাকা সে সময়েই উইল করেন।

বললেন, তোকেই সব লিখে দিলাম কাজল।

—কাকা, এ কাজ কোর না।

—কেন ?

—দাদা কী ভাববে ?

—ভাবার কথাই ওঠে না। এ কি এজমালি সম্পত্তি ? এ তো আমি করেছিলাম। তোদের নিয়ে থাকব বলে। এখন মল্লিক বাবুরা অনেক। জমির ক্ষুধা বাড়ছে। সেদিন যা ছিল…মানে ষাট সালে…জমি ও বাড়ি ন' হাজার টাকা…এখন তার…

—অনেক দাম।

—বরুণ আমাকে সমর্থনই করবে। ওরা দু'জনে রোজগেরে। কুমার তার বোনকে দেখবেও। তুই একা। তায় স্ত্রীলোক। তায় সন্তানের মা…তোর একটা সিকিউরিটি দরকার।

কাকা একটু হাসলেন। বললেন, একদা সব জল আর জঙ্গল ছিল। তারপর মানুষ বসতি। খড়ের চাল, গোলপাতার চাল, বেড়ার ঘর, মাটির ঘর। এখন আবার পাকা বাড়ির জঙ্গল হবে, হয়তো হাইরাইজও উঠবে।

—তখন ?

—তোর এই জায়গা-বাড়ি এর দামও উঠবে। সামনের দিন আরও কঠিন আসছে কাজল…

—আমার সংকোচ লাগছে।

—কুমার চমৎকার লিখেছে গুছিয়ে।

—আমি ঠিক চালিয়ে নিতাম…

—সন্দেহ করি না। কিন্তু আমার স্বোপার্জিত এই প্রাসাদ ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য যদি তোকে দিয়ে যাই, আমাকে আটকাবে কে ?

কাকা কী সুন্দর হেসে কথাগুলো বললেন। তারপর বললেন, বরুণ তো আসবে লিখেছে, এলেই বলব। সে কিছু ভাববে না।

—জামা গলাচ্ছ যে ?

—রবিবার, তোরও ছুটি। যাই একটু মাছ আনি গে। কাঁচালঙ্কা কালো-জিরে দিয়ে মাঝের ঝোল আর আলু-উচ্ছে ভাতে। ইচ্ছে করছে কাজল। মনটাও হালকা হয়ে গেল…তুই ছেলে নিয়ে আতান্তরে পড়তিস…এখনও তো অনেক বছর লাগবে ওকে বড় করতে…

মাছ বলতে বুঝতেন চারাপোনা। চারাপোনায় পাতলা ঝোল…আলু উচ্ছে ভাতে বড় তৃপ্তি করে খেলেন। বললেন, আজ একটু ঘুমাই গিয়ে।

বিকেলে ডেকে তুলব, চা দেব, কাছে গিয়ে বুঝলাম কাকা নেই।

আমার মনে হল মাথা থেকে আকাশ সরে গেল। দাদা এল। বিনীতা এল।

কাজকর্ম চুকে গেলে উইলের কথা বলল কুমার।

দাদার মুখটা আমার মনে থাকবে চিরকাল। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

দাদা বলল, ভালো···কাজলের আর ঋষির কথাই ভেবেছে···আমার বা টিটোর কথা ভাবেনি···কিন্তু কী দরকার ছিল কাজল? আমাকে বললে আমি 'না' বলতাম! কক্ষনো না।

—দাদা। বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না। মৃত্যুর দিনই সকালে বললেন আমাকে।

দাদা শুনলই না। বলল, কাজলের যে বেশি দরকার সে তো আমি জানি। আমার সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেই হতো।

কুমার বলল, কাজল জানত না বরুণ। হাঁপানির শেষ অ্যাটাকটার পর তাড়া করলেন...কাজল তো তখন ছেলেকে দেখতে গেছে···

—আমাকে বিশ্বাস করল না কাকা···কবে থেকে মানুষ করল, সব দায়-ঝকি সামলাল···আমাকে বিশ্বাস করল না...আমাকে বললে···

আমি বললাম, কুমার। উইলটা দাও, ছিঁড়ে ফেলি।

দাদা বলল, না কাজল। কাকার শেষ ইচ্ছাকে তোমার সম্মান করা উচিত।

—দাদা! কোনও দিন এ বাড়ি আমার একার হতে পারে না। তুমি বুঝছ না কেন...

—তোকে কিছু বলছি না কাজল। শুধু কাকা যে আমাকে বিশ্বাস করল না···

কুমার আবারও বলল, শরীরে কিছু বুঝেছিলেন বরুণ। আমি এখানেই ছিলাম। কাজল না থাকলে উনি তো গোপালের ভরসাতেই থাকেন। এবার আমাকে বাড়ি যেতেই দেননি।

—ও! আচ্ছা·· ঠিক আছে।

বিনীতা সবসময় কটকট করে ন্যায্য কথা বলে। ও বলল, তুমি কাছে থাকতে না···কাজল থাকত...তা ছাড়া কাজলের অবস্থা সত্যিই...একটা সমাজবিরোধী ···সে আবার ফিরে আসবে···ঠিকই তো করেছেন।

—কাকা আমাকে বিশ্বাস করল না।

এই অভিমানে দাদা এত দূরে সরে গেল, এত দূরে · সীতুর মা তো কত কথাই জানেন না।

নীতু বা গীতির কাছে 'সীতু' নামটি নিষিদ্ধ তা জানি। বিনীতার কাছেও? দাদাও কি তাই ভাবে? জানি না। আমি আর দাদা কাঁঠালবিচি পোড়া আর তেল লঙ্কা দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছি...দাদা পালিয়ে বেড়াচ্ছে··· আমি রাত জেগে বসে আছি···পুলিশ সর্বদা নজর রাখছে···বর্ষায় নালায় মাছ ভেসেছে, দাদা জামা খুলে তাতে মাছ বেঁধে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে ··

দাদার কাছে আমিই যাই মাঝে মাঝে।

কত, কতবার বলেছি, আয়, দুজনে ভাগ করে নিই ওটুকু।

না।

কাকা যখন বিশ্বাস পায়নি, আমি ও থেকে কিছু নেব না।

সীতুর মা আর বাবা কি জানেন, আমি কত একলা? ওদের দু'জনে দু'জনের জন্যে আছেন।

আমি?

কাকা নেই। দাদা থেকেও কাছে টানে না আর। বিনীতার যুক্তিপূর্ণ কটর কটর কথার মুখোমুখি হলে ধৈর্য থাকতে চায় না আমার।

কুমার অবশ্য চেষ্টা কম করেনি।

আমাকে তোমার ভার নিতে দাও, আমাকে তোমার ভার নিতে দাও—অনেক বলেছে।

ভার তো আমি কাউকে নিতে দিইনি কখনও।

কিসের কিসের ভার নেবে কুমার, তুমি?

আর্থিক দায়?

আমি মাইনে পাই, কোচিং চালাই, যথেষ্ট রোজগার করি, ছেলের খরচ চালিয়েও উপোস করি না।

গ্যাসও আনি, ইলেকট্রিক বিলও দিই। বাজার দোকানও করি। জামাকাপড় কিনি, অসুখ হলে ডাক্তার দেখাই।

আর্থিক দায় কেউ নিতে চাইলেও দিতে পারি না, কেননা নিজেরটা নিজের রোজগারে চালিয়ে নেয়া অভ্যাস হয়ে গেছে অনেকদিন।

অন্যায্য ভারের হিসেব দিই।

দাদার এই দুর্জয় অভিমান, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার যে বেদনা, তার ভার তুমি নেবে কেমন করে? এ তো সঙ্গের সাথী হয়ে রইল।

কাকার মৃত্যুর শূন্যতাও কি কোনওদিন ভরবে?

তুমি বলো, সীতুকে ডিভোর্স করে তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম।

'বলো' বলা ঠিক হল না। একদিন বড় দুঃখে বলেছিলে। বড় যন্ত্রণায় বলেছিলে।

সেই কাজটা অত্যন্ত সহজ বলেই করা গেল না কুমার। সে কাজ করলে এবং আমায় বিয়ে করলে ঋষিকে বলাই যেত, বারো বছরেও না ফিরলে ধরে নিতে হয় সে নেই। তখন? অনেককাল আগে মেয়েরা বিধবার পোশাক পরত। এখন মেয়েরা যে চায়, বিয়ে করতেই পারে।

তোমাকে ঋষি ভালোবাসে, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে জানে, ধরে নিলাম ও মেনে নিত।

আমাকে এ পরামর্শ সীতুর বাবা, মা, আমার দাদা, সবাই দিয়েছে।

সীতু যদি কনটেস্ট করতে পারত, হয়তো ডিভোর্স করতাম। কিন্তু সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। আমাকে ও বাধা দিতেই পারবে না। শুধু আমি যেন আমার কাছে ছোট হয়ে যাব।

না, আমি তাকে ভালোবাসি না। কবে বেসেছিলাম, সে স্মৃতিও মনে পড়ে না।

কিন্তু সে যে আছে, তার ছায়া যে লম্বা হয়ে আমার জীবনে পড়ে আছে, সে ছায়ার গুরুভার কেমন করে নেবে কুমার?

সীতুদের বাড়ি থেকে যখন চলে আসি, তখন একটা কথাই ভেবেছি। যে সন্তান জন্মাবে, শৈশব থেকেই যদি তাকে জানতে হয়, যে তার বাবা খুনের দায়ে জেল খাটছে, তার মন তো সুস্থ হয়ে বাড়তে পারে না কুমার।

সীতুকে বিয়ে করেছি আমি। সেই সীতু সাজানো কেসে লাইফার হয়ে গেল। এর দায় সেই অজাত শিশু কেন বহন করবে?

সে বড় হোক,—মনটা তার ততটা পরিণত ও মুক্ত হোক, যে এ কথাটা জানার পরেও সে মাথা তুলে চলতে পারবে,—তার আগে তো তাকে সে কথা বলা যাবে না।

আমাদের, বা বিশ্বের কোনও সমাজে কি দেখেছ, যে লাইফারের সন্তান বিষয়ে সমাজ খুব প্রগতিশীল? বিচারশীল? সহানুভূতিশীল?

সে সব সন্তান কি স্বাভাবিক, সুস্থ, কর্তব্যপরায়ণ সামাজিক মানুষ হয়ে বড় হয়?

আমি তা মনে করি না।

ঋষিকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার দায়িত্ব আমার একার। বিশ্বাস করো, এর ভারও কম নয়! ভারটা আমার একার। তুমি কেমন করে নেবে? 'নাও', তাই বা বলব কেমন করে?

লাইফারের বাবা, মা, ভাই, বোন স্ত্রী হওয়া এক কথা। সন্তান হওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা।

ঋষি না থাকলে কবেই আমি মুক্তি চেয়ে নিতাম সীতুর কাছে। উল্লসিত মনে নয়, সদুঃখেই বলতাম হয়তো।

কিংবা তখনও মনে হতো, ছি ছি, এ কী করছি। এমন করলে ছোট হয়ে যাব।

জটিলতা অনেক, কুমার।

ডিভোর্স করাটা যুক্তিপূর্ণ সমাধান, খুব র‍্যাশনাল কাজ হতো।

জেনেও করা কঠিন।

কী জটিলতা দেখ,—সীতুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না বলেই সে

সম্পর্ক ছাড়তে পারব না, সীতুর ছায়া এমনই গুরুভার।

এত সব ভার বহন করে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেও তোমার বা আমার প্রতি সুবিচার করতে পারব না।

অথচ তোমার বন্ধুত্ব আমার কাছে খুব দামী। কত দামী, কেমন করে বোঝাই।

আসলে তোমার ভালোবাসার, সুখী করবার, শান্তি দেবার বন্ধু হবার ক্ষমতা অনেক।

যে কোনও ভালো মেয়েকে তুমি সুখী করতে পারতে। কথাটা ভেবো। আমিও শান্তি পেতাম।

সীতুকে ওর নিজের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম। ও ফিরেও আসছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিণত ছিল না ও, নিজস্ব ন্যায়নীতির ধারণা খাড়া করেছিল একটা, যে টাপুকে একবার সাহায্য করলেই ওর শোধবোধ হয়ে যাবে সব। তা যে হয় না, সে ও বোঝেনি। টাপুরা সুষেণ মল্লিকরা কখনও এর দিকে পাল্লা ভারি, কখনও ওর দিকে,—এমন খেলায় সীতুরা সর্বদাই থেঁৎলে যায়। সীতুরা সেই জ্যান্ত ছোট মাছ, যারা বড়শি গাঁথা হয়ে খাবি খায়—এবং মেছুড়ে বড় মাছ ধরে। জ্যান্ত মানবশিশুর টোপ দিয়ে বাঘ মারার গল্পও তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন।

কেন বা সীতুকে দোষ দিই? নিজস্ব ন্যায়নীতির বা কর্তব্যের একটা নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি করে নিয়ে তাই মেনে চলতে চলতে আমিই কি এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি হয়ে যাইনি?

এখন তো খুবই কাঁটা হয়ে আছি।

সীতু যে কোনও দিন ফিরবে।

তারপর?

। হিতেশ ও প্রতিমা

—সীতু···তিনদিন আগে ছাড়া পেয়েছে? তিন দিন?

—তাই জেনে এলাম।

—কিন্তু সে তো এখানে আসেনি?

—না।

—তবে কোথায় গেল?

—জানি না।

—তিন দিন!

—হ্যাঁ···প্রতিমা। বুঝতে পারছ? আমরা সীতুর ছায়া থেকে মুক্তি পাব না ভেবেছিলাম···সে আমাদের কিছুই না জানিয়ে সরে গেছে।

—কিন্তু কোথায়, কোথায়, কোথায়?

"বাবা, মা,—দোষ নিও না। বাড়ি ফিরতে পারলাম না। আশংকা ক'রো না মন্দ কিছু করতে যাচ্ছি। বেরোবার কালে হাজার দুই টাকা পেয়েছি···আর ব্যাংকে যা রেখেছিলাম, সে টাকা তোমরা বা কাজল তখনো ছোঁওনি, এখন আমারই দরকার। টাকাটা আমি তুলে নিলাম।

রং, তুলি, কাগজ সঙ্গে নিলাম। আমাদের শিক্ষক বলতেন, আমার ছবি হবে। চেষ্টা করব।

আমার জন্য তোমরা কোনও চিন্তা ক'রো না। আমি সমাজবিরোধী কাজে যাব না। দণ্ডনীয় বা কলংকজনক কিছু করব না।

তোমাদের অনেক বছর ধরে অনেক ক্ষতি করেছি। এখন তোমরা সবাই নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আমি আর ফিরব না।

কাজলকেও একথা বলে দিও। লিখে তার অস্বস্তি বাড়ালাম না। সে ঋষিকে বলতেই পারে, ঋষির বাবা আর ফিরবে না।

বাবা, মা,—আমাদের শিল্প-শিক্ষকের সঙ্গে আমার সামান্য যোগাযোগ থাকবে। তাঁর কাছে আমার নামে কাজল জানাতেই পারে। সে বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে একতরফা ডিক্রি পাবে!

আমি ভালো থাকব। তোমরাও যে যেখানে আছো, ভালো থাকো। জেলে না এলে বুঝতাম না আমাকে রাখতে পারছ না, ফেলতে পারছ না, কী অসহ কষ্টে ফেলেছি সকলকে এত বছর ধরে।

আমার জন্য চিন্তা ক'রো না। ভুলতে না পারো, আমি ভালো থাকব জেনে শান্তিতে থাকো, তোমরা সবাই।—তোমাদের সীতু।

হিতেশ বললেন, ওদের···সকলকে···জানিয়ে দিই।

প্রতিমা ক্ষীণ, কম্পিত স্বরে বললেন, দাও।

—কেঁদনা প্রতিমা···সীতু নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। আমাদের···মুক্তি দিয়ে গেছে।

ফিরল না

নাম আন্না, ওরফে অনুরাধা, ওরফে গোপালের মা। কেন তার এত নাম, জিগ্যেস করলে সে এক বিত্তান্ত বটে। প্রথমে জেলে সে গুম্ মেরে থাকত, অনেক জিগ্যেস করলে বলত, মা বলত আন্না। তা তখনে আমি কোলের মেয়ে। কলকেত্তার বাড়িউলি মাসি বলল, এমন মেয়ের নাম আন্না রাখে গো কেউ? নাম রাখবে জমকালো। তা তিনিই নাম রাখল বটে।

নাম আন্না, ওরফে অনুরাধা নস্কর। স্বামী পশুপতি দস্কর। সাকিন ঃ হেঁতালপাড়া, ডাক ঃ মসিলপুর, থানা ঃ বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা।

কিন্তু এটা ওর ঠিকানা নয়। ঠিকানা আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার। অপরাধ, পিঁড়ি তুলে স্বামীর ডান কাঁধে গুরুতর আঘাত হানা। অপরাধটি "ইচ্ছাকৃত আঘাতকরণ" বা ভলান্টারি কজিং অফ হার্ট।

অপরাধটি কত গুরুতর?

৩১৯ নং ধারা বলে, যদি কেহ অপর ব্যক্তির শারীরিক যন্ত্রণা, ব্যাধি কিংবা অকর্মণ্যতা ঘটায়, তবে তাহাকে জখম করা বলে।"

৩২০ ধারা মতে গুরুতর আঘাত বলে আট রকম আঘাতকে। না. পশুপতির জীবনের আশঙ্কা হয়নি। কিন্তু তাকে কুড়ি দিনের অনেক বেশি শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সে শুধু সেই সময়ের জন্য স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে অক্ষম হয়নি,—কোনওদিনই সে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড ঘুরিয়ে রমণীদের দেখতে পারবে না। এমন আরও আরও ছুটকো উৎপাত দেহে বাসা বেঁধেছে।

ডান কাঁধের হাড় এবং কলার বোন চার চৌচির। হাসপাতালে দীর্ঘদিন কাটাবার পর সে ঘেড়ো ভূত হয়ে গেল। মাথা ডাইনে হেলানো, কাঁধ ডেবে বসে গেছে। ফলে ডান হাতটি অকেজো প্রায়। এ কথা জেনে আন্না বড আশ্চর্য হয়েছিল।

—মল্য না মিনসে? কিসের পরাণ গো!

বিরস গলায় তার মামা বলল, মাথায় মাল্যে মত্ত।

—মাতায় মারিনি?

—মাল্যে যাবজ্জেবন হত।

—তাতেই সাত বচর হোল ?

—তাই।

—দেহগতিক কেমন, মামা ! সাত বচর থাগবে ?

—মোটে তো চুয়াল্লিশ বচর বয়েস। অনেক কাল থাগবে।

—থাগলেই ভাল।

এ অপরাধের জন্যেই আন্না্র সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়। না, আন্না একবারও নিজের দোষ কাটাবার চেষ্টা করেনি। কি থানায়, কি সদরে, পরে দায়রা আদালতে, ও ঠোঁট টিপে তীব্র চোখে তাকাচ্ছিল। মা দেক, মুকে আঁচলচাপা দে কান্নায় কাঁপতেচে। মামা তারে কি বলচে।

কেসটি রাজ্য বনাম আন্না, ওরফে অনুরাধা নস্কর। অপরাধ গাঁজার দমে বড় পিঁড়েয় বসে দোলায়মান স্বামী পশুপতির কাঁধে সজোরে উঁচু খুরোর ছোট পিঁড়ে দু'হাতে তুলের দমাস করে নামানো। মাথাটি-ই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু টার্গেটের দোদুল্যমানতার ফলে তাক ফসকে যায়।

না, আন্না ওরফে অনুরাধার হয়ে উকিল দেবার ক্ষমতা ছিল না আন্নার জননীর। মামা বলল, হেদিয়ে বা মরচো কেন ? হতভাগী বার বার স্বীকার যাচ্ছে যে ওই মেরেচে। বাঁচাবে কাকে ?

শেষ অবধি আদালতই আন্নার জন্য উকিল ঠিক করে দেয়।

সে উকিলও তেমন সাহায্য করতে পারেনি। কেস ছিল রহস্যজনক।

আন্না চোদ্দ বছর বয়সে হেঁতালপাড়ার বউ হয়ে ঢোকে। চোদ্দ থেকে তেত্রিশ, এতগুলো বছর সে এমন একটা কাজ বা আচরণ করেনি, যা থেকে কেউ বুঝবে যে কোনওদিন সে রণচণ্ডী হতে পারে।

পঞ্চায়েত সদস্য অনুকূল নস্কর কেন যেন আন্নাকে খুব স্নেহ করেছিল। অনুকূল, সম্পর্কে পশুপতিরই কেমন যেন কাকা। হেঁতালপাড়া গ্রামে নস্করপাড়া লম্বায় চওড়ায় অনেকখানি। এখানে আদি নস্কর কে এসেছিল, তা জানা দুর্ঘট। কেননা সকলেই দাবী করে, তার পূর্বপুরুষ আগে এসেছিল।

কোন সময়ে এসেছিল তা জানাও দুর্ঘট। তবে নস্করদের দাবী এরকম,—তারা এ তল্লাটে রাজাগজা ছিল,—ধান-মাছ-দুধ অসচ্ছল ছিল সকলের—এরা বীর ছিল,—দাপটে মেদিনী কাঁপত।

অনুকূল ধীর সুস্থির লোক। বাজারে তার মুদি দোকান আছে, গোলদারী আড়ত আছে। সেখানে ধান চাল কেনা বেচা চলে পাইকারী দরে। হাসকিং মেশিনও আছে। নিঃসন্দেহে হেঁতালপাড়ায় সে সম্পন্ন মানুষ।

অনুকূলের একতমা কন্যা বিয়ের হলুদ গায়ে মেখে পুকুরে নেমে ডুবে যায় পায়ে কাপড় জড়িয়ে। আন্নার মুখে যেন তারই আদল।

অনুকূলই যা বলল, পোশা তো ওই এক জাতের মানুষ। হেথাসেথা

ঘুরল—কিছু জুটল তো করল,—সংসারী নয়। গোপালের মা-ই ধানভাপারি করে সংসার চালায়। শান্ত লক্ষী মেয়ে। এতদিন এসেছে, কেউ দুর্নাম দিতে পারবে না। যদি এ কাজ করেছে তো শোকেতাপে পাগল হয়ে।

কিসে শোক?

দু'দুটো মেয়ে বাপের সঙ্গে সাগরে মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গেল। পরের মেয়েটা মরল ম্যালেরিয়া জ্বরে মাথায় রক্ত উঠে। তিন মেয়ের পর ছেলে হল, সেই থেকে ও গোপালের মা। জন্মেছিলই রোগাভোগা। দুটো পা লটলট করত। সেও গেল একবছর না হতে।

তা বাদে দুটো যমক মেয়ে হল। হয়েছিল হাসপাতালে। তখন কিছু ব্যবস্থা করে এলে জানি না। এই মেয়েদের সর্বদা চোখে চোখে রাখত।

কত বলেছি, বউমা! গাঁয়ে ইসকুল। ওদের পাঠালে পার? একটু পড়ত?

বলত, না কাকা! পায়ে পাঁড় আপনার।

রাতে মেয়েদের নিয়ে শুত।

তা সাগরের মেলার আগে আগে হঠাৎ একদিন মেয়েদের নিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে।

একাই ফিরে আসে।

পোশা খুব চেঁচাচ্ছিল, মেয়েদের মেলায় নে' যেতু। মেলায় নে' যেতু।

বউয়ের গলা শুনিনি।

তা বাদেই তো এই কাণ্ড।

কী বলছ? শোকে দুঃখে পাগল হয়ে এমন কাজ করলে আগে করত? কেউ আগে করে, কেউ পরে করে।

আমার ভাগনা রবির সঙ্গে বউমার কোন কুসম্পর্ক্য?

ছি ছি ছি ছি! রবি পোশার সাথের সেথো। গাঁয়ে ওই দুজনে নিকম্মো দাকড়া বটে! রবি বউমাকে মায়ের অধিক ভক্তি করে, দিনে দশবার তার পায়ের ধুলো খায়। রবি তো আধা পাগলা, তায় নিকম্মা। এর বাড়ি তার বাড়ি খায়। মেয়েছেলেদের মত ঘর উঠোন নিকোবে,—জ্বালানী এনে দেবে,—খাওয়ার জল টানবে,—এক থালা ভাত খেয়ে চলে যাবে।

অনুকূল আন্নাকে বাঁচাবার চেণ্টা করলে কী হবে? আন্না বলল, বলেচি তো মারব বলে মেরেচি। অৎ কতা বলচো কেন?

—মাথায় মারলে মরে যেত।

—মাতা বলেই মেরেচি। ফশকা হয়ে যাবে তা জানি? মল্যে ল্যাটা চুকে যেতু।

—কিন্তু কেন?

—আমার পঞ্চমী, আমার সপ্তমীরে কি করে এয়েচে গাঁজাখোর পিচাশ ?

অনুকূল তাড়াতাড়ি বলল, তারা মেলায় হারিয়ে গেচে গো বউমা !

—কারে বলচেন গো কাকা ! মেয়ে হারালে বাপ পুলিশের দোরে যায়নে মোটে ? খোকার জন্যে আকাশপাতাল খুঁড়ে ফেলে নে ?

—অনুকূল নস্কর মাথা নাড়ল মহাদুঃখে। সাগরের মেলা হল মহা মেলা ! অগণন মানুষে যেন দইদই ! বছর বছর মানুষ হারাতেই পারে। পুলিশে বাবে পোশা ? সে তো পাগল হয়ে হেথাসেথা ঘুরে মরছিল। রবিই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে আনে। কেন ! প্রথমবারে পোশা উঠোনে গড়িয়ে কাঁদে নি ? যেথা পঞ্চমী নি', সে ঘরে ঢুকবে না রে ?

আন্না মাথা নাড়ল।

অনুকূল পরে বলল, বউমা যেন জেলে যাবে বলে অস্থির হইছিল।

হেঁতালপাড়া গ্রামে, আন্না, ওরফে অনুরাধা কর্তৃক স্ব-স্বামীর ডান কাঁধে পিঁড়ির আঘাত হানা,--নিজ দোষ কবুল করে জেলে যাওয়া,—পোশা বা পশুপতির ডায়মনহারবার হাসপাতালে পড়ে থাকা, ইত্যাদি ইত্যাদির মতো চমকপ্রদ ঘটনা বেশ কিছুকাল প্রিয় গসিপ হয়ে থাকে।

তারপর, ক্রমে ক্রমে, অন্যান্য ঘটনার নিচে সেটি চাপা পড়ে যায়। পোশাকে এখন বাধ্য হয়েই মাতলাঘাটে বা ট্রেনে ভিক্ষে করতে বেরোতে হয়।

রবি হাঁড়িহেঁসেলের ভার নেয়। এ সময়েই পোশা চালু হিন্দি ফেলমি গানের সুরে "মন ! আপন আপন করচো কারে, শ্যামা শ্যামা করো !" অথবা "চক্ষু থাকিতে অন্ধ যে জনা ' কে তারে করিবে দৃষ্টি সমর্পণ !" ইত্যাদি গান গাইতে শুরু করে।

অনুকূল বলে, এই তো মনটা ভাল দিকে যাচ্ছে। তাইলে মনসাতলাতেই গান গা ! পয়সাও পাবি, পেটও চলবে !

রবি বলে, বউদিদি তোমারে মানুষ করে দে' গেল দাদা ! ঠ্যাঙা খেয়ে তবে গান বেরুলো গলা দে !

—ওরে ! দশদিন চোর থাগলে একদিন সাদু হতেই হবে !

—আর পাপ কোরনি।

—আর করি ?

--মেলাগুনো ধরি গে' চলো !

—নাঃ ! হেতাই মাটি নোব।

বস্তুত, পোশার নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। সে চুল দাড়ি কাটে না। সে গেরুয়া ধুতি ও গেরুয়া ফতুয়া পরে।

ডানদিকে হেলানো ঘাড়ের ও নলনলে ডানহাতের জন্য তাকে রাক্ষস-রাক্ষস দেখাত। এখন অন্যরকম দেখায়।

সবাই বলে, পোশা পালটে গেচে একবারে। সারা জীবন—

এমন কথাও হয়, গোপালের মা'র আগে যে দু'জন বউকে পরপর বিয়ে করে পোশা,—কোন পণ যৌতুক না নিয়ে—তারপর ক'দিন বাদে রুপোর চুড়ি, দুল, একটি ফঙ্গবেলে কলসি ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে "দুশ্চরিত্র" নাম দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, —তাদের কারুকে ডেকে আনবে কি না!

বউ বিনা ঘর যেন লবণ বিনা তরকারি।

পোশা অসীম ঔদার্যে বলে, তখনে ওরকমটাই চলছিল! আজ বে করে, বলো পণযতুক নেব না,—তা' বাদে চাটি নাটি যা দিয়েচে, কেড়ে নে' তাইড়ে দাও,—তাতেই ও কাজ কিরিচি। তাদের খপরও রাকিনি। আর অ্যাদ্দিনে তারাও বোদায় ঝি খাটতে চলে গেচে,—না,—আর না।

সকলেই সম্মতিসূচক মাথা হেলায়। পোশা বলে, কৎ রকম বে এইছিল বলো তো? বিহার থেকে এইচি,—সেতা মেয়ে মেলে নে',—মেয়ের বাপরে টাকা দে' খর্চা দে', বে করে নে' যাব,—খুব চলল কিচু কাল। যকনে জটাধারী তিনশো টাকা নে' মেয়ে বে' দেয়···

রবি বলে, সে তো বে' নয় দাদা! তারা তো মেয়েদেরে···বেবুশ্যে করে রাখত···

—তাও কতা বটে! সে হাওয়াটা মল্য, তো "পণযতুক চাই না,—মেয়েরে যা দেবে দাও"—এমন হাওয়াটা এল। তকনে একোজনা দশটা বে' করেচে। দেশাচার বলে কতা। আমিও কিরিচি! তা' বাদে? গোপালের মা যেদিন হতে এয়েচে···আমার পা টলি নি। জেবন আলুনি হয়ে যাবে? হোক না।

—কিন্তুক···

—মনসাতলার মাটি খাচ্চি। ধাত গরম হয় নে মোটে।

বলেই পোশা "হাওয়া হাওয়া! এ হাওয়া"-র সুরে "কে বলে মা কালো তুমি" গান ধরে।

সবাই ধন্য ধন্য করে। ডাকাতি—ছেনতাই—মামলা—খুন জখম—বউ খুনের ঐতিহ্যমণ্ডিত হেতাল পাড়ায় এ কি দৈবী কৃপা! পোশার মনে কী বৈরাগ্য! বহু নৌ-ডাকাতির নেপথ্য নায়ক ছোলেমান মোল্লাও ঘটনাবলী শুনে ধন্য ধন্য করে।

পোশার হৃদপরিবর্তন, ছোলেমানের কিছু লস্। পোশা মাঝেসাঝে খবরাখবর দিত বটে! কিন্তু মালের খবরদাস ও এ হেন দৈবীলীলা, কাঁটার ওজনে বহুত ফারাক! সে বলে, আল্লা কখন কাকে সুমতি দেন···

বউ মেয়েরাও টিউবওয়েল তলা বা পুকুর ঘাটে বলে, চোক থেকে "খাবো খাবো" ভাবটা চলে গেচে বটে।

অনুকূলের পুত্রবধূ মণিমালা বলে, গোপালের মা'র জন্যে কষ্ট হয় ভাই!

—সে যে সেদে জেলে গেল !

—বড় কষ্ট হয় সংসার ফেলে ··

—ভুতে ধরিছিল আবাগীকে। সাগর মেলাও কাচে আসছিল—মেলাতেই মেয়েগুলো···

—কি ফুটফুটে মেয়ে সব···

—বাপের দেহ বন্ন, মায়ের মুকচোক,

—উঁলি বুলিও সোন্দরী···

—হ্যাঁ···রূপের বাসা···

—কোতা বা নে' গেল···

—যাক্ গে ! যে গেচে, সে গেচে।

মণিমালা বলে, কষ্ট হয় খুব ! কি ভদ্দরতা, কি সব্যশান্ত মানুষ···কি কথাবাত্তা···হটাৎ যে কি হল !

—নামও রেকিছিল···পঞ্চমী···সপ্তমী···

—নিজের নাম যে অনুরাদা ?

॥ দুই ॥

আন্না ওরফে অনুরাধা, একবারও বোঝেনি, "মাতায় মাত্তে চেইছিলাম··· ইচ্ছে করে মেরিচি"···ইত্যাদি অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তির ফলে সে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কতগুলি ধারা মতে দণ্ডনীয় হয়ে গেল।

৩২১ ধারামতেও তার কাজটি "ইচ্ছাকৃত আঘাতকরণ" বলে গণ্য হয়।

৩২৫ ধারা মতে "কেহ ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও গুরুতর আঘাত করিলে তাহার সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোনও এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে এবং তৎসহ অর্থদণ্ডও হইবে।"

মা জরিমানা দিতে রাজী ছিল।

মামা জরিমানা দিতে রাজী ছিল।

আন্না চোখ পাকিয়ে বলল, কিচ্চু দেবে নে' মা। এট্টা ফুটো কড়িও দেবে নে'। নয় সাত বচরের পর আর ক'মাস রাকবে। রাকুক।

—কিচু আগে বেরোতি ?

—তুমি যদি টাকা দিওচো,—আমি হোতা মাতা ঠুকে মরবো, তোমার পাতকী হবে।

—অমন কথা বোল না মা !

—এটাই কতা মা। উঁলিবুলিরে পারো তো গত্তে ঢুক্যে লুক্যে রেকো।'

ওদের বাপ যেমন কিচ্ছুতে হদিশ না পায়।

—না ··পাবে নে।

—কতা দিচ্চ?

—দিচ্চি। এ তোর কি হল রে মা! এমন কাজ বা কল্যে কেন? এমন চোখ পাক্যে কতা বা বলচে কেন? কেউ মন্তরতন্তর কল্য কি বা।

—উনিশ বচর আগে বে' দাত।

—নয় বচর ধরে আগুনে ফেলেচে আমারে। কিন্তুক পোড়ার জ্বালা যেই টের পেইচি, মেয়েদের নে' দৌড়িচি। বুজলে কিচু?

—না রে মা।

—পরে বুজ্যে বলব। আসবে তো দেখতে?

—আবুশ্যি এসব। মা কি মেয়েরে ফেলতে পারে?

—তবে বোজো, কত দুক্যে আমি ছেলেমেয়ে তোমার কাচে রেকিচি।

—কিন্তুক···

—পঞ্চুমী আর সপ্তুমীর ঝা হয়েচে, এদেরও তা হত।

—তারা তো সাগর মেলায় ··

—এরাও হাইরে যেতু ·আর মা! উলি ঝুলিরে যেমন সোন্দর নাম দেয়নে মাসি।

—না·· দেবে নে।

—আমি হলাম অনুরাদা। দেয়েদেরে পঞ্চুম'। সপ্তুমী দশুমী·· গালভরা নাম সব তাদের নিল সঙ্গাসাগর · দশুমীরে নিল মালোয়ারি জ্বরে গোপালেরে ধরি না · সে তো বাঁচতে আসেনি·· নন্দদুলাল নামও জলে গেল। উলি ঝুলি · উলি ঝুলি থাক · যেন মার কাচে থাকে

—থাগবে, থাগবে।

—মাসির দেযা পেটো, বে'র কালে তোমার দেযা আংটি · মামার দেয়া কান-পাশা সব তোমারে দিইচি।

—দিওচো, দিওচো।

—ওদের বাঁচ্যে রেকো। তোমার যদি দেহগতি খারাপ হয, মামা জানি ওদেরে বাঁচায়...

—স—ব করব মা।

আন্নার মা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। আন্নার মামাকে বলে, এ যেমন অন্য মানুষ।

—ভয়ংকর কিচু ঘা খেয়েচে।

—তা তো ভাওচে না। জামায়ের ওপর অসাগর রাগ বটে!

—অকারণে তো হবে নে।

দুজনেরই মনে হয়, আন্না তার দিদি ভেনতি, বা ছোড়দি মেনতির মতে মুখফটা, গা-দোলানী, রং-ঢলানী কোনওদিন ছিল না। তার বয়স হতে সুমতে গেছে। আন্না ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম। মায়ের মতো।

মাতৃমুখী পুত্র সুখী পিতৃমুখী কন্যা সুখী।

এমন কত কথা, কত বচন না এককালে শুনেছে আন্নার মা। বচন বচনই থাকে, তা সত্যি হয় কে কবে শুনেছে? ছেলে তো নেই, তিনটেই মেয়ে।

বড়টা আর মেজটা বাপের মতো দেখতে, স্বভাবও তেমনি।

আন্নার মুখখানি ছিল মায়ের মতো। ধীরে চলত, ধীরে বলত, হাতে পায়ে লক্ষ্মী। সেই মেয়ের কপালে এত দুঃখও ছিল!

মা বলল, দাদা। কালীঘাটে পুজো দে' যাই। মনটা বড় কাঁদচে।

—শনি মঙ্গলে এসো বোন! উলি ঝুলিরে রেকে এওচো,—ঘরে চলো।

জেলে ঢুকে আন্না গুম মেরে থাকত। কোনও কথায় জবাব দেয় না, শুধু কাজ করে যায়, খাবার সময়ে খায়, আর সর্বদা নিজের ভাবনায় ডুবে থাকে।

মাঝে মাঝে আঙুলের কর গোণে। কী হিসেবে করে, তা ও-ই জানে।

দেখে দেখে সবিতা বলল, কথা না কওয়ালে ও নিঘঘাৎ পাগলাবাড়ি যাবে।

দিদিমণি, বা সমাজকল্যাণ অফিসারও মহা চিন্তিত। এত চুপ করে থাকা ভালো নয়।

তিনি বললেন, কি গোণো, আনুরাধা?

—ও নামে ডাকবেন না তো। আন্না বলুন।

—নামটা তো ভালো।

—যার ভাল, তার ভাল। আমি আন্না।

—বিবাহিতা মেয়ে! সন্তান আছে তো!

—পাঁচটা মেয়ে! এট্টা ছেলে।

—তোমার বয়স কত?

—চোদ্দ বছরে বে'। তা বাদে উনিশ বচর ঘর করিচি।

—দেখলে মনে হয় না তেত্রিশ বছর বয়স!

—কি মনে হয়?

—অত মনে হয় না।

—কপালে থাকলে নাতির মুক দেখতাম।

—মেয়ে বুঝি বড়?

—পেরথোমে মেয়ে।

—তার বিয়ে হয়নি?

—না।

আন্না মাথা নাড়াল। তারপর বিচিত্র হেসে বলল, দিদি! পরপর দুটো মেয়েকে নিল সঙ্গাসাগর। পরের মেয়েরে নিল মালোয়ারি জ্বরে। ছেলে তো বাঁচতে আসেনি,—এই বড় মাথা! নলনলে পা! একবচর না হতে সেও দুদ উলটে চোক কপালে তুলে শুদু ক'দিন নাম হইচিল গোপালেয় মা!

—আহা!

—আচ্ছা দিদি! মেয়ে হলে তার নামে "মা" বলে না,—ছেলে হলেই বলে?

দিদিমণি বিব্রত হেসে বলেন, আমারও তো দুই মেয়ে। সবাই টিংকুর মা বলে।

—সে শওরে চলে। হোতা চলে নে।

—আর কে রইল?

—উলি আর ঝুলি! যমক মেয়ে! ওদেরে ভাল নাম দোব না।

—তারা আছে কোথায়?

—লুক্যে রেকিচি। বাপ…আক্কোশ তো! খেয়ে নেবে! মাতায় মাল্যে মরে যেতু। গ্যাঁজার দমে ঢুলছিল তাতেই ডান কাঁদে…

—শোন আন্না! সবে এসেছো। কর গুণে গুণে কত হিসেব রাখবে?

—তাইলে যে জানতে পারব না?

—আমি হিসেব রাখি। আমি বলব। এমন গুম মেরে থেক না।

—মেয়েদের মুক ভাবি দিদি! কোনোটা কালো নয়, কুচ্ছিত নয়…

—তুমি যে সুন্দরী।

—ওই আমার মুক চোক আর চুল বাপের মত ফরসা দেহবন! কালো কুচ্ছিত হলে তো সাগরে নিত না।

—পাঁচজনের সঙ্গে মেশো, কথা বলো…নইলে কি হবে জানো?

—কি হবে?

—কেউ লাগিয়ে দেবে তুমি পাগল। আর তখন পাগলাঘরে ঠেলবে। ওখানে গেলে পাগলদের সঙ্গে থেকে তুমিও পাগল হবে। তখন আর সহজে ছাড়া পাবে না।

—না দিদি…কতা কইব। পাগলাঘরে ঠেলো না দিদি! সাত বচরে আমাকে বেরুতেই হবে।

—বেরোবে। ভালো হয়ে থাকলে আগেও খালাস হতে পারো।

—বলব।

—আমিই বলে দিচ্ছি ওদের।

মদিনার চোখ ও চুল কটাশে। রং তামাটে, শরীর পাকানো, শক্ত। সে বলল, মদিনা বেগম গো। কত বচর একসঙ্গে থাগতে হবে। কতা না কইলে হয়?

সবিতা একটু বয়স্কা, ধরনটাও ভারিসারি। বলল, বলবে, কথা বলবে।

আন্না বলল, কি কতা বলবগো ? কারেও চিনি না। জানিও না।

—দুক্কের কতা। হেতা তো কেউ সুকের কতা বলতে আসে নে। সহসা সে বিস্বরে গায়।

সুকের পাকি ধত্তে গেনু
উড়ে উড়ে যায় রে
উড়ে উড়ে যায় !

সবিতা ধমকে বলে, আবার বাই চেপেছে তোর ! ওঠ দেখি, ওঠ..

—না না মাইরি সবিতা তা আন্না ! মুক মলিন কেন ? মেরিছিলি তো জব্বর।

—মাতায় মাত্তে পারি নি···

—সোয়ামি কি মেয়েছেলে এনিছিল ?

—না তো।

—মদ খেয়ে পেটাত ?

—কোনোদিন না

—তবে ?

সবিতা বলল, তোর তা জেনে হবে কি ? এখনো এগারো বছর থাকবি মদিনা।

—গোটা জম্মো রেকে দিক না।

আন্নাকে বলে, আমার ইজ্জত আলদা। আমি হলুম গে লাইফার বুজোচো।

—কি করিছিলে ?

—বে' সাদী করে নি. আমায় রেকিছিল। নিত্যি মদ খেয়ে পেটাবে, নিত্যি পেটাবে, ওনার ওতেই আনন্দ। একদিনে অসজ্য হয়ে মাতায় বোতল দে মাত্তে মাত্তে···ফিনিশ।

সবিতা মুখ ভেঙিয়ে বলে, মাত্তে মাত্তে ফিনিশ। পালালে পারতি ? সে আর কেউ নয় মিলিটারিতে কণ্টাক্টর ছিল।

—ঝা হোগ গে। হেতা তো মারের হাত থে' বেঁচিচি। এ হাত ভাঙা, দাঁত-গুলো ভাঙা...মেরে ধরে হো হো করে কাঁদবে আর গোচা গোচা নোট ধরে দেবে।

—আর তুমি তা দেবে ধরম বেটাকে।

—"মা" বলিছিল. .আর দেকবে তো সে !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে যেমন দেখল আমার···সবিতা চুপ করে যায়। তারপর বলে, কথা কয়ে কি হবে ? নানা পাপ করে এখানে জুটেছি। যার যখন টাইম

হবে চলে যাব।

আন্না বলল, কবে যাবে দিদি?

—তোমাকে বের করে দিয়ে যাব। এখনো দশ বছর তো নিরাধার থাকব।

—ও!

—তুমি কথাবার্তা বোল আন্না। মুখ গোমড়া দেখলে বড় ভয় করে। পঞ্চমীও ও রকম···

—কি বললে?

—পঞ্চমী···কি হল?

—কত···কত বড় মেয়ে? কি করেছে পঞ্চমী?

—আমার চেয়ে বড়···সে···

—না—আ—আ—আ!

হাহাকার শুনে সবাই সচকিত। মেট দৌড়ে আসে, দিদিমণি।

—কি হল? কি হল?

—পঞ্চমী নাম বোল না গো! ও নাম আমি সইতে পারি না! আজ নয় বছর ধরে মা আমার···ও নাম বোল না গো!

আন্না মাটিতে বসে পড়ল।

এত কান্নাও বুকে জমে ছিল এতদিন!

দিদিমণি বললেন, কাঁদতে দাও ওকে। পঞ্চমী দাশের নাম বা বলেছ কে?

সবাই চুপ।

আন্না প্রায় রুদ্ধ গলায় বলল, ও নাম···বোল না তোমরা।

সবিতা নিশ্বাস ফেলে বলল, কেউ বলবে না আন্না। ওঠ···চল···হাতে মুখে মাথায় জল দে··· ।

॥ তিন ॥

ওই একদিন। আর কাঁদেনি আন্না। নিজেকে ঢেকে নিয়েছে অদৃশ্য বর্মে। যে যা বলে, করে যায়। কথা বলে নম্র গলায়, সসম্ভ্রমে। মা দেখে ভারি নিশ্চিন্ত।

—এই তো আমার সেই আন্না। এ রকমই থাকো মা। আমি শনিমঙ্গলে মা কালীর থানে···

—কালীঘাট যাচ্ছ?

—না মা! লেক কালীও খুব জাগ্যত।

—উলি ঝুলি···ভাল আছে তো?

—খুব ভাল আচে। ওদেরে দেকবি ?

—না না মা! যা শুনেচে, তা শুনেচে। হেতা ওদেরে এন না। নানা পাপী তাপী চাদ্দিকে…কে কি মন্তর করবে…

—এট্টা কতা আন্না।

—বলো ?

—দেকে তো এলি কি বড় ফেলাট বাড়ি উটেচে হোতা! আমি কাজে যাই তো ওদের নে যাই। খুব ভাল ওনারা…নইলে তিনশো ট্যাকা দিতু ?

—তি—ন—শো!

—ওই হোতাই চাত্তলাতে তিনশো, আর তেতলায় দু'শো! ওরা এসে থেগে বেঁচে আচি।

—তবে তো মা! আমি খেটেই খেতে পারব ?

—হ্যাঁ মা…তা ওনাদের দু' বাড়িতে উলি ঝুলিরে কাজে দিলু…

—ওরা কোতাও নে' যাবে না তো ?

—ফেলাট কিনেচে নাখ নাখ ট্যাকায়…ঘর দোর যেমন ছিনেমা…টেলিবিশন… মেশিনে কাপড় কাচে…হেতা থাগতে এয়েচে না ?

—মেশিনে কাপড কাচে!

—নয় তো কি ? কত্তা গিন্নি দু'ঘরেই ছেলেমানুষ। আমি ঘরদোর সাপ করি, পেত্যহ ধুলো ঝাড়ি, আর বাসন মাজি…সব ইস্টিল আর কাচের বাসন …সাবান দে' ধোও। জল ঝরতে দাও…দু' বাড়ি থেগে ওদেরে জামা রে, প্যাণ্ট রে, চুলের কিলিপ… ওরা দু' ঘরে দু' বোনরে রাকতে চায়…

—পাশের দিকে বাড়িটা ?

—হোত তো অমন বাড়ি এট্টাই…খাবে, থাগবে, টি. বি. দেকবে · পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে আমার হাতে দেবে · তোর মামা ব্যাংকে খাতায় রেকে দেবে …দোব ?

—দাও! সব্বোদা দেকতে পাবে—ওরা মারধোর তো করবে নে ? আমি ওদেরে কোনোদিন—

—না না—তোর মাসির ধম্মছেলে অজিত ? সেই তো পাড়ার দাদা—তাকে টাকা দেয় ওরা মাসে মাসে—অজিত বাড়ি পওরার অপিস করেচে না ? অজিত থাগতে সগলে ভস্সায় আচি। উলি ঝুলিরে সে নান্নি মুন্নি নাম দেচে—কত লজেন্স্ বিস্কুট দেয়—

—তাই ভালো মা! পরে মায়ে ঝিয়ে খাটব—

—আমিও নিশ্চিন্দি থাগি রে মা! ভেন্তি আর মেন্তি তো ঝকোন তকোনে আসচে—ওদের কতাবাত্তা—চালচলন—আমিও নিশ্চিন্দি থাগি। তোমারে না বলে তো দুদের বাচাদেরে কাজে দিতে পারি না!

—ওদের টি. বি. দেকতে দেবে ?

—একনি দেকে—মিত্যি দেকে—

—ওদের ছেলে পুলে নি ?

—তেতলায় এট্টা ছেলে—দু' বচুরে,—চাত্তলায় একনো নি'। একনে তো যকোন চাইবে, তকোনে হবে। সদা সব্যদা বিয়োয় না ওরা।

—দেশে ঘরেও অপোরেশন হচ্চে।

শুধু ওদের বাপ চোখ পাকাত। আন্নাকে—না না, অপোরেশন ভালো নয়,—পেট কাটলে কি উলি ঝুলি হতো ?

—নে, গজা এনিচি, আর জন্দার ডিবে...তা "হাঁ" বললি···মনটা "সু" ডাকাচে। বচরও ঘুরে গেল···ভাল হতেই হবে। মা তো ফুল নিচ্চে।

সেদিন আন্নার মনটি খুশি।

পরদিন দিদিমণিকে বলল, উলি ঝুলিরেও কাজে দিল মা! চেনা বাড়ি ·· সুকে থাগবে···

—কত বড় হল ওরা ?

—আটবচর গো!

—তাদের কাজে দিল ?

—আমাদের আর এর চে' ভাল কি হবে দিদি। বোরিয়ে দুই মেয়ে নে আমিও খাটব। তারপর...ওদেরে বে' দেব দেকে শুনে...

—লেখাপড়াটা···

—বাপ মানুষ নয়। আমি জেলে,—মা লোকের বাড়ি খাটে. .কে পড়াবে দিদি ? এ জন্যিই আমাদের হয় নে লেকাপড়া···আপনারা পারো। দুজনা গরমেনে চার্গরি কচ্য...আমাদের তো···

দিদিমণি কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। তারপর বললেন, তোমার রিপোর্ট খুব ভাল আন্না। হয়তো সাত বছরের আগেই বেরোবে।

—বেঁচে থাকো দিদি। সব্যসুকী হও।

বয়সে অনেক ছোট আন্নার আন্তরিক আশীর্বাদ নিয়ে দিদিমণি অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এত নম্র, নরম, নিষ্কলুষ আছে ও কী করে ? কেমন করে ও অন্য মেয়েদের সান্ত্বনা দেয় ? কেমন করে অসুস্থ সহবন্দিনীর মলমূত্র পরিষ্কায় করে ?

এমন মানুষের কপালে কেমন স্বামী জুটেছিল, কী করেছিল সে, যে আন্না তার মাথায় পিঁড়ি মারতে চেয়েছিল ?

যে কাজের জন্যে ও সম্পূর্ণ অননুতপ্ত ?

সব কথা কখনই জানা যাবে না।

কতবার বলেছেন, নিজের কথা বলো না আন্না।

—আমার মনে নি' দিদি।

—ভুলে গেছে ?

—হ্যাঁ দিদি।

যদি ভুলতে পারত আন্না, যদি ভুলতে পারত।

অনেক, অনেক, শত শত বছর আগে, আন্নার দিদিমা ছিল। মায়ের মা। মাথার চুল ক'গাছা শণ। নিদন্ত মুখে হাসি আর গুলতামাকের গন্ধ।

মাথা নেড়ে নেড়ে বুড়ি শোলোক বলত নাতনিদের। ভেনুতি, মেনুতি, আর আন্না।

—বল্ দিকি এর মানে কি ?

গলা আচে তলা নি ?

হাত আচে পা নি—

ভাবতেও সময় দিত না বুড়ি। বলত, বুজলি নি ? জামা রে জামা! গলা দে' গলালে, হাত দে' গলালে, পরে নিলে। তার তলা বা কোতা ? পা বা কোতা ? এই যে, বাটির মদ্যে বাটি, তার মদ্যে আঁটি! যে না বলতে পারে তার শাউড়ির নাক কাটি। এ বারে ?

ভেনুতি আর মেনুতি বলত, চালতে! চালতে!

এমন অনেক শোলোক জানত বুড়ি। জানত উড়ন্ত সাপের গল্প, কে মাছ ধরে মাছের পেট থেকে আংটি পেয়েছিল, তার গল্প,—শেয়ালের ঘরে ছেলে মানুষ হয়েছিল, তার গল্প।

নাতনিদের খিদে পেলে বুড়ি ছাতুর নাড়ু খেতে দিত।

তখন আন্না খুবই ছোট। বুড়ির আদ্দেক গল্প ছিল ধর্ম ছেলেকে নিয়ে। এই ধর্ম ছেলের বিত্তান্তটিই এক সত্যি হওয়া রূপকথা।

খাল পাড়ে থাকত দিদ্‌মারা, গলগলির খাল। দিদ্‌মাদের গাঁ নাকি ভেসে গিয়েছিল, তখনই ওরা খালপাড়ে এসে ওঠে। সার সার হোগলার ঘর, অনেক মানুষ তারা। দিদ্‌মা কেন, খালপাড়ের মেয়েরা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাঠের ঘেঁস দিয়ে গুল দিত।

অনেক করাত কল, অনেক কাঠের ঘেঁস। কয়লার ডিপো থেকে কয়লার গুঁড়ো এনে কাঠের ঘেঁস আর মাটি দিয়ে মেখে গুল দিত সবাই। কারা যেন এসে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে কিনে নিয়ে যেত।

খালপাড়ের পরেই মোটর গ্যারেজে কাজ করত মতি সাঁপুই। একা থাকত, রেঁধে খেত, মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে দিদ্‌মাকে চা খাওয়াত।

একবার তার জলবসন্ত হয়। দিদ্‌মা তখন গিয়ে না কি সেবা যত্ন করেছিল, একুশ দিনে নিমহলুদে স্নান করিয়েছিল, স—ব করেছিল। তখন হতেই সে

দিদ্‌মাকে "ধম্ম মা" বলে ডাকল।

মা বলত, মা-বাপ মরা ছেলে। দেশ হতে কাকারা জমিজমা ঘরদোর কেড়ে নে' বারো বছর বয়সে বের করে দেয়। কাকাদের কথাও বলত না। বলত, ধম্ম মা ডেকিচি, বেটার কাজ করব।

দিদ্‌মার মরা আন্না দেখেনি। ধম্ম ছেলেই দিদ্‌মার গতিগঙ্গা করেছিল, কাছা নিয়েছিল, কার্তিক ঘাটে শ্রাদ্ধশান্তি, স–ব করেছিল। স্বামী তাড়িয়ে দিতে আন্নার মা তিন মেয়ে নিয়ে দিদ্‌মার কাছেই গিয়ে ওঠে।

ততদিনে মামা কামারপাড়ায় চলে এসেছে কয়েক বছর। মোটর চালায়, মোটর সারাতেও জানে, যথেষ্ট দাঁড়িয়েছিল। দিদ্‌মাকে আনতে চেয়েছিল, দিদ্‌মা নড়ে নি। তা মামা দিদ্‌মাকে খরচা দিতে যেত।

আন্নাদের দেখে বলল, সোয়াগ যে উতলে উঠচে। বলি, এই যোবতী মেয়ে, তার তিনটে মেয়ে,—চাট্টে মানুষ খাবে কি?

—সে আমি ঝানি? তুই এসেচিস, বেবস্তো কর। তোর তো বোন হল।

—খেটে খেতে হবে।

—সোয়ামি তাইড়ে দেচে, খেটেই খাবে। সোয়ামির ঘরেও তো নিদম খাইটে তবে ভাত দিত। এখনে নিজে খাটবে।

মামাই সকলকে কামারপাড়ায় মাসির বস্তিতে এনে তুলল, ঘর দেখে দিল। বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ ধরাল।

—পাঁচ বাড়ি কাজ করব? পারব?

—বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট মোছ, পাত্তে হবে। আন্না ঘরে থাকবে। তুমি দুটো মেয়ে নে' কাজ করবে। এরা বাসন মাজল, তুমি কাপড় কাচলে,– এরা ঝাঁট দিল, তুমি মুচলে—বাড়ি বাড়ি চা রুটি দেবে,—গুচিয়ে এসে সগলা এগবেলা খেলে। তা বাদে রাতে আঁদবে, সগলা জলভাত খেয়ে বেরুবে।

—মাইনে দেবে তো?

—পাঁচ ঘরে একশো টাকা তো পাবে। দত্ত বাড়ি তো ছুঁচিবাই। কাপড় কাচবে না, শুদু বাসুন। তবে বাসনের কাঁড়ি। বিশ টাকা ঘর ভাড়া, তিন টাকা লাইট, আর কি চাও?

—যতোপ্টো দাদা!

—পুজোয় পাঁচ বাড়ি কাপড় দেবে, শীতে চাদর, আরে গুচিয়ে কত্তে পারো তো হাল ফিরে যাবে। তবে হ্যাঁ বাড়িউলি ঝা বলবে, তাতে "হ্যাঁ" বোলো। সে পয়সার পাহাড়,—মানুষের খোশামোদটা ভালবাসে।

বাড়িউলি বলেছিল, মতি এনেচে, তুমি তার ধম্ম বোন, থাকো। কিন্তুক সোয়ামি আচে, না নি'?

—আচে।

—ভাত দেয় নে ?

—তেইড়ে দিল। আট্টা বে' করেচে, তার গভ্যে ছেলে জম্মেচে,—আমার মেয়ে নাড়ী। রাকলে মেয়েদের বে' দিতে হবে। তাতেই তেইড়ে দিল। আমার দুক্কে মা! শ্যাল কুকুর কাঁদে।

ওই "মা" শুনেই বাড়িউলি গলে গেল।

বাড়িউলি "মা" নামের পাগল, আন্নার মা তাকে "মা" বলল। দিদ্মা "মা" নামের পাগল, মামা তাকে "মা" বলল। আন্না নিজেও কি "মা" নামের পাগল ছিল না ?

পঞ্চমী ডাকত, মা।

সপ্তমী ডাকত, মা।

দুই মেয়ের শোকে আন্নার বুকে যখন সাগরের নির্মম কঠিন বাতাস বয়ে যায় দশমীকে যখন সে চোখের মণিতে বসিয়ে রাখে, মেয়ে শুধু জানত, "মা"।

দশমীর চোখদুটি ভাসা ভাসা, চোখের ভোমায় গালে ছায়া পড়ত। টেনে টেনে চুল বেঁধে আন্না চিরুণির চুল ছাড়িয়ে থুথু দিয়ে পাঁশগাদায় ফেলত। বড় যত্নে পড়াত কাজলের টিপ।

বা' বাতাস! ওর গায়ে লেগো না।

কাক চিল! ওর গায়ে পালক ফেলো না।

নজর দিও না কেউ গো! দুখিনী মায়ের শোকতাপ জুড়োতে মা আমার কোলে এসেছে।

রাঙা প্লাস্টিকের বালা, আর জামা প্যান্টে মায়ের শোভা কি! পড়শীরা বলত, তোর গভ্যের সেরা ফলটি হল দশমী। রূপ দেকলে মন বলে, বুকে তুলে নিই। আহা! বেঁচে থাকুক।

—যাদেরে সাগরে নিল, তাদের রূপ কি কম ছিল দিদি ?

—পঞ্চমী, সপ্তমী সোন্দরী ছিল বটে,—এ যে দেবকন্যে গো! আহা! অষ্টমাতাপুরে যে গৌরী ঠাকুর গড়ে পুজো করে, তিনিই ঝেমন ফিরে এয়েচে।

সেই দশমীরই কি হল কালান্ত জ্বর ?

কেমন ম্যালোয়ারি ঢুকল এলাকায়, কতগুলো প্রাণ নিয়ে গেল! মশোরি ছাড়া শোয় নি, কোন অনিয়ম করে নি, খেলত বাড়ির ওটোনে, তারেই ধরল জ্বরে ?

জ্বর হয়ে থেকেই তো "মা রে! মাতা ফেটে যায়! মা রে! বুক জ্বলে যায়!" তিন রাতও কাটোনি। হঠাৎ "মা রে!" বলে আর্ত কেঁদে উঠেই মেয়ের ঘাড় টেলে গেল।

সেই "মা" ডাকটাই বুকে বাজে বারবার।

॥ চার ॥

ওই যে "মা" বলে ডাকল, বাড়িউলি কেমন হয়ে গেল। কি যেন ছিল আন্নার মায়ের চোখে, অবস্থার হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে,—বাড়িউলি বলল, মতি এনেচে, আমি "না" বলব না।

—আমার মা ওনার "ধম্মো মা।"

—সে আর বলতে হবে না। সকল কথা আমাকে বলে। তা তোমার এমন অবস্থা, সে অবশ্য বলেনি।

—বলবে কি? দেখেই নি মোটে। আমি মায়ের কাছে এলাম…ওই গলে দিচ্চি কয়লা গুড়োচ্চি, তো দাদা বলল, এ কাজ করে পেট পালতে পারবে নে। চলো, মেয়েদের নে' ঝি খাটবে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কৎজনা এ কাজ করে পেট পালচে। কি আর বলব মা! জিগ্যেসা করো, সোয়ামি কি করে গা মেয়ে? জিবে জবাব জোগানো আচে। ঘরামি কাজ করে।

—কলকেতায়?

—কে জানবে! ইস্তিরি খেটে খেটে ভাতারকে খাওয়াবে, ছেলেমেয়ে পালবে, …তা, তোমারে বের করে দিল কেন?

আন্নার মা বুড়ো আঙুলে উঠোন ঘষতে ঘষতে বলেছিল, আরেকটা বে' বসেচে—একে তো আমার, যাকে বলে মেয়ে নাড়ী। মেয়ের মা বলে খুব হেনস্থা, খুব হেনস্থা,—

—মর্ মর্ গু-খেগোর বেটা! চমকে উঠচো কেন? তোমারে নয়, মেয়েদের বাপরে বলছি। তুমি বলো না, যা বলছ—

—মিস্তিরি কাজ করে, ভাল পয়সা পায়—আগে তো সতীন এনে তুলল-- তা বাদে মোটে খোরাক দেবে নে…বলে—যা! গুগলি শামুক তুলে খেগে যা! আর নিজের খুব হাসি · খুব মশকরা…এই ফুলুরি মুড়ি…এই এট্টু মাংস আনল।

—মর গা পিচাশ!

—সতীনই বড় কষ্ট দিতু গো মা! পায়ের ঠোকরে কলসি ভেঙে দিত… মেয়েরা ফ্যানে নুনে ভাতে একগাল মুকে দেবে তো একদলা চুল ছুঁড়ে মাল্য… ঘরে মিস্তিরি এলেই লাগানি ভাঙানি…

—সতীন ঘর করা যায় না বাছা!

—তা বাদে সতীনের হোল ব্যাটা! তাতেই আমার ভাত উটে গেল।

—তুমি রিষের চোটে কিছু করনি তো?

—মনে হতু এগেগ সময়ে ··সাওস ছিল না।

—আগেও খোয়ার করত সোয়ামি ?

—এৎটা ছিল না। কেরমে পয়সাও বেশি হল·· বে' কল্য—তার ছেলে হল · শেষমেশ বেটার পেটের অসুক···ওরা দু' মানুষ, আমাকে নজর দিইচিস্ অষুদ করেচিস, কৎ আর সয় বল মা ? মেনুতি জম্মো থেকে শুনচি, লাত্ মেরে বের দোব করে···লাত্ খেয়েই বেরোলাম...

—এওচো...না বলব ন্যা···তা বাছা ! শওরে কত্তে হলে অমন শুগনি মার্কা চ্যায়রা করে গেলে চলবে নে। ফার্সা কাপড় চাই, মাতায় তেল, পোস্কের থাকা চাই।

—করে নোব।

—মেয়েদের নাম কি রেকোচো ?

--ভেনতি, মেনতি, আর আন্না !

--হায় কাপাল ! এমন নাম কেউ রাখে ? তোমার নাম কি ?

—মৌরি।

—আ গেল যা, মশলার মৌরি ?

—কি জানি মা ! নামে বা ডাকে কে ! কবে থেকে ভেনতির মা ! একনে আন্নার মা !

—পরে কথা হবে। ওই যে মতি এয়েছে।

আন্না শুনেছে, মামা ঝাঁকা মুটের মাথায় চাপিয়ে চাল-ডাল-তেল-লবণ-আলু-লঙ্কা-কড়াই-খুন্তি-ভাতের হাঁড়ি-কাপড় কাচা সাবান-সোডা-একটা তোলা উনোন,—সব্যস্য জিনিস এনে হাজির।

বাড়িউলি বিরস বদনে বলল, যাও বাছা ! ঘর গুছিয়ে নাও গো ! আমার মতির টাকা জমতে পায় না কোন দিন।

—সকলে কি তোমার ভাগ্য করে এয়েচে মাসি ? এরা সব আকালের ক্যাঙালী হয়ে রয়েচে বই তো নয়।

হাতের কর গুণে বলল, ইংরিজি মাস পয়লা পড়তে দু'দিন আচে। খেয়ে মেখে সাফসুতরো হয়ে নিক। মাতায় উকুন থাকলে বোল ! কেরাচিনি দে' সাপ করে নেবে। ঘরদোর, জামা কাপড়, বিচনা মাদুর, যেমন সব্যদা পোস্কের থাকে। মাসি নোংর‍্য মানুষ দেকতে পারে না। ইনি একজন ভদ্দরতা মানুষ।

বাড়িউলি বলল, মতিও দেখবে, সব্যদা ফিটফাট। ঘর তো দেখনি। যা চাইবে, সব আছে। ছুঁচ রে, সুতো রে, কাঁইচি রে, ইলেট্টিরি সারবার যন্তর, সব্যদা হাতের কাছে।

আন্নার মনে হয়, তাই তো ! মামাকে তো কোনদিন অপরিষ্কার দেখে নি।

আশ্চর্য, ছোটবেলা থেকে দেখছে, মানুষটার চেহারাও পালটায় নি তেমন। চুল যা পেকেছে, নইলে তেমনই বেঁটেসেটে, পাকানো সাকানো, কালোকোলো মানুষটি।

বুড়ো বয়সে ভেতর পকেটে একটা খাম নিয়ে ঘোরে।

—পথেবেপথে হঠাৎ মরে যাই, তো এতে দাহ খরচ রইল মউরি।

মায়ের নাম মৌরি, সে নামে ডাকতে একা মামা। মামার মুখে ও কথা শুনলেই মা বলবে, আবার আকতাকুকতা?

—তা, মিত্যুর কতা কে বলতে পারে?

সেদিন মা না কি অত জিনিসপাতি দেখে অবাক হয়ে বসেছিল, এ যে এট্টা যগ্যির জিনিস গো দাদা!

—যাও যাও, সব গুচ্যেগাচ্যে নাও। আমার অন্য কাজ আচে।

বাড়িউলি মাসি বলেছিল, বোন বলোচো মতি! আমি তো একবেলা খেতে দিতে পাত্তাম!

—তোমার পায়ে এনে ফেলিচি যে কালে, কত খাওয়াবে খাইও। তবে মাসি! এগবারে গেঁয়ো জংলী! ক'দিনে সাইজ হোক, তখন খাইও।

ঘরই বা কি আশ্চর্য ঘর!

হলে বা তিনদিক চাপা, দক্ষিণ দুয়োরি তো! ঘরের কোলে বারান্দা। আবার লাইটও আছে।

উত্তরে জানলা আছে, উঁচুতে।

মেঝে পাকা, দ্যাল পাকা, টালির ছাউনি।

—এমন ঘরে থাকব?

—নইলে খালপাড়ে যাবে মায়ের ঘাড়ে পাষাণ হতে? চলো চলো, কল-পাইখানা দেক্যে দিই। পত পেরোলে পুকুর, নাওয়া ধোওয়া হোতাই কোর। বলিচি ইনি ভদ্দরতা মানুষ। তেমন লোগকে ঘর দেয় না যে মদ গ্যাঁজা টেনে এসে হুজ্জোতি করবে। ভাড়াটেদের কতা ভেবে বাইশ ঘরে দুটো পাইখানা দুটো কল দিয়েচে। নিজের সব্যস্য আলাদা।

—বুজিচি দাদা। তা তুমি হেতো খেলে হতু না? যদি পোষ্কের করে রেঁদে দিই?

—দেক! আমার বেবস্তা আমার। একনে নিজে বাঁচো। যৎ যা পারচি, করে দিচ্ছি। আর নেকিবুকি হয়ে থেকো না। কেজোকম্মা হও!

—কোথা যাচ্চ এখনে?

—মনিবের মা শুষচে…হাসপাতালে খাবার নে' যাব।

মামা কাজ করত, আন্নাদের দেখত, আর যখন তখন এর তার বিপদে

দৌড়ত।

ততদিনে আন্নার মা ঠিকে খাটার অর্থনীতিটি শিখে নিয়েছে।

পাঁচ বাড়ি কাজটা কথার কথা।

তিন বাড়ি কাজ বাড়িউলিই ঠিক করে দেয়। সে বলেছিল, ঠিকে কাজে হয় না? অনেক হয়। আঙুর বেটার কাছে চলে গেছে, দেখাতে পারলাম না। সে তো ঠিকে খেটে খেটে মেয়েদের বে' দিল,—বেটারে রং মিস্তিরি কাজে দিল, এখন সুখে আছে।

আন্নার মা ভাবত, আমারও সুখ হবে।

ততদিনে মামার ভাবগতিও জেনে গিয়েছিল মা।

মামার ওপর বাড়িউলির যেন একটা দখলদারী মনোভাব ছিল। মামা ওখানেই খেত, মাস গেলে টাকা ধরে দিত।

বাড়িউলির ঘর নয়, বাড়ি। পরের পর আড়াইখানা ঘর, কোলে বারান্দা। সে বাড়ি বস্তিরই লাগোয়া, তবে আলাদা।

বাড়িতে পাখা ঘুরত, তনুর মা রান্নাবান্না কাজকর্ম করত। তনু বাড়ি-উলির চালের দোকানে বসত। চালের ব্যবসাতেই মোটা টাকা।

মামা সে টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে যেত।

বস্তির ভাড়াটেদের মধ্যে আন্নার মায়ের সঙ্গেই দুটো কথা কইত বাড়িউলি। বলত, মতির ধম্ম বোন হয়, ওর কথা আল্দা।

বাড়িউলি সাবান মেখে নাইত, সর্বদা চটি পায়ে থাকত। সর্বদা পরত জামা, সায়া, রঙিন শাড়ি। আন্নাকে কেন যেন খুব পছন্দ হয়েছিল। বলত, কেমন ফুটফুটে মেয়েটা গো! আমার আঙুল ধরে এসবে। কেমন বলে, মাতি!

—আমি মা বলেচি, দিদ্মা বলতে পারে।

—না বাছা! দিদ্মা ডাকলে বুড়ি বুড়ি লাগে। দেক না, আমি সবারই মাসি। মাসি ডাকচে শুনলে পাড়ার সবাই ছুটে আসবে।

—আসতেই হবে। দাদা তো বলে, তুমি হচ্চ দয়ার পিতিমে!

– বলবে না? ওকে দেখি আমি, আমাকে দেখে ও। আহা, এসব ছেলে, তার জীবনটা দেখ, পরের তরে ছুটে ছুটেই যাবে।

—মনে যে ভারি দয়া! ও নইলে তোমায় পেতুম নি আমি, তিন মেয়ে নে' ডুবে মত্তে হোত।

—অত সোজা নয় গো! মরব মনে কল্যেই কি মরা যায়? তবে হ্যাঁ, মতির মত ছেলে এ পাড়ায় নেই। সে সবাই বলে।

—সোমসারীও হয় নে!

—ও মা, সে বিত্তান্ত জান না? সবাই জানে।

সেও এক বিত্তান্তই বটে। এই যে মামা, তারও নাকি বিয়ে হয়েছিল।

দু'বছর না ঘুরতে বউ চলে গেল।

—মরে গেল ? হ্যাঁ মা ?

—মরবে কেন ? সতীশ মিস্তিরির সঙ্গে চলে গেল। শুনি কালীঘাটের বে' নাকি টেকে না। দিব্য আচে তারা, ছেলে না মেয়ে হয়েচে···

—সোয়ামি···তায় অমন সোয়ামি···ইস্তিরি সোয়ামিকে ছাড়লে অধম্ম হয় নে ?

বাড়িউলির এ বয়সেও চোখ মুখ নাচে খুব। চোখ ঘুরিয়ে সে বলল, তুমি সোয়ামি ছেড়ে আসনি ?

—সে তো তাইড়ে দিল ? নইলে কি···

—লাতি ঝ্যাঁটা খেয়ে পড়ে থাকতো, নয় মরতে। এই তো ? ঝ্যাঁটা মারি ধম্মের মুখে। যাক গে, মতির বউ যে···ছেলে পুলে হয় নে'···মতিরে গাল-মন্দ করে চলে গেল।

—সন্তান হওয়াটা কপাল ! বাঁজা হলে কি···

—কিসের বাঁজা ? তুমি এখনো মানুষ হওনি বাছা ! শুনলে না সতীশের ঘর করছে, সন্তানের মা হয়েছে, বাঁজা কোথা ?

—এখানেও থাকলে হতু···

—ভ্যালা এক বোন বটে মতির !

বাড়িউলি মাসি মোড়া পেতে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ চাপিয়ে বেটাছেলের মতো বসত আর পায়ে হাত বোলাত। যেন মদ্দা মানুষ ! মামা বলত, ওনাকে বিচের কোর না মোরি। উনি অন্য রকম !

তা পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বাড়িউলি বলল, মতি বউরে নে' ডাক্তার বদ্যি করেছিল। শেষে শুনি, মতিরই...ক্ষ্যামতা নেই কি আর বলব !

—আহা গো !

—বলিছিলাম, চিকিচ্ছে করাও...আবার বে' করো। বলে, ছেলে আমার হবে নে' মাসি, তাতেই বউ চলে গেল। আর বে' করে কে ?

তাও সত্যি। এ বে' তো...

সেও এক বিত্তান্ত। যত ভালো ভালো, চমকপ্রদ বিত্তান্ত, সব আন্নার জীবনে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে ঘটে গেছে। মামাকেও তো আন্নারা জানত না ! মামা এমন লোকই নয়, যাকে দুটো কথা শুধোনো যাবে। সে সাহসই হবে না কার। সে নিজে যা বলবে, তা বলবে। প্রশ্ন করলেই কড়া জবাব।

এ বিয়েও পাকে চক্রে ঘটে যায়। কামারপাড়ারই কোনও গরিব দোকানীর মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। চাঁদা ভিক্ষের বিয়ে। মামাও সাহায্য করেছিল। কিন্তু হাজার টাকা পণ দেবার কথা ছিল।

বিয়ের আসরে বরের কাকা আরও পাঁচশো চেয়ে বসল। দেন্‌পাওনা

নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। বরের কাকা বর নিয়ে চলে গেল। মেয়ের বাপের মাথায় বাজ পড়ল। লগ্ন পেরোলে মেয়ে দোজপড়া হয়ে যাবে। কে বিয়ে করে উদ্ধার করবে ?

শেষে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কালুবাবু এসে মামার হাত ধরল। বলল, পাড়ার ছেলেদের হাতে পায়ে ধরেছি মতি, কেউ রাজী নয়। গণপতি তো মাথা কুটছে,—তা, তোমাদের স্বজাতি, যদি দয়া করে উদ্ধার করো……

বাড়িউলি মাসি বলল, ক'বছর বা এসেছে ছেলেটা। আসায় দুদিন বাদে পানওয়ালার বউ আত্মঘাতী হতে গেল,—তারে দড়ি কেটে নামিয়ে মতি নিল হাসপাতালে…সে থেকে মড়া পোড়াতে, বিপদে সামাল দিতে, ওই মতি !

মামা বলেছিল, আমি যা উপায় করি, বড়জোর নুনে ফ্যানে রাখতে পারব।

কালুবাবু বলল, বে' করো। ঘর করার কথা পরে !

বিয়ে হল। মামা যথাসাধ্য করত। শ্বশুরের দরকারে পঞ্চাশ একশো ধার দিত। বাড়িউলি মাসি বলল, সে বউয়ের বয়সও কুড়ি বাইশ হবে। এই গতর। যেন ধামসে বেড়াত। ওই যে মতি অক্ষ্যামতা ? তার পরে আর সে থাকে ?

আন্নার মা'র মাথা ঘুরে গিয়েছিল। স্বামী অক্ষ্যামতা হলে বউ তাকে ছেড়ে যেতে পারে ? আবার যেমনতেমন স্বামী নয়। চূড়ান্ত বিপদে তোমাদের বাঁচিয়েছিল।

বাড়িউলি মাসি বলল, তা বললে হয় ? দেহের একটা ধর্ম আছে। তবে মতির কথাই ভাবি। একটা আপনজন নইলে মন থিতু হয় ?

মামার মন কিন্তু ক্রমে ক্রমে আন্নাদের ঘরটি ঘিরে থিতু হয়। আন্নাই ওর সবচেয়ে প্রিয়। মাঝে মাঝে বলত, বড় হ', দেব কর্পোরেশন ইস্কুলে ভর্তি করে।

এ কথা থেকেই অনুরাধা নাম।

আন্নার ইস্কুলে ভর্তি হবার কথাই হচ্ছিল। বাড়িউলি মাসি বলল, আন্না নামে ভর্তি করবে ?

—নামই যে আন্না।

—দেখ বাছা ! নাম হল একটা গৈরবের জিনিস। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা ঠিক হয় না। তা বলে ফুলের মত ফুটফুটে মেয়েকে আন্না নামও দেয় না কেউ।

—ওই তো, ভেনতি, মেনতি আর আন্না। বেটার নাম থুয়েচে দিলীপ।

—আমার কাচে তা পাবে না। আমার চারটে মেয়ে। নাম দিয়েচি দীপালি রূপালি, চৈতালি আর মিতালি।

আন্নার মায়ের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। বিয়ের কোনও চিহ্ন নেই, স্বামীর

নামও করে না, চারটে মেয়ের মা এই মোটাসোটা, বালা, হার, মাকড়ি পরা দেহসুখী মানুষটা ?

সে বলল, তারা কোথায়, মা ?

—আর কোথা ? যে-যার স্বামীর ঘরে।

—হেতা নয় ?

—কাটোয়া ডোমজুড়···নানাখানা হয়ে আছে সব।

—ঘর বর ভালো তো ?

—ভালো কি আর পায় বাছা ? ভালো করে নিতে হয়। টাকার জোরে স—ব হয়।

—সোয়ামীরা ভালো চোখে দেখে ?

—না দেখলে আমি রাখব ? আমারে চেনে না ? আমি যেয়ে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

আন্নার মা অভিভূত। বোসপুকুরে স্বামীর ঘর, মা থাকত খালপাড়ে। কামারপাড়া তো শহর। বোসপুকুর আর কামারপাড়া যেন দুটো আলাদা জগৎ।

বাড়িউলি মায়ের মতো মানুষ বুঝি শহরেই হয়। মেয়ের মা বলে জামাইদের ঝাঁটা মেরে বিষ ঝাড়াবে ?

—মেয়েদের ··কিছু বলবে নে ?

—বলার মুখ তো রাখিনি। নগদ হাজার টাকা। বরের আংটি, মেয়ের কানের গয়না, হাতে ব্রোনচের চুড়ি। কি দিই নি ?

—সে যে অ্যানেক গো !

—আরো শুনবে ? বড় জামাইকে মাছের দোকান করে দিইচি...মেজরে দর্জির দোকান···চারটে মেশিন করেচে, তিনটে ছেলে রেকেচে···ব্যাগ সেলাই করে জোগান দে', উঠতে পারে না···সেজটা মেদনিপুর থে পান আনে চালান দেয়। তবে মরেচে ছোট মেয়েটা।

—কেন, মা ?

—কেমন জামাই ঠিক করলাম···মদের দোকান আচে···বিস্তর পয়সা··· নিজে নেশা করে না মোটে···কাঁচা পয়সার কারবার। মেয়ে মানল ? বে' করল একটা প্যাডলারকে···সাইকেল রেকশা চালায়···সব্যদিকে সব্যনাশ। জামাই যাদবপুরে রেকশা চালায়, উনি এক বাড়িতে রান্না করেন।

—যাক, কামাচ্চে তো !

—সে তুমি বুজবে না। আমার যা, সব তো এদেরে দেব। প্যাডলার কি পাতে দেবার যুগ্যি ?

তনুর মা সুমতি বলল, আন্নার নাম দেবার কি হল ?

—ওর নাম দিলাম অনুরাধা।

—নাম দিলে হবে নে। আমাদেরে খাওয়াও, ওকে নতুন জামা দাও···

—বেশ বলিচিস! তা নাম যদি দেব, মেয়ে আমার কাছে রেখে কাজে যেও।

—বিরক্ত করবে।

—এ তেমন মেয়ে নয়। তোমার বড় আর মেজ মেয়ে বাচ্ছা! এ বয়সেই চানকে উটেচে। কি লো সুমতি! রাখবি তো?

—কাকে রাখিনি মা? তুমি যতদিন আচ, সুমতিও থাগবে, আর জান দে' করবে তোমার জন্যি।

॥ পাঁচ ॥

আন্নার মনে সব সুস্পষ্ট হয়ে আছে। বাড়িউলি মাসি নতুন জামা প্যাণ্ট কিনে দিয়েছে। আন্নারটা যেন ঝলমলে জামা।

মামা কিনে দিয়েছে আন্নার দুই দিদিকে। তারা হিংসেয় মটমট করছে।

—নাম দেবে, তা খাওয়াবে কেন গো দাদা? মা জিগ্যেস করেছিল।

—ওই একেকটা খ্যাল ওঠে, খানিক আনন্দ করে। করচে করুক না।

—বাব্বা। মেয়ের নাম নে ঘটাপটা?

—শওরে সব হয়। কত বাবুদের মোটে ছেলে নেই। তারা মেয়েদের কম সোয়াগ করে? আমার মনিবই তো সেদিনে বলচে, অ মতি! চা আমার মেয়ে করেচে, জানলে? শোনো কতা! বাইশ বছুরে মেয়ে,—কলেজে পড়চে,—সে চা করেচে,—তাতেই বাপের গর্ব কত! মনে মনে বলি, এ সব আদিক্যেতা!

—তাই বটে!

—ইনির ব্যাপারটা কি জান? সাতকুলে কেউ নেই। কি করবে টাকা দে'?

—সি কি গো? মেয়েরা আচে!

—বলয এগদিন। মানুষটা দুক্যি বটে!

—আমার আন্নারে সুচক্যে দেকেচে···

আজ আন্নার মনে হয়,—সেই যে আসনে বসে মাছ, পায়েস, মিষ্টি, নানাবিধ খাওয়া,—সেই যে বাড়িউলি মাসির রেডিওতে গান শোনা,—এ সব কি তার জীবনেই ঘটেছিল?

মা, দিদি, ছোড়দি, মামা, বাড়িউলি মাসি, সব গোল হয়ে বসে খেয়েছিল। মা বলে, অমন করে কোনো খাওয়া মুকে লেগে নি। সুমতি রাঁদত কি বা!

যেন অমের্ত'।

সুমতির তেল ঘি খরচ দেখে মা অবাক হয়ে যেত। না, বড়লোক বটে এরা। সুমতি কাজের লোক। কিন্তু বাড়িউলি তাকে যা পরিষ্কার রাখে। চুলটি বাঁধা, ধপধপে কাপড় জামা,—মাসির সঙ্গে কালিঘাটে গেলেই পরনে মাসির পুরনো গরদ, হাতে পেটো, কানে মাকড়ি।

মামা বলত, দেকো না, দেকো না মৌরি। ভগমান ওকে যেমন দিচ্ছেন, ও তেমন চলচে। তবুও তো দামী জামা প্যান পরে। আমার অমন জামা নি'। ও সব ভাবলে মন ছোট হয়ে যাবে।

—না দাদা! রিষ করি না।

—সাক'াস তো দেইকে এনিচি তোমাদেরে। দেকোচো তো, মেয়েরা তারের ওপর দে' হাঁটে?

—দেকিচি।

—এনার সঙ্গে চলা মানে তার দে' হাঁটা। এট্টু ইদিক-উদিক হলেই পড়ে যাবে।

—না, তা হবে কেন?

—সব্যদা মনে জপবে, বরাত জোরে হেতা ঘর পেইচি,—ভগমানের দয়াতে কাজ পেইচি। এর জোরেই মেয়েদেরে নে' বাঁচতে হবে।

—যা বলেচো।

—মনে রেকো।

—আন্নারে উনি…মন কল্যে…

—কত্তে পারে। কতগুলো নিষ্পর মেয়েরে তো পার কল্য।

—তারা উনির পেটের মেয়ে নয়?

—না মৌরি। ওনার কতা অনেক।

জেলখানার উঠোন, বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে, চেপে চেপে মুছতে মুছতে কত, কত কথা মনে হয় আন্নার,—কত কথা! তখন ওর মুখ অন্য রকম হয়ে যায়, বয়স যেন ঝরে যায়, চোখ নরম হয়ে যায়।

সবিতা বলে, কি ভাবিস, আন্না?

—ছোটবেলার কথা দিদি!

—আমার তো সব বিস্মরণ।

—ছোটবেলাটা…ধরো চৌদ্দ বছর অব্দি…বড় ভালো ছিলাম। তাই ভাবি!

—ভেবে ভেবে, মুছে মুছে সব যে চকচকে করে ফেলালি।

—বে' হয়ে থেকে অসাগর কাজ করিচি দিদি গো। সন্তান শোকে

কে'দিচি, আর ধান সেদ্দ করিচি, শুক্যেচি, না খাটলে খাব বা কি! খাওয়াব বা কি! ভাদ্দরমাসে জঙ্গল তাংড়ে কচু ঘে'চু মেলে না,—তকনে পুকুর সাঁতরে কলমি হিঞের বোঝা আনতু···সেদ্দ করে দুমুটো ক্ষুদ দে···

—স্বামী করত না কিছু?

—একনে মন হল তো লোকের ঘর ছাইবে, বাঁশ কেটে বেড়া দেবে, মাটে খাটবে···খাটলেই পয়সা···তার জ্ঞাত কাকা কত বলেচে, লেগে থাক কাজে··· করবে নে। ককনো পাঁচ কিলো চাল এনে দিল তো যতোণ্টো!

—তা বাদে?

—আর জানতে চেও না দিদি!

আন্না মুছতে থাকে, মুছতে থাকে। কাজ করতে থাকে আর মনে মনে কামারপাড়ার ঘরে ফিরতে থাকে।

সুমতি মাসির সঙ্গে পুজো দেখে ফিরতে দেরি হয়েছে, বাড়িউলি মাসি ঘরবার করছে।

—অ্যাত দেরি কত্তে হয়? বড্ড বেড়িচিস তুই!

আন্না গিয়ে ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে ধরত মাসিকে। বলত, তোমার জন্যে ঠাকুরের বেলপাতা নোব না?

—তাই তো! তাই তো। অমনি গলে যেত মাসি।

মাসির জীবনে অনেক কথা ছিল। অনেক!

সন্ধে আটটা বাজল তো মাসির ঘরে মানুষের ঢোকা নিষেধ। পাশের ঘরে সুমতি মাসি আন্নাকে নিয়ে ঘুমোতে এক একদিন।

রাত আটটার পর মাসি নিজের ঘরে দোর ভেজিয়ে রাখত। ঢুকবে বেরোবে এক সুমতি মাসি।

এক একদিন আন্না চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকত। দুপুরে ঘুমিয়েছে, রাতে হয়তো ঘুম আসত না।

তখন শুনেছে বাড়িউলি মাসি আর মামার গলা। মাসি তখন যেন কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে কথা বলত। কখনও জোরে জোরে, কখনও নিচু গলায়।

—তুমি বলো মতি! কেন এত সইব?

—সইচেন কোতা? আপনি তো স্বদাপটে আচেন।

—বুকে অনে—ক দুক্য গো!

—ভাববেন না।

—কেউ খপর নেয় নে এট্টা···

—আর খাবেন না ছাইপাঁশ!

—এই যে আন্না। সে তো আমার নয়।

—আমি যাচ্চি।

—কার কাচে কইব ?

—দেখুন। মত্তে চান তো লাইনে গলা দিন। এ খেয়ে…রোজ তো খান না…

—না না। দুক্ক্যু উটলে…

—আমি এর চে অন্যত্তর চলে যাই।

—না মতি। পায়ে ধরি! এমন মাঝে মাঝে হতো।

মামাই বলল, খেয়ে দেয়ে মার কাছে শুতে যাক আন্না। এটা ঠিক নয়। এ সব কথা বলার সময় সকাল বেলা। যখন মাসি পাগলামি করে না।

—কেন ? হেথা শোবে না কেন ?

—জ্ঞানীমানী মানুষ আপনি! মৌরির মেয়েকে তো বিবি বানিয়ে লাব নি। ওরেও তো খেটেই খেতে হবে।

—ও মা! হেতা টুকটুক করে সুমতির সঙ্গে কত কাজ না করে!

—সে বরং কত্তে পারেন। এখানে এটাওটা কাজ কল্য। খেল, দিনেমানে থাকল। জামাকাপড় তো আপনি দিচ্চেন। মার কাচে রাতে খেল, থাকল। ওর কপালে কি পরে নিত্যি এমন জুটবে ?

—হোতা কি খাবে ? বাসিপচা ?

—না না, কাজ দেকে দিয়েছেন। ঘরদোর একন পোস্কের, রাতে টাটকা রাঁদচে…আপনি সব বোজেন। হেতা মা বোনেদের সঙ্গে অনাহক তপাৎ করে লাব নি। আর…বেশি কল্যে পরে খোয়াব হবে।

নিশ্বাস ফেলেছিল মাসি। —তাই হোক মতি।

—সুমতি…তনু…ক' জনার ভার নেবেন ? গাচের চে ক্যাটাল ভারি হলে ডাল ভেঙে পড়ে। আমি তো জানি ওদেরে পুষতে পারব নে'—তাতেই কাজ কত্তে এনিচ।

মাঝে মাঝে আন্নার মনে হয়, মামা সব বুঝত, কিন্তু একবারও বলেনি, আন্না! লেকাপড়া শেকো।

বাড়িউলি মাসি কাকে যেন বলেছিল, এসে আন্নাকে পড়াবে।

শেষে মতি ঘুরে গেল। বলল, না বাচা! কার কপালে আচে, কে বলবে ? তাদেরে তো যতোণ্টো চেষ্টা করিছিলাম, কি হল ?

বলত, অ আন্না! অনুরাদা! তোরে যেমন পুতুলের সোমসার পেতে দিইচি,—তুই পুতুল খেলিস ? আমিও তোরে নে পুতুল খেলচি আশ মিটিয়ে!

কত পাপ না করিচি আগের জনমে!

আন্নার মায়ের মতে বাড়িউলি মাসির সকল পাপই ইহজন্মে কৃত। মামার মতে, পাপপুণ্যের হিসেব কষবে ভগবান। তুমি কে, ওনারে পাপী বলচো?

আন্নার মা সব জানে নি। আন্নার মামা কিছু বলত। আর বে' ঠিক হবার পর মাসি বলল, আমার কাচে কদিন থাক। তোরে সগল কথা বলে যাই। একনে গুরুমন্তর নিইচি,—ধাত ঠান্ডা হয়েচে,—মনে নিত্যি ধম্মভাব,—তুইও বড় হইচিস,—বল্যে দোষ নিসনি বাচা! সে অনে—ক কতা!

অনেক কথাই বটে।

কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, তা আন্না জানে না।

মাসির নাম সরস্বতী। সরস্বতী পুজোর দিনে জম্মেছিল, বাপ নাম দেয় সরস্বতী। মাসির বাপ-মার বিয়ে হয়নি।

মাসির যিনি মা, তেনার মায়ের আর বাপেরও না কি বিয়ে হয়নি। তাতেই বোঝো অনুরাধা! মাসি কেমন ঘরের মেয়ে।

কিন্তু ধর্মের মেয়ে।

ধর্ম কিসে? মাসির মা, মাসির বাপকে অসাগর ভালোবেসেছিল তিনিও মাসির মা কে তখনকার দিনে ওই উত্তরে বেলঘরিয়া, না কোথা একটি ছোট বাড়ি কিনে দেয়।

তিনির খুব গানবাজনার শখ ছিল। কি সব গানের রেকর্ডও হয়েছিল, মাসি জানে না। তবে একদিন কোতা "আশা করে করে নিশি গেল কাটি" গানটা মাসির মা বলেছিল, ও গানটা বাবু গেইছিল রেকর্ডে।

মাসির মা কে তিনি দু'তিন হাজার টাকাও দেয়। মাসির মা তাই সুদে খাটাত। মাসির আট বছর না হতে মাসির মা সে বাড়ি বেচেবুচে বেলগাছিয়া না কোথায় উঠে আসে। সর্বদা ধর্মভাবে থাকত, পুজো পালা করত, আর টাকা সুদে খাটাত। মাসিকে মা মাস্টার রেখে খানিক লেখাপড়া শেখায়, যাতে মাসি সুদের হিসেব রাখতে পারে। আর গানের মাস্টার গান শেখাত।

মাসির মা বলত, ভালো হয়ে থাকো, সরো, তোমারে আমি বে' দেব। ঘটক লাগাব, কুলকুষ্টি বলব না, টাকা দে' জামাই কিনব।

তাহলে বোঝো অনুরাদা! মাসির মা জানত, যে বর খুঁজতে হবে তেমন ঘরে,—যেখানে কোনো গোলমাল আছে।

ঘটককে তাই বলেছিল।

কিন্তু মাসিরও কপাল! বেলগাছিয়ার চৌধুরীপুকুরে মাছ ধরতে আসত এক বাবু। আর মাসি ঘাটে নাইতে যেত মায়ের সঙ্গে। বড় ঘরেরই মানুষ, চেহারা পোশাক তেমনই। তখন তাঁর বয়েস বছর তিরিশই হবে। আর মাসির বয়স ষোল। বয়সে কি করে অনুরাদা! দুজনের মনে পেল্লায় প্রেম জমে গেল।

তিনি মাসির মাকে বললেন, বিয়ে তোমার মেয়েকে করতে পারব না। আমার বউ আছে, সংসার আছে, কিন্তু ঘরে টেকতে পারি না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই।

কি করে ধেড়াও আপনি?

বড়লোকের ছেলে যা করে! বাপ-পিতামো' জমিভূমি বাদা ভোঁড় করেছিল। আমরা তিন ভাই ওড়াচ্ছি। তা তোমার মেয়েকে রেজেস্টারি করে সম্পত্তি লিখে দেব। ক'বছর আগে যদি হত। তবে এদিকে লিখে দিতে পারতাম। কিন্তু সবই হয় বেচেছি, নয় বাঁধা দিয়েছি। যেথা দিচ্ছি, সেথাও একদিন জমির দাম বাড়বে। অনে—ক বাড়বে। আর বাড়ি করে দেব সেথা। আর দেব টাকা। তবে এখন এদিকে এখানেই বাড়ি ভাড়া করব। সেথা থাকবে সরস্বতী, ঝি-দাসী থাকবে!

মাসির মা রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু মাসির তখন প্রবল প্রণয়। যেন ষাঁড়াষাঁড়ির কোটাল।

সরস্বতী তাতেই রাজী। তিনি এও বলল, বিয়ের ওপর জোর দেওয়া মূর্খতা। বিয়ে যাঁকে করেছেন তাঁর ওপর তো মন উঠে গেছে। হঠাৎ দিনে দিনে, চৌধুরীপুকুরে ছিপ ফেলতে ফেলতে সরস্বতীর ওপরে মন পড়েছে। কদিন বাদে যার বিয়ে, যাকে সে একপ্রস্থ বাসন, পিতলের ঘড়া, হাতের পেটো, গলায় হার দেবে, সেই অনুরাধার কাছে বোঝ নামিয়ে হালকা হচ্ছে সরস্বতী সরকার।

তা সে কথামতই কামারপাড়ার (তখন ঝোপঝাড় ছিল) এ জমি তিনি রেজেস্টারি করে দেয়। তিনি যেত আসত, বড় সুখে পনেরোটা বছর কাটে, —তা বাদে তিনির উকিল এসে বলল, তিনির তো অসুখ। বাঁচে না বাঁচে, এখনই সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা চলছে। তিনির শ্বশুর নিজের একমাত্র মেয়ে আর দুই দউওর, দুই দইওরির পাওনা কানাকড়ির হিসেবে চুকিয়ে নেবে। বাবু বলেছে, বীরেন বাবু। সরস্বতীদের সরে যেতে বলো। আর এই হাজার টাকা দিয়েছে।

সরস্বতীর অবস্থা বুঝো অনুরাদা। তিনি বউ, চার ছেলে মেয়ে রেখে প্রণয়ে পাগল! আবার বউ দেখল, নিজের বাপোতি সম্পত্তি শেষ করে এবারে বউয়ের টাকায় হাত পড়বে। বউ তিনিকে দেখবে কেন, বড়লোকের বিটি যে কালে? সে আগেই বাপের বাড়ি গয়নাপত্তর চালান করেছে, আর এখন তো উকিল লাগিয়ে সার্চ করাচ্ছে।

এতগুলো বছর সরস্বতীর মা-ও বসে থাকেনি। মাসোয়ারা থেকে সুদের কারবার করতে শিখিয়ে দেয় সরস্বতীকে। এ সময়েই সরস্বতী আর তার মা কামারপাড়ায় বাড়ি তোলে। মা নিজস্ব বাড়িটি বেচে দেয়,—সে পরে।

এভাবেই আগমন। আর বয়সের ধর্ম, এরপরেও ভুবন ডাক্তারের জ্যাঠার সঙ্গে সরস্বতীর—সে সম্পর্কের মধ্যে ছিল একটা অভ্যেস। টাকাপয়সার কারবার ছিল না। আসার কালে মা সুমতির মা বাবা, দু'ছেলে আর দশবছরে সুমতিকে নিয়ে আসে। লোকবল একটা বল। ক্রমে ক্রমে সরস্বতী তাদেরও চালের কারবার করে দিয়েছে। স্বীকার করা দরকার, সরস্বতীর মনে কিছুদিন "মা" ডাক শুনব খাঁকারিটা খুব হয়।

এখন দেখতে পাচ্ছ না অনুরাধা, যেখানে জগন্নাথ বিশ্বাস রোড থেকে নতুন রাস্তা বেরিয়েছে—যেখানে পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের বাড়ি হয়েছে,—সেখানে তখন মহিলাশ্রম ছিল। চালাত ওই ভুবন ডাক্তারের বংশেরই হরলাল বাবু। ও সব হলগ্যে সম্পত্তি বাঁচাবার পথ সব। ওই যে শীতলা মন্দিরের চুড়ো দেখ, সব দেবোত্তর করে রেখেছিল,—আবার মহিলাশ্রম মানে দয়াধর্মের কাজ। তখন, মানে হরোবাবু থাকতে বাইরে হতে বেশ নিয়ম দেখা যেত বটে। একজন মেয়েছেলে ছিল সুপার। হপ্তায় হপ্তায় কালুবাবু ডাক্তার যেত। সকালে সন্ধেয় মেয়েরা গান গাইত, সব ধর্মের গান। যাকে বলে ভক্তিগীতি।

ওখানে কিছু লেখাপড়া শেখাত, হাতের কাজ শেখাত। মেয়েরা কেমন সুঁচের কাজ করত। ওদের তৈরি বালিশের ওয়াড়, টেবিলঢাকা, পর্দা, হেন-তেন বিক্রি হতো। মাঝে মাঝে উৎসব হতো। একবারে কোন মন্ত্রী এল। তিনি পাঁচ জনকে বলে থাকবে। শোনা গেল, সরকারি সাহায্য হবে, কারা যেন টাকা-দেবে, হইরই কাণ্ড।

তা. ভুবন ডাক্তারের জ্যাঠার সঙ্গে তো ওই এস বাবু, বোস বাবু, এমন সম্পর্ক। সরস্বতীর মন উঠবে কেন? যখন হরোবাবু তার কাছে চাঁদা নিতে এল, সে বলেছিল, সে যেয়ে দিয়ে আসবে।

হরোবাবু বলেছিল, সংসারের ভালোমন্দ বিচারটা আলাদা,—কিন্তু ভালো হয়ে থাকাটা মেয়েছেলের কর্তব্য।

সরস্বতী বলেছিল, সংসারী বেটাছেলেরা বয়স মানে না, ধর্ম মানে না, তাদের কোন কর্তব্য নেই?

হরোবাবুর সে সময়ে দপদপা খুব। তিনি বলল, সরকার বাবুকে তাঁরা জানতেন। সরস্বতীর নামও তাঁরা জানেন। চাঁদা নিতে আসাটা ছল মাত্র, —আসল কথা,—সরকারদের অনেক জায়গাজমির মধ্যে এখানে খানিক। হরোবাবুরাই এখানে বাসবসতি জমিদার। সরস্বতী সকল দিক দেখে চললে তার ভালো হবে। নচেৎ তাকে তাড়ানো কঠিন হবে না। এ সব কথা ছোট সরিকের,—ভুবনবাবুর বাপ-কাকার। হরোবাবু পরের গু ঘাঁটে না।

অনাথা, বিতাড়িতা, স্বামীপরিত্যক্তা, বাবু বুড়ো হওনে বিপন্না, বাবু মরে যেতে বিগতযৌবনা এবং সে কারণে রোজগারে অক্ষম,—এমন নানাখানা

মেয়েছেলেদের, সসন্তান আশ্রয়দানে ও ধর্মপথে চলবার প্রেরণাদানে নিযুক্ত আছে।

হরোবাবু বলেছিল, মাতঃ, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন ড্যাঁও নাই। আমি চিরকুমার, চিরব্রহ্মচারী, শীতলামাতার দীন সেবক মাত্র। সকল স্ত্রীলোক বয়স যাহাই হউক, আমার চক্ষে জননী। তোমার বাবু অকালে প্রয়াত। এক্ষণে তুমি সকল সম্পত্তি আশ্রমে দানপূর্বক সেস্থানে সেবিকা হইয়া থাকিতে পার। কিন্তু আমার শরিকী ও জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্র চিরকালই নরাধম, বিষ্ঠার, কীটসদৃশ। সে আসিতেছে, যাহাতে মৃত অতুলচন্দ্র সরকারের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে তোমারে তুলিয়া বঙ্গোপসাগরে ফেলিতে পারে। উহার পরিবারবর্গকে এ ভাবে তাতাইতেছে। এক্ষণে মাতঃ! ওতলোর উকিল বীরেন, ওতলো শিবিরে আমাদেরই গুপ্তচর। তোমার সরু কনকশালী চাল ও ইলিশ মাছ প্রীতি, সর্বদা পমেটম ও অগুরু মাখিবার অভ্যাস, হারমোনিয়ামে গীত গাওন, বাংলা নবেল নাটক লইয়া দিবানিদ্রা যাওন, সকল সংবাদ বীরেন উকিল তোমার খাস দাসী সরমা হইতে, এবং আমরা উকিল হইতে পাইতাম। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ!

সরস্বতী বলেছিল, বাবু কি সহজ বাংলায় কথা কহেন না? তাঁহার ভাষা সে বুঝিয়াছে। কেন না সে "পঙ্কজে সরোজিনী," "লুৎফার প্রেম," "রক্তনদীর হাহাকার", "পাগলা হত্যার রহস্য" ব্যতীতও অনেক বই পড়িয়াছে। তবু! এ তাহার বিনীত প্রশ্ন মাত্র।

হরোবাবু বলেছিল, মাতঃ! স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে তারে আমি সম্মান করি, এবং তাদেরই এমত সাধুভাষায় সংলাপ বলি। কিন্তু! উহাদের ড্যাঁও ভুলিও না।

সরস্বতী সেদিনে ভুবন বাবুর জ্যাঠা আসতে তাকে গলা ফাটিয়ে অনেক কুকথা বলেছিল। পাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। বলেছিল, সে নগেনকে খগেন দেখাতে পারে। ঘরে জলজ্যান্ত বউ থাকতে পরের ঘরে আগুন দেওয়া সে সইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। দরকার হয় নগেনের গলা কেটে ফাঁসি যাবে।

সরস্বতী তেজে মটমট করছিল সেদিন, অনুরাধা! পরদিন সপাটে যেয়ে নগেনবাবুর বাড়িতেও ঢুকেছিল ও সচিৎকারে বলেছিল, নগেনবাবু যদি তার ওখানে যায়, তাহলে বাবুকে কেটে সে ফাঁসি যাবে।

তারপর হনহনিয়ে মহিলাশ্রমে ঢুকে বলেছিল, হরোবাবুর ভাইপোকে সে তাড়িয়েছে, অতএব তার চাঁদা দেবার হক জন্মেছে। একথা বলে সে একশো টাকার নোট ফেলে দেয়, রসিদ নেয় ও বলে আশ্রমে এসে সে ভক্তিগীতি শুনবে। বালিকাদের কুরুশ কাঁটায় খরগোশ বুনতে ও সূচীকার্যে জাতীয় পতাকা তৈরি করতে শেখাবে,—চাঁদা দান দ্বারা এ কাজে তার হক জন্মেছে।

নগেনকে বিতাড়ন ও হরোবাবুকে সরাসরি চাঁদা দান করে সরস্বতী স্থানীয়

যুবকবৃন্দের শ্রদ্ধাভাজনীয়া হয়। তারা বলে যায়, নগেনবাবুদের অর্থাৎ জমিদারদের দপদপায় তারা ক্ষুব্ধ। তারা এদের যবে প্রজা ছিল, তবে ছিল। এখন তারা যে যার জায়গায় মালিক। নানা জীবিকায় করে খাচ্ছে। সরস্বতীর ওপর তাদের গভীর সহানুভূতি আছে, ইত্যাদি।

নগেন্দ্রের উপর হরোবাবুর ড্যাঁও ছিল, সেটির সুমীমাংসা হয়। সরস্বতীর সঙ্গে তিনি চলিত ভাষায় কথা কইতে বাধ্য হন, কেন না তিনি "মাতঃ!" বললেই সরস্বতী খিলখিলিয়ে হাসত। সরস্বতীর হাসি দেখে হরোবাবু আশ্রমের লেডী সুপারের স্বামীর কাছে স্বীকার করেন, ওৎলোর চিত্তবিভ্রম ওই হাসি দেখেই হয়ে থাকবে। ওই হাসি পুরুষকে আওয়ারা করে দিতে খুবই সক্ষম।

এ কথা ঘুরে ফিরে সরস্বতীর কাছে ফিরে আসে। অনুরাধা। সরস্বতী এ কথায় রোষাবিষ্টা হয়। বাবু তাকে বিয়ে করেনি, কিন্তু সে বাবুকে সোয়ামি মনে করত। গর্ভসঞ্চার হয়েছিল একবার, কিন্তু ঘোষপাড়া-সতীমা'র পুকুরে নাইতে গিয়ে আছাড় খেয়ে তাকে কারমাইকেলে যেতে হয় ও সন্তানসম্ভাবনার উৎসটি বাদ চলে যায়। সেই বাবুকে "অতুল" না বলে "ওৎলো" বলা সে ক্ষমা করেনি।

সে মনে মনে বলে, হরোবাবুর ওপরে সরস্বতীর ড্যাঁও জম্মাল, এবং একদিন তা হরোবাবুর পাকা দাড়ি ও গেরুয়া পাঞ্জাবীর ওপর বিস্ফোরিত হবেই হবে।

ওই মহিলাশ্রমের মহিলাদের ছেলেদের সাত বছর হলেই হরোবাবু সরকারি অনাথাশ্রম বা জগম্মাতা মিশন আশ্রমে পাঠাত। মেয়েরা থাকত। অনুরাধা। এমন মেয়েরাও কিছু ছিল, যাদের ওখানে রেখে তাদের মায়েরা কেটে পড়েছে। সরস্বতী হরোবাবুকে শুধাত-এদের কি হবে?

হরোবাবু ওপরে আঙুল তুলত। মাথার ওপর পাখা, কিন্তু আঙুল বলত. ভগবান দেখবে!

মহিলাশ্রমে মাঝে মাঝে কোনও কোনও মেয়ের বিয়েও হয়েছে চাঁদা ভিক্ষে তুলে। সরস্বতী এটা দেখত, যাদের মায়েরা আছে, তাদের মেয়েদের চেহারায় যত্নের ছাপ। কয়েকটা মেয়ের চেহারাই বলে দিত, তাদের কেউ নেই।

দুটো বোন, বাণী আর রাণীর চোখে মুখে থাকত ক্রুদ্ধ অবিশ্বাস। লেডী সুপার বলতেন, মা ওদের এনেছে, নিজে ক'বছর থেকেছে, তারপর সরে পড়েছে। সেই থেকে ওরা কাউকে বিশ্বাস পায় না।

সরস্বতীর মনে তখন কিছুকাল, অনুরাধা! মা মা ভাবের খেলা চলছে। তার বশেই সে ওখানে যেত। সে সময়ে হঠাৎ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মাতাল গজা বা গজাননের মনে সরস্বতীর প্রতি অহেতুক টান জাগে। নিজেই সে নিজেকে

সরস্বতীর গার্জেন নিযুক্ত করে।

গজা দিনে মাছ বেচে, রাতে মাতাল। রোজই সে সরস্বতীকে বলে যেত, তোমার দক্ষিণপানে পুকুর পাড়েই বাড়ি আমার। শুধু "গজা" বলে ডেকো, তোমার বিপদে আমি আছি।

হ্যাঁ, অনুরাধা! গজা আজ নেই, কিন্তু তার ছেলে ভজগোবিন্দ বা ভজার দোকানেই তুমি শৈশবে ল্যাবেঞ্চুস ও টফি কিনতে। গজার বউ খুব সুন্দরী, খুব খাণ্ডারনী ছিল। স্বামীকে পেটাত। গজা বলত, সুন্দরী বউয়ের হাতে মার খেতে তার মিষ্টি লাগে। গজার বউ বড় ছেলে চন্নোর কাছে রেল কোয়ার্টারে থাকে কাঁচরাপাড়ায়।

গজাই একদিন সরস্বতীকে প্রত্যূষে এসে বলল, সে নেশা করেনি, সজ্ঞানে বলছে, আজ হরোবাবুর হোথা বাঘের খেলা হবে।

কি বলবে সরস্বতী, অনুরাধা! শহরের মুখে ঝাড়ু, শহরের বাতাসে বিষ! যে কারণে গাঁয়ে বিয়ে হচ্ছে বলে সরস্বতী খুশি! রাত পোহাল, ফর্সা হল, আটটা না বাজতে কি কেচ্ছা, কি কেলেঙ্কার!

পুলিশ এল মহিলাশ্রমে। ভিড, ভিড, অসম্ভব ভিড়!

জানা গেল, যা ভাবা যেত তা নয়। ওপরে চেকনচাকন, ভেতরে পোয়াল! লেডী সুপার ও তার স্বামীর যৌথ উদ্যোগে রাতে ওখানে বেটাছেলে ঢোকে, নানা কীর্তি হয়। বেলা নামে একটা মেয়ের ভেদবমি হয়েছে বলে হাসপাতালে নিতে হয়েছে শোনা গিয়েছিল। ভেদবমি নয়, তার ইয়ে হয়েছিল, গর্ভপাত করাতে নিয়ে যায় তাকে শ্রীযুক্ত সুপার। দূরে নয়, লাইনের ওপারেই রয়্যাল নার্সিং হোমে। কিন্তু পিছন পিছন দৌড়েছিল পাড়ার দৌড়বীর ভোমা! সে মহিলাশ্রম বিষয়ে সন্দিগ্ধ যুবকদের একজন। সে সত্বর থানায় যায়। এই ভোমাও হরোবাবুদের শরিক।

থানাবাবুও চটে যায় অনুরাধা! মহিলাশ্রম থানাকে পরোয়া করে না, হরোবাবু সর্বদা পুলিশকে "ফুলিশ" বলে। উৎসবে নেমন্তন্ন করে না। নার্সিংহোমে বেলাই বলেছে, এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। এবং এমন না কি আরও ঘটেছে।

নগেনবাবুরাই চেঁচায় বেশি। হরোবাবুর মাথা কাটা যায়। সে নাকি সত্যিই কিছু জানত না। "জানতাম না" বললে তো হবে না, হয় না। কেঁচো খুঁড়তে কত যে সাপ বেরুল অনুরাধা! হরোবাবুর ভাইয়ের শালীই লেডী সুপার হিসাবরক্ষক দেবোত্তর এস্টেটের প্রাক্তন গোমস্তারই ছেলে। মহিলাশ্রমের মেট্রন হরোবাবুর বোনঝি। দেখা গেল দেবোত্তর সম্পত্তি বেচা যায় না, -- কিন্তু মহিলাশ্রম থেকে শেতলা মন্দির অবধি অনেক জমি, কিছু বাড়ি, হরোবাবু কি সব মারপ্যাঁচ করে বেচেছে।

পুলিশ তো মহিলাশ্রম বন্ধ করে দিয়ে সব মেয়ে, বাচ্চাকে বুঝি সরকারি লিলুয়া হোমে পাঠাল। গজার সঙ্গে যেয়ে সরস্বতী বাণী আর রাণীকে নিয়ে আসে।

একটা বারো বছুরে, একটা দশ বছুরে। আদালতে জানিয়ে তাদের দখল নিল সরস্বতী। নতুন নাম দিল দীপালি আর রুপালি।

দুজনেরই চোখ দেখে বুঝবে না অনুরাধা! মনে কত বিষ! সুমতি যত্ন করছে, সরস্বতী স্কুলে ভর্তি করছে। খাওয়ানো, মখানো কত যত্ন! কেন না তারা "মা" ডাকবে।

কোনও দিন ডাকল না। ভালোবাসলে কাঠের পুতুল কথা কয়? কোনও-দিন নয়। অনেক করে সরস্বতী,—কিন্তু তারা খালি ফেল করে, খালি পড়ায় ফাঁকি। সঙ্গে করে তাদের নিয়ে ঘোরে সরস্বতী। কিন্তু,

খায় দায় পাখিটি

বনের দিকে আঁখিটি;—যাকে বলে গা জ্বালা কথা। এর ষোল, ওর চোদ্দ,—সে তো ধামসে ধামসে গতর বাড়ছে আর আজ হেথা "দাদা", কাল হোথা "দাদা" ধরছে।

সুমতি বলে, ওদের মন পাবে না সরস্বতী। পেছনে ছেলে লেগেছে,—'বলে টাকা ঝেঁকে নাও,—চলো যেয়ে বিয়ে করি।'

একদিন তো দুপুরে বেরিয়ে রাতে ফিরল। সরস্বতী সেদিন খুব মেরে-ছিল দুটোকে। পরদিনও বন্ধ করে রেখেছিল। তার পরদিন গজা আর ভোমা ধরে আনল কাদের?

না, বাজারে মাংসের দোকানীর ভাইকে, আর রুপশ্রী লোঁডজ টেলারিং-এর ছেলেটাকে। পাড়ার ছেলেরা জুটে গেল। বলল, এদের সঙ্গেই ফুর্তি করতে যায়।

সরস্বতীর মাথায় হাত। এমন লেখাপড়া, গানবাজনা, কাপড় জামা, সাবান তেল, তা এই দুই মাকড়ার জন্যে?

মেয়েদের ডেকে জেরা করবে, তো দীপালি বলে, ওরা আমাদের বে' করবে।

গজা, ভোমা, আর আর ছেলেরাই ওদের বে' করিয়ে আনে। ফলসো দিল সরস্বতী। রেজিস্টারকে বলল, ছোটটার আঠারো, বড়টার উনিশ পুরে গেছে।

ওদের বলল, টাকার লোভে মরছে তো জামাইরা? অধর্ম করবে না সরস্বতী। যার গায়ে যা আছে সে গয়না নিক, জামাকাপড়ের সাজগোজের সরঞ্জামের পাহাড় নিয়ে যাক,—বউদের নামে পাঁচ হাজার করে টাকা দিচ্ছি,—আমার তিসীমানায় আসবে না। ভেব না কিছু পাবে।

পুলিশে জানায় সরস্বতী, ভোমার কথায় কাগজে ছাপিয়ে দেয় যে, ওদের

বিষয়ে সরস্বতীর কোনও দায়িত্ব রইল না।

কোথা গেল তারা ?

দীপালির বর নাকি ঢাকুরেতে মাংসের দোকান দিয়েছে। রূপালির বর গেছে শিবপুরে। থাকলে আছে, না থাকলে নেই।

"মা" ডাক শোনার জ্বর ছেড়ে গেছে সরস্বতীর। তাই তো সে "মা" ডাকে শিউরে ওঠে, কাঁচ মেয়ে ডাকলে !

হরোবাবুর মহিলাশ্রমও গেল, হরোবাবুও সে কেস করতে করতে মরে গেল। অনেক রকম মানুষ দেখল সরস্বতী, জীবনটা তাকে পিপাসার্ত রেখে গেল, জল দিল না।

তাতেই সরস্বতী কোমর বেঁধে নেমে গেল। তার বস্তি হল, চালের ব্যবসা হল, দাপটে থাকে সে, কিন্তু বেটাছেলেকে বিশ্বাস পায় না। অতুলবাবুর জন্যে নয়, নিজের জন্যে দুঃখ হয়। অতুলবাবু তার মনে একটা অতি আবছা ছবি। তার কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁকড়া চুল, ছোট চোখ ইত্যাদি ইত্যাদি বলে যায় সে অভ্যাস বশে। মনে পড়ে না।

"মা" ডাকের পর মনের অ্যালবামে আরও কিছু ছবি যোগ হয়েছিল। কিন্তু সে সব শুনে দরকার নেই অনুরাধার। হয়, এমন হয়। কিন্তু অতুলবাবুর পর যে আমটাতেই কামড় দিয়েছে সরস্বতী, সেটাতেই পোকা বেরিয়েছে। আম থাকলে পোকা বেরোবে, তা বলে কি মানুষ আম খাবে না ? সরস্বতীর মতো সকলের কপালেই কি সব আম পোকাধরা বেরোয় ?

যা বলছে সরস্বতী, সবই বুঝছে অনুরাধা। টাকাকড়ি থাকলে মানুষ লোভে কাছে আসে।

ক'দিন মিষ্টি কথা। তা বাদে ব্যবসার প্রস্তাব।

অর্থাৎ মূলধন দাও।

অনুরাধা ! বুঝে নাও কেন সরস্বতী বিশ্বাস পায় না।

ওই তো শুনলে, সরস্বতীর মেয়েদের কথা। চৈতালি, মিতালি, ও সব বানিয়ে বলা। সরস্বতী তো মনে মনে চার মেয়ে, নাতি নাতকুড়, বেয়াই বেয়ান, দেবতুল্য জামাই, এ সব নিয়ে কত না গল্প বানায়। সাধে কি মতি বলে, সরস্বতী নবেল লিখতে পারত ?

দীপালির স্বামী পাঁঠা কাটছে। রূপালির স্বামী শিবপুরে। সরস্বতী ওদের কথা ভাবতেও চায় না আর। অনুরাধা বুঝে দেখুক সরস্বতী কেন তাকে লেখাপড়া শেখায়নি।

অনুরাধা এটাও যেন বোঝে, যে ভেনীতি ও মেনীতির মধ্যে সরস্বতী দীপালি ও রূপালিকে আর একবার দেখল। কাঁচ বয়স থেকে নেলপালিশ, ঠোঁটে আলতা দিয়ে পুজো দেখতে যাওয়া, ছি ছি ছি !

সরস্বতী অনুরাধার সর্বতো শুভকাঙ্ক্ষিনী। তাই গন্ধতেল নয়, মাথায় শালিমার মাখতে দিয়েছে। গরমকালে গায়ের ট্যালকাম পাউডার, বড় জোর একটা টিপ,—টিপে টিপে মানুষ করেছে। দশ বছর কাটতেই আর ফ্যান্‌সি জামা পরায়নি।

হক-না-হক স্টুডিওতে ফটো তোলাতে যেতে দেয়নি।

হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া দেখেছে। মাছ রে, তরকারি রে, মাঝেসাঝে মাংস রে; মিষ্টি মাণ্ডা, দই, স—ব খাইয়ে গেছে।

না খেলে দেহ থাকবে কেন? সরস্বতী তো এখনও প্রচুর খায়। না খেলে হবে?

কাকে বলে, কাকে বলে, বড় হোতাশ ছিল মনে,—অনুরাধাকে সব বলে সরস্বতীর মন খোলসা হয়ে গেল। কয়েক রাত লাগল বলতে। বলবে বলেই কাছে শোয়াচ্ছে সরস্বতী।

এখন মন হালকা, বোঝা নেমে গেল। হতে পারে সরস্বতী গুরুমন্তর নেবে। হতে পারে, নেবে না। সে সব ভেবে দরকার নেই অনুরাধার। বেশ সম্বন্ধ এসেছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ি, দেওর, ননদের জ্বালা নেই। মতি যেয়ে দেখে এসেছে। চালে চালে ঘর। চারদিকে জ্ঞাতিগুষ্টি। স্বামী-স্ত্রী খাটবে খাবে, ভালো থাকবে। সবচেয়ে ভালো, শহরের নোংরামি থেকে অনেক দূরে।

এখানে থাকলে ভালো মেয়েও ভেনতি মেনতির মত হয়ে যেতে পারে। আর সরস্বতীর থেকে দূরে থাকা দরকার। অনুরাধার চিন্তা নেই। মৌরিকে সরস্বতী ফেলবে না।

॥ ছয় ॥

বাগান ঝাঁট, উঠোন ঝাঁট, বারান্দা ঝাঁট ও মোছা, এ সব কাজ করতে আন্নার কখনও মুখে "না" শব্দ নেই।

—অ আন্না, পিঠ কোমর ব্যথা করে না?

—কাজ কল্যে পিঠ ব্যতা? না দিদি!

—মুখটি বুজে কাজ করে যাস···

—এগলা ভাল থ্যাকি গো।

শৈশবে থাকি, বিয়ের আগের জীবনে থাকি।

সম্বন্ধ তো ডেকে এসেছিল। সুমতি মাসির সঙ্গে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মা ধরে বাজারে যাই আমি বিকেলে। খুড়োশউর কলকেতা যেতে আসতে দেকেচে। কদ্দিন দেকেচে কে জানে! শেষে গুটি গুটি পেছনে এল। সে অনেক-কতা

বটে। বিয়ের আগে অবধি বাড়িউলি মাসি, আমার সরো মাসি মামার কতা মেনে চলেছিল।

বে' ঠিক হতে যেমন মাসি বাঁদ ভেঙে উছলে ধেয়ে এল।

—একনে আর মতির কতা মানব নে; মৌরির কতা মানব নে'। কাচে রাকবো, খাওয়াব মাকাব, সোয়াগ করব।

আন্না বে' হয়ে চলে আসার কালে মাসি যত কেঁদেছিল, আন্না তত। দিদি, ছোড়দি হিংসেয় মরছিল।

ভেনাতি আর মেনাতিকে কেন যেন বাড়িউলি মাসি সুনজরে দেখেনি!

মা বলত, আন্নারে নে' এত সোয়াগ করে! ওরা কতটা বড়?

—সোয়াগ করার মতো হতে হয়।

মামা কথাই বলে খ্যাট খ্যাট করে। প্রথমত বাজে বকে না। তারপর যা বলবে গার্জেনের মতো। যেন সাত বুড়োর এক বুড়ো।

ভেনাতি দিদি আড়ালে বলত, কতা যেমন নিমপাতা। জম্মোকালে মুকে মদু দেইনি কেউ।

মা খুঁত তুলত।

—যার দয়াতে খেয়ে পরে বেঁচে আচো, আছুয় পেওচো, তার কতা টুকচো?

মামা বলত, আমার টানও আন্নার পরেই বেশি। কিন্তুক আমি ধম্মো মানি। যেটুকু করি, তিনজনের জন্যেই করি।

অবশ্য করার খুব কিছু ছিল না আর। পাঁচ বাড়ির কাজ! মাইনে বেশি, একবেলার খাওয়া তো জলখাবার থেকেই উঠে যেত। সারা বছরই "পুরনো ঝুরনো" কাপড রে, সায়া রে, জামা রে' স...ব মিলত।

না, ছেঁড়াখোঁড়া দিত না কেউ। ভালো ভালোই দিত। বিশ্বাসী মানুষ বলে মা পাড়ায় খ্যাত হয়ে যায়। পুজোর সময়ে মা বলত, তিন বাড়ি থে' ট্যাকা নোব,—দু' বাড়ি থে' মেয়েদের কাপড়-জামা-সায়া দিক।

দিদিরা ঝগড়া করত, ট্যাকা নেবে কেন? ট্যাকা দে' কি হবে?

এ কথা শুনে মামা বলেছিল, তোমাদের থাবড়া দে' চাবলা ঘুইরে দিতে হয়। মা কেন টাকা জমাচ্ছে জান না? দেক! বে' হলে যেতা খুশি যেতে পারো! একনে মা'র কতা না মেনেচো তো দেইকে দোব।

এ কথা ঠিক, যে মা মাসিকেও বলেছিল।

বড় আর মেজোটা বর্ষাকালে বাগদা চিংড়ির মতো উল্সে উটেচে গো মা!

মাসির নিয়ম, মাসির নিয়ম! মেয়েরা বলবে "মাসি" আর মা বলবে "মা"।

—সে তো কানে আসচে।

—ওদেরে পাত্তর দেকে দাও মা! তোমার চেনাজানা বিস্তর।

—কিছু সোমজে চলতে বলো, কিছু সওবৎ শেকাও। ভদ্দরতা বে' দিতে হলে ভদ্দরতা মেয়ে চাইবে। এরা তো শওরের বাতাসে...

না, মাসি খোঁজ খবর করছিল। মামাও বলেছিল, এট্টু দেকে শুনে দিতে হবে। শউরে ছোঁড়াগুলো কালীঘাট যেয়ে সিঁদুর পরায়, ছেড়ে দে' পালায় বেশ গেরস্ত মতো ঘরে...

আন্না জানত, দিদি বা মেজদি, মা বা মামার পছন্দে বিয়ে করবে না। তারা বলত, বে' হবে, তা বাদেও খেটে মরব কেন?

আন্না বলত, কি করবি দিদি?

—ফুর্তি করব, বেইরে বেড়াব, সিনেমা দেকব, আমোদ করব। যা তুই, আমাদের কতা শুনতে আসিস কেন? তোরে তো মাসি বড় ঘরে বে' দেবে।

ফুর্তি, বা বেড়িয়ে বেড়ানো, বা সিনেমা দেখা, বা আমোদ করার স্বপ্নে দু' বোন বিভোর থাকত। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বন্ধু ওদের। সবাই ঝাঁক বেঁধে সিনেমা দেখে, তেলেভাজা খায়, পুজোর সময়ে হেঁটে হেঁটে ঠাকুর দেখে।

শেষে বাড়িউলি মাসিই বলল, অ মতি! এট্টু গা লাইগে পাত্তর দেক দুটো। ওদের ভাবগতি যেন কেমন! ঘরপোড়া গরু তো। সিঁদুরে মেগ দেকলে ভয় পাই।

—দেকচি...ধান্দা লাইগে রেকিচি...পরের রোববারে বাগুইআটি যাব। শুনচি ছেলে ডাইভারি শিকচে...লাইসেন্ বের করবে...তিলজলা পেইরে বাড়ি...বাপের দোকান আচে।

—টাকা তো চাইবে।

—সে...হয়ে যাবে।

—কেরেমে নগদ টাকার চাপ বাড়চে।

—কত আর চাইবে? দু' পাঁচ হাজার?

তখন তেমনি ছিল বটে। আজ ক'বছর নিজ জমি নেই, মজুর খাটে, বা নিজ সাইকেল রিকসা নেই.—ভাড়া খাটে,—বা সিনেমায় টিকিট বেলাক করে,—এমন ছেলেরাও তো দশ-বিশ হাজার নগদ—আংটি—সাইকেল বা ঘড়ি,—মেয়ের এক-দেড় ভরি সোনা.—এ সব চাইছে। বিয়ে করছে, ত্যাগ দিচ্ছে, আবার বিয়ে করছে...

মামা যেত... নির্ঘাত যেত...কিন্তু দিদি তো হতে দিল না।

শনিবার দিনে দিদি পালাল।

বাড়িউলি মাসি বলল, কারে দে' খোঁজ করাই? এণকালে ভোমা, গোরা, বদন, সব ছেলেরা ছিল। তারা বিপদে আপদে এসে মাতা দিত। একনে তো কেউ এগোয় নে' মোটে।

মামা সবে কাজ থেকে ফিরেছিল, জামা খুলতে যাচ্ছিল। জামা আবার পরতে পরতে, হাতা গোটাতে গোটাতে চাপা গর্জনে বলল, কারেও দরকার হবে নে'। মতি সাঁপুই এখনো মরে নি।

তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে মেনতি দিদিকে একটা চড় মারল।

চড়ের শব্দ হল যা!

মেনতি দিদি ককিয়ে কাঁদতে যাচ্ছিল, মামা বলল, ভেনতি কোতা? কার সঙ্গে পাইলেচে এক্যানি বল্। না বলোচো তো তোমারে আমি...

মাসি, সুমতি মাসি, তনু দৌড়ে এসেছিল। মা মাটিতে বসে, মুখ হাঁ, চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে।

আন্না দেয়ালে মিশে যাচ্ছিল।

ভেনতি দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলল, বরুণ! প্যাডলার! ওরা...

মামা বলল, কালীঘাটে বে' করতে গেচে, না পাইলেচে শুদু?

—বে' কত্তে...

মাসি বলল, ছেড়ে দাও মতি!

মামা চাপা গর্জনে বলল, এ আপনার মিতালি নয়। জলজ্যান্ত ভেনতি! আর বরুণ ...বরুণ রাতে চুল্লু আনে ভাঁটি থেকে।

মাসি বলল, যে অপমানটা কল্যে, তারপরেও বলচি, চেঁচিয়ে কেলেঙ্কার বাইডো না। ভেনতি চুলোয় যাক। আরো যে দুটো আচে!

মামা তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

—মেনতি, তোর কে? কারে জোটালি?

—বল্যে মারবে নে' বলো?

—না। মোয়া খেতে দোব।

—না মামা, দো'ই তোমার ··গাল ফুলে যাচ্চে...বড্ড লেগেচে গো...

—আমার রক্তের রক্ত তো নো'স। হলে গলাটা নাইমে দিতে পাত্তাম!

—মামা গো!

—বল্ হারামজাদী!

– রতন!

মাসি বলল, অ্যাঁ? রতন? কোন্ রতন?

সুমতি বলল, দাদা গো! আমাদের দোকানের ছোঁড়া!

মাসি বলল, ক্যাতার ব্যাটা রতন? কি! আমার দোকানে কাজ করে অ্যাৎবড় আস্পদ্দা?

মামা যেন হতাশ হয়ে নিভে গেল। বলল, বাপের ধারা পেয়েচে সমুলে... তোমাকেও বলি মৌরি! মেয়েদের এত কিত্তি কিছুই বোজ নি?

মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বুজলে কি ছেলে দেকে দাও, ছেলে দেকে দাও

বলে তোমার আর মায়ের পা ধরি বার বার ?

—যা পারো করো গে। আমি গ্যারেজে চল্‌লাম,—নিজেরা বোজো। ভ্যালা এদের বোজা বয়ে বয়ে মরচি...এমন এট্টা ভদ্দরতা মানুষের কাঁদে চাই-পেচি...সব সইতে পারি...বদনাম সইতে পারি না।

কিন্তু মামা তো সরে থাকতে পারেনি। শেষ অবধি এ বাড়িতেই নেমো-ছেমো করে ভেনাতি দিদির সঙ্গে বরুণের আর মেনাতি দিদির সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়।

মা বলল, এ পোদ, ও চাঁড়াল গো মা! এ আমার কি হল!

মামা বলল, শওরে ও সব জাতের বিচার নি। একনে এক জামাই চুল্লু বাইবে, আর জনা ইনির চাকর। এই ভেবে মনরে তুষ্ট রাকো।

ভোম্বা, গোরা ইত্যাদি প্রাচীন শূরবীররা নেই, এবং অজিত তখনোও তোমার মাসির ধর্ম ছেলে হয়নি,—এমন এক সন্ধিকাল ছিল সেটা। তখন মামার আশেপাশে ছিল রাখাল, অরবিন্দ, সুজয়, মান্নো, কপিল, আশীষ ইত্যাদি ইত্যাদি। আন্নার শুধু মনে পড়ে, অরবিন্দ মামাকে বলে যাচ্ছে, চুল্লু বাইলে ওর গলা নেমে যাবে মতিদাদা! আমরা কামারপাড়ার বেইজ্জত হতে দেব না।

একেবারে মিনিমাগনা বিয়ে হয়নি। মামা বরুণকে সাইকেলরিকশা কিনে দিয়েছিল, মেনাতি দিদিকে পাঁচশো এক টাকা দিয়ে বলেছিল, তুইও কিছু নে' বাজারে বোস্ গে যা!

বাড়িউলি মাসি দুজনকেই কানে সোনার রিং দেয়।

মা দেয় পলা ও রুপোর বালা। কাপড় জামা।

খুব নিঃশব্দ বিয়ে, লোকজন নেই। পাশের বাড়ির অলকার মা শাঁখ বাজাল, উলু দিল।

মামার খরচে অরবিন্দরা সকলকে লুচি, আলুর দম ও মিষ্টি খাইয়ে দিল।

পরদিন মামা বলল, যে যে যার যার ড্যারায় চলে যাও। কোন বজ্জাতি নষ্টামি কল্যে হাত বা পা রেখে দেব।

আন্নার খুব, খুব দুঃখ হয়েছিল।

কেমন করে ওরা বেড়াবে, আমোদ করবে? কারে নিয়ে করবে? বরুণটা তো তেমনি দেখতে, যেমন লোককে দেখলে পুজোর ভিড়ে সুমতি মাসি চেঁচায়, কোৎকার ছুল্লু ছিলে গো? মেয়েদের লাইনে গোঁত্তা মারচে?

আর রতন? ক্যাতা আর রতন নিত্যি চালের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যায়,—ছারছার করে বকে।

মাসি বলল, জাতটাও ধরি না মোরি, কিন্তু পচন্দের বলিহারি যাই। সে নিজের মেয়েদের বেলাও দেকিচি। যৌবন গো, যৌবন! দুটো মেয়েরই কেঁদে কাটবে।

—আমার মেয়ে মা ! কপাল কি ভালো হবে ?

—তোমারে বে' দিইছিল। এরা বে' কল্য ! স - ব হচ্চে শওরের হাওয়া !

—ভাবচি কাজের কি করব।

—অৎগনুলো পারবে নে।

—তাই পাবি ?

—অনুরাদারে নে' ঘনুরো না বাচা !

—না। দনুটো বাড়ি ছেড়ে দোব। পালবাড়িতে বাসনও বাড়চে,—বড বোয়ের কিত্তি ! আর গণেশবাবনুর বাড়িও দনুরে পড়বে।

আন্না ভয়ে ভয়ে বলল, মার সাতে যেতাম, মার সাতে আসতাম ?

মা বলল, না।

মাসি কিছনু বলল না।

মা বলল, তুমি ঘরে থাকো মা। তবে মায়ের খাবার জলটা এনে দিলে,—বাসন মাজলে,—কাপড় কাচলে,—সেই যতোষ্টো হবে। একনে ওরা নি ·

অৎ কাজের দরকার কি ?

মামা বলল, ধবে ঘাড়ে চাপে দেক !

ঘাড়ে চাপেনি, তবে মাঝে মাঝে ভেনতি দিদি টাকা নিয়ে যেত।

ভেনতি দিদিকে তো বাজারেই বসতে হল। মাসি বলল, মেনতি ক্যাতা বা রতনকে ট্যাঁকে রাখে। যতোষ্টো নাক-চোক খনুলে কাজ করচে।

—তোমার আশিব্বাদ গো মা !

ভেনতি দিদির বর সে নতুন রিকশাতেও চনুল্লনুই বায়। ভেনতি দিদি বলে, না বাইলে জগোবাবনু ছাড়বে কেন ? তাদের জমিতে ঘর যে কালে ? তা মা ! আন্নারে নে' যেতেও তো পারো !

—না ভেনতি ! আমি পোদের ঘরে যেয়ে জাত খোয়াতে পারব না। আর আমাকে তো বনুজে চলতে হবে ? হেতা মা আচে, দাদা আচে, ভদ্দরতা এট্টা। আন্নারে বে' দিতে হবে নে ?

প্রথমটা যেমন আড়োছাড়ো ভাবগম্যি ছিল,—কালে কালে তার ধার যেমন কমেছে,—দনুরত্ব বেড়েই গেছে।

বরনুণ চুল্লনু বাইত,—চনুল্লনু ধরল।

ভেনতি দিদি ধরল ঠিকে কাজ।

মেনতি দিদি আর রতন এখন নিজেরাই চালের কারবারি। মেনতি দিদি কোথায় গাড়িয়া স্টেশনের পনুবে দনু' কাঠা জমি কিনেছে,—ঘরও করবে।

দনুজনেই ছেলেপনুলের মা এখন। তবে আন্নার খবর জেনে দনুজনেই বলেছে, শওর মন্দ, গাঁ ভাল, কিসে ভাল ?

ওদের বিয়ের কালে ও পরে কিছনুদিন ওই বিয়ের গল্প নিয়েই পাড়া মেতে

থেকেছিল। মা বাড়ি এসে কাঁদত।

মামা বলত, মারো নাতি গজালির মুকে। এরা তো বে' করেচে,—ঘরে ঘরে যে কেচ্চা একশো রকম?

—আর সয়নে' দাদা।

—সইতেও হবে, চলতেও হবে যকোনে, তকোনে "সয় নে" বলে লাব?

—যকোনে ভাবি…

—তুমি তোমার রাশে বশে থাকো। আপ্নার দিকে মন দাও। সন্দে হলে পুজো পাঠ করো।

—তুমি না থাকলে…

—আমি নি' ধরে নাও। মুনিব একনে দোনামোনায় পড়েচে।

—কেন গো?

—ওনার বউ বাপোত্তি সম্পত্তি পেল বধ্যমানে। উনির মেয়ের বে' দে হোতা চলে যাবে।

—তুমি সেতা কি করবে?

—সেতা যে শউরের মস্ত গারাজ গো! আমারে ইনি ছাড়বে নে'। গারাজের ওপরে ঘর বাতরুম, পাইখানা। থাকার বেবস্তা, খাবার বেবস্তা কাজও হালকা হবে।

—চলে যাবে?

—আন্নার বে' হোক?

—আমার কি হবে?

—তুমি কি আমার সঙ্গে এইছিলে, না সঙ্গে যাবে? ভগমানে ভরসা রাকো।

—ইনিও আতান্তরে পড়বে।

—ও স—ব ঠিক হয়ে যায়। উনি অনেক দেকেচে। এক নাতি যাবে, আরেক নাতি আসবে। ভগমানের গারাজে কারো জন্যে কিচু আটকায় নে। আরে! চন্নন বাবুর একমাত্তর ছেলে, ছেলে কেন, একমাত্তর সন্তান এরোপেলেনের আরো কত জনার সাতে মল্য…সোয়ামি ইস্তির কি মরে গেচে? বেঁচেই আচে।

মামা কি হৃদয়হীন?

মামা কি পাষাণ?

মাসি বলত, সোমসারেও আচে, তোমাদেরেও দেকচে মোরি! কিন্তুক মনে মনে সন্নাসী হয়ে বসে আচে। বেশ করেচে। নইলে বাঁচতে পাত্ত?

—সব কচ্যে, কিন্তুক আটা নি' কিচুতে।

—হেমন্তদার জান বটে! বাপ নি' মা নি' কাকারা তাইড়ে দেয়,—ওর

তো বাঁচার কতাই নয়। সে দেকো, আমায় দেকচে, পাঁচজনারে টানচে। বউ চলে গেল, মেয়েমানুষের নামে জ্বলে ওটার কতা,—শুদু বলল, অক্ষ্যামতা, তাতেই থাগল না। আমি জানি, বউ অক্ষ্যামতা হলে ও তারে নিয়েই ঘর কত্ত।

—বড়ির ডাল ভিজোব মা?

—ওই! কল্লুর মন ঘানিতে। আমারও মরণ! তোমার সাতে এ সব কতা কই। পড়তে জানো না, রামকিষনো কতামেত্তোত্তি পড়লে না, "রাণী রাসমণি" বইও দেকলে না। যাও ভেজাও গে!

বড়ির রোজগারটিও মামার বুদ্ধি। অবসর সময়টা বড়ি দাও না, তা তো সবাই নেবে। আপ্নাকে তো পাত্তবস্তু কত্তে হবে?

আর শওরে নয়।

---কি শওর, কি গাঁ! কোতাওই সগ্য-নরক নি', ও তুমি সঙ্গে আনো, ফেলে থুয়ে যাও। আপ্নারে খুব দেকে শুনে···

মাসি বলল, দেকো! ওর সম্মন্দো ডেকে আসবে মুকে চোকে ভদ্দরতা ভাব, হাতে পায়ে লক্ষ্মী ছিরি! যে পাবে সে তপিস্যে কচ্যে। মোচা কুটেচে যেন মেসিনে কুচোনো। ঘর পুঁচবে, এক বালতি জল এট্টা ঘর,—আবার জল পালটায়। কাপড় কাচে যেন নেতা ধোপানি!

"নেতা ধোপানি" শব্দগুলি খুব হাত নেড়ে বলত মাসি। বলেই বলত, অ অনুরাদা! সন্দেবেলা তোরে বেউলো নখীন্দরের গান শোনাব। কারে বা শোনাব, এট্টু শুনতে না শুনতেই ঘুমে কাতর!

—আজ ঘুমোব না।

কিন্তু গান শুনতে বসলেই আপ্নার চোখ ঘুমে ঢুলে আসত। মাসি বলত, যা আপ্না, খেয়ে নে।

ঘুম ঘুম চোখে আপ্না ভাত খেত, আর মাসি বলত, এমন মেয়ের সম্মন্দ ডেকে আসবে। যেই একতা মনে করেচি, সেই টিকটিকি ডাকল, টিক-টিক-টিক! তবে একতা সত্যি হবেই হবে।

খেয়ে মেখে শরীর তো উথলে উঠেছিল। মা বলত, এমন আপ্না কার হাতে বা দোব!

মামা বলত, মানুষের হাতে।

—কি বা কদর করবে!

--মানুষ হলে কত্তেই হবে।

মামা সগর্বে বলত, আপ্নার তরে আমিই খোঁজ করব ছেলে। ভেনতি আর মেনতি যা কল্য, আমার মুক পুড়ে গেচে।

—উনি বলে, সম্মন্দো ডেকে আসবে।

—এলেই ভালো। তবে কি ! এলেই হল না। আমিও দেকে যাচিয়ে নোব।

সুমতি মাসি বলত, আম্নারে নে' তোমরা তিনোজনা এমন কচ্য ! ওর বে' হলে কি সাতে যাবে ?

মাসি বলত, তুই যাবি।

—সে দরকারে যেতে হবে।

জেলখানায়, কোনও বিরল অলস দুপুরে আকাশের রং বদল দেখতে দেখতে আম্নার মন কোথায় চলে যায়।

দিদিমণি বলে, কলকাতায় এদ্দিন রইলে, মা একটু লেখাপড়া শেখায় নি ?

—না তো !

—বিয়ে ! বিয়ে ! বিয়ে ! যেন আর কিছু ভাবতে নেই মানুষের।

অবাক লাগে আম্নার।

—লেখাপডা শিকেও তো বে' করোচো ·

· খানিক শিখলে তো কিচু করতে পারতে।

—কেন ? লোকের ঘরে খাটব, মেয়েদের মানুষ করব ?

—বিয়ে দেবে তো ?

—নিচ্যয়।

—লেখাপড়া শেখাবে আম্না, বলো ? আমি ব্যবস্থা করে দেবো। আমার বেনউ একটা ইস্কুল চালায় এক বস্তিতে, বড় মেয়েরাও পড়তে আসে সেখানে।

—সে তো খুব ভালো।

—লেখাপডা শিখল, কোন কাজ শিখল, বড় হলে বিয়ে দিও। এমন ভাবটাই ঠিক নয়, যে কোন মতে বিয়ে হলেই সব হয়ে গেল।

তা তো আম্না জানত না। জ্ঞান হওয়া থেকে সে জেনেছে "বিয়ে" হল মেয়েদের একমাত্র গতি। দিদ্‌মার স্বামী মরে ছিল, খালপাড়ে এসেছিল, দুর্ভাগ্য ! মা-কে বাবা তাড়িয়ে দিল, দুর্ভাগ্য ! যাকে বলে ললাট লেখন ! মাসির জীবন বড় শূন্য, স্বামী সন্তান নেই বলে। দিদিদের বিয়ে হয়েছে, আম্নারও বিয়ে হবে। বিয়ে ছাড়া আর কী হবে ?

আম্না বিয়ের কথাই ভাবত।

আর মাসির কথামতো বিয়ের সম্বন্ধ ডেকে এল আম্নাদের বাড়ি।

॥ সাত ॥

আল্পনা আর সুমতি হাঁটছিল আর পিছনে চাইছিল। প্রৌঢ়, বেঁটেখাটো, শক্তসমর্থ পুরুষ, কাঁচাপাকা চুল ছাঁটা, গায়ে টেরিকটের পাঞ্জাবী, যা ময়লা, পরনে ধুতি ও পায়ে জুতো। হাতে একটা থলিও ছিল।

সুমতি বলল, আ গেল যা! মিনসে যে পিছন ছাড়ে না!

লোকটা কী আশ্চর্য, বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

আল্পনা তো দৌড়ে ভেতরে চলে এল, মাসির ঘর সামনে, সেখানেই ঢুকে পড়ল।

মাসি বলল, কী হয়েচে র‍্যা?

—এট্টা ভদ্দরলোক···পেচু পেচু আসচে...

—কোতায়?

—বাইরে দাঁইড়ে আচে।

—ভর বিকেলে? কার এত আস্পদ্দা দেকি?

লোকটিকে মাসি যা বলছিল, সব শুনতে পাচ্ছিল আল্পনা।

—কে আপনি? আমার মেয়ের পেচু নিয়েচেন আর সমানে আসচেন? দেকে তো মনে হচ্চে না কিচু, তবে শওরে বিশ্বাস কি?

—মা! হাত জোড় করচি, এট্টু কতা কইতে দেন। আমি এগজন··· চাষীবাসী গেরস্ত...এট্টু জল দেবেন?

মা গো! মাসি লোকটাকে ভেতরে ডাকল, বারান্দায় বসাল, সুমতি জল এনে দিয়ে বলল, ক'দিন ধরেই ওরে দেকচে। আজই যা পেচু পেচু এল।

লোকটি বেশ জোরে জোরে কথা বলে। গলার স্বরটাই উঁচু।

—দেকুন, আমার নাম পরিচয় লিকে দে' যাচ্ছি। খোঁজ নেবেন সেতা। ক্যানিঙে মাদ্‌লা পেইরে বাসন্তী থানা, হেঁতালপাড়ায় আমার বাড়ি। নাম অনুকুল নস্কর। আমার জোতজমা, হার্সাকিং মেসিন, স—ব আচে। চাল-মুড়ি-সবজি-মাচ কিনি না। গাইগরু আচে, তিনটে হাল। ভাগের পুকুর দুটো, নিজস্ব এট্টা। মেয়েকে দেকে বড্ড মনে ধরেচে...যদি মেলে ঝোলে তবে...

—বে' করবেন?

—ছি ছি ছি ছি! এ যে অনাচারে কতা মা! আমার ছেলের সাতে...মানে মেয়ে পচন্দ হয়নে' আমার সওজে...মা'কে দেকে থেকে...আপনারই মেয়ে তো?

—না। আমার বাড়িতে ওরা ভাড়া থাকে। আমি ওকে খুব ভালোবাসি।

—কতাবাত্তা... ?

ওর মা আচে, মামা আচে...আপনি কাল বা পরশু ছ'টা নাগাদ আসবেন,

কতাবাত্তা হবে।

—যাবেন.. দেকে আসবেন...ঘাটের চায়ের দোকান থে' যারে আমার নাম বলবেন...

—কলকেতা ঘন ঘন আসা হয় ?

—মাওলামকন্দমা আচে...জমি থাগলে মাওলো লাগবে। তা ছাড়া ক'টা টেপাকল বসানো দরকার! হোতা তো সুগভীর নলকূপ নইলে...তদ্বির কত্তে আসতে হয়।

—ইলেটিরি নেই!

—খোঁটা বসেচে, এসে যাবে। উটি মা! নোমস্কার। আসবো আমি।

লোকটা চলে যেতে মাসির মুখখানা যা হল! নিশ্বাস টেনে ধপ্ করে বসে বলে, ও অনুরাধা পাকা খোল! অ সুমতি, জল দে! এ কি আশ্চাজ্য কতা মা! আমি কি ভগমান? যা বললাম, তাই হল? সম্মন্দ ডেকে এল? কি আশ্চাজ্য কতা! তোরে বে' দিয়েই নস্তর নোব অনুরাধা!

সুমতি বলল, ওর মা আসুক! মতি দাদা আসুক! তারা তো শুনবে।

- চাল কেনে না যকোন, তকোন অনেক পয়সা ওদেরে।

—অবস্তা ভাল গো!

--ওরা আসুক!

মামা যথারীতি সব শুনে মেলে বলল, সেদে এয়েচে, তা মানচি। এল কেন?

—ওরে চোকে ধরেচে বলে।

—তবে কি ছেলের কোন গণ্ডগোল আচে? সেদে বেটার বাপ আসে ককনো?

—না না, কতাবাত্তায় বেশ রাশ আচে।

—আসুক উনি। আমিও যাব। বে'র আগে যদ্দুর সম্বব দেকে শুনে নিতে হবে।

—নিশ্চয়। আমার গলার মালা বল্যে হয় অনুরাধা। তারে তো ভাইসে দিতে পারব না।

—না...মেয়েটা বড় ভালো...আমাদের বিনা কিচু জানে নে...ভস্সা করে ...তার বিষয় দায়িত্ব অনেক বেশি।

মা বলেছিল, এমন ঘর বর আপনার হবে?

—ঘরের কতা শুনোচো.. বর চক্যে দেকনি...একনি যেমন হলুদ কুটতে বসলে?

মাসিও বলল, টাইম নোব,—সব্যাস্য দেকবে মতি,—পাঁচজনারে শুদোবে, —অনুরাধা বলে কতা!

—কে আর অনুরাদা বলবে মা ?

—কেউ তো বলে নে' আমি ছাড়া ? যদ্দিন পারি আশ মিট্যে ডেকে নি।

—তুমিও যাবে তো ?

—আসাগর বুদ্দি তোমার বাচা ! আমি কে হই ? মা না মাসি ? কেমন সম্পক্য ? মা তো সদোবা হয়েও বিদোবা। আমি কি ? একেবারে বোজো না। গাঁ-গেরামে এট্টা কতা থে' লঙকাদওন পালা কেত্তন হয়। আপনার সুকশান্তি ছাড়া আর কিচু ভেবো না।

যতদূর দেখা যায়. সব দেখে ছিল মামা।

অনুকূল নস্কর একটা কথাও মিছে বলেনি। তার চার ছেলে। সেজোটির জন্যে মেয়ে খুঁজছে। ছেলেরা সবাই জমি জেরাত, হার্সাকিং মেশিন নিয়ে থাকলে চলে না। মেজ ছেলে জমির আপিসে পিওন, ডায়মনহারবারে। বড়-জন চাষবাস দেখে। ছোটজন ইস্কুলেও পড়ে, সন্দেয় দোকানেও বসে। হ্যাঁ একটি দোকানও আচে তার।

এই গোলাদারী দোকান। মা মনোসার কৃপায় হেঁতালপাড়ায় অনুকূল নস্কর এমন এক নাম, যে সে যা বলে, মানুষ জানে, ন্যায্য কথা কইবে।

সেজ ছেলেটির বিষয়ে তার চিন্তা বেশি। কেননা সে ছেলে ক্লাস টেন অবধি পড়েছে, বুদ্ধি ও হুঁশ তার খুব। সে ছেলে এর তার মামলার তদারকি করে, ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর আদালতে সে এক চেনা মুখ। বাইশ বছর বয়স, সচ্চরিত্র। তার জন্যই সুলক্ষণা মেয়ে খুঁজছে অনুকূল।

মামা তো মায়ের জীবনকাহিনী খুলে মেলে বলেছিল। সব শুনল অনুকূল, সে বরকর্তা, তার কোনও আপত্তি নেই। দেনাপাওনের ব্যাপার নেই। মেয়ের বাপের গলা কচ্‌লে টাকা নিলে সুখ হয় না। বড় বউ তো পাড়ারই মেয়ে, তার বাপ যেমন পেরেছে তেমন দিয়েছে। মেজছেলের বউটি ছেলের মায়ের সইয়ের মেয়ে।

আনন্দের সংসার,—আনন্দের সংসার। সাত ভোরে রান্না চড়ে, চোপ'র দিন খাওয়াদাওয়া। সকালে গরম ভাত খেয়ে সব কাজে বেরোয়,—চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ যা জল দেওয়া ভাত খাওয়া হয়,—তাতের সময়! দুপুরে মাঠের কিষাণরা,—বাড়ির সবাই,—রাতে দশটায় উনান নেভে। মাছ ? কত খাবে খাও না। পুকুর আছে, বাজার আছে। ঝগড়োকেজে এই হচ্ছে, এই মিটছে।

এত এত কথা !

বয়স কম আপনার ? এ বয়সে না গেলে সেথা মন বসবে কেন ? অনুকূল যে সব শিশু চারা বাগানে বসিয়েছে, তারা এখন নারকোল, কাঁঠাল দিচ্ছে না ? মানুষও গাছেরই মতো।

—শওর নয়, তাতে মার কণ্ট হবে নে'। বাড়িতে এত মানুষ, এত কাজ-

কর্ম—পুজোপার্বণ—মনোসার গান—সিন্নি কয়েকবার, ভুলে থাগবে।

আসলে আপনার মুখটি অনুকূলের অকালে মৃতা বড় মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন মেলে। নইলে ওকে দেখে অনুকূলের বাৎসল্য জাগবে কেন?

আর, সেজোর বিয়ে দিয়েই অনুকূলকে তার জ্ঞাত ভাইপো পোশা বা পশুপতিকে সংসারী করতে হবে। যত জ্ঞাতগুষ্টি, তাতে অভিভাবক তো অনুকূল। পোশার চেহারা চমৎকার, স্বভাবে দোষ নেই, কিন্তু ছোঁড়া মোটে সংসারমন্য নয়। মোটে তো পঁচিশ বছর বয়স। এর মধ্যে দুটো বিয়ে করেছিল, দুটোই চ'লে গেছে, বা পোশা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। তিনি যাত্রায় প্রম্‌ট করবেন, গান গাইবেন মনসাতলায়, হেথাহোথা ঘুরবেন। বউরা থাকবে কেন? তারা তো সংসার চায়।

অনুকূল এবার এক খান্ডারনী মেয়ের খোঁজ পেয়েছে, এই বউ পোশাকে শায়েস্তা করবে। পোশা তো জমি জমা বাঁধা বন্ধক রেখে, বা যা-তা দামে বেচে বাঁধন কেটে ফেলেছে। দিব্যি ঘরদোর, দিব্যি ক'টা নারকোল গাছ। পোশা ঘর বাঁধতে, বেড়া দিতে, গো-চিকিৎসা করতে, নানা কাজে পটু। কিন্তু গা লাগিয়ে কাজ করবে না। বললে বলবে, বউ আছে না ছেলে? আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

সেইটি অনুকূল পারে না। সে সকলকে ভালো দেখতে চায়। সকলকে দেখে। গ্রামের কয়েকটা বউ ঝি ধান কাটারি কাজ করে অনুকূলের। সবাই দুটি খাক, ভালো থাকুক

না। মহাজনি সে করে না। বংশের কেউ সুদের কারবার এখনও করে নি। মনা মাইতি করে বটে, সে তো নস্করদের কেউ নয়। চলুক মতি, স্বচক্ষে দেখে আসুক সব।

মানা গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, খুব ঘর দোর, খুব অবস্থা। ফেরিঘাট থেকেই শুনিচি মহা সজ্জন মানুষ। খানিক সেকেলে ধাঁচের। ভাত খাব না শুনে হাহাকার কল্য। তাও মুড়ি, সন্দেশ, দুধ, নারকোল কোরা, ভুরিভোজন হয়ে গেল।

ছেলে কেমন?

দিব্যি জোয়ান, কথা কয় না মোটে। সে তো বলল, আমি কি মেয়ে দেখব? বাবা রয়েছে।

বাপ আবার এল।

সামনে অঘ্রান,—খুবই সুদিন আছে। বরযাত্রীদের খাওয়াবে,—শাশুড়ি, দুই জা, পিসশাশুড়ি, মাসশাশুড়ি, খুড়শাশুড়ি—এই ক'টা নমস্কারী,—দুই ননদের ননদপুঁটুলি,—ছেলেকে আংটি,—ব্যাস্!

আরে কিছছু না, কিছছু না, কিছছু না।

মেয়েকে যা দেবে, তা দেবে। পাকা দেখা বিয়ের দিনই হবে। আন্না গেলে অনুকূলের মনে হবে, হেঁটে লক্ষ্মী ঘরে এল। শাশুড়িকে ভয় নেই গো! তারে শুধু পান খাইয়ে যেও।

—গোকলো আর নোকলোর বউরা তো বাপের বাড়ি যেতে চায়নে মোটে। বরঞ্চ নোকলোর শাশুড়িই আমার বাড়ি এসে এসে থাকে মাঝে মাঝে। গেলেই দেকবে মা!

ছেলেদের নাম গোকুল, নকুল, তারক, শ্রীবিলাস। যেমন যেমন অক্ষর রাশে উঠেছে, তেমন তেমন নামকরণ।

বড় বউ ভারতী, এখন সোনার মা,—বড় বউমা,—বড় বউদি।

মেজ বউ তুষারকণা, এখন পাখির মা,—মেজ বউমা,—মেজ বউদি।

সেজ বউ? অনুরাধা,—অনুরাধা,—অনুরাধা।

তারক মোটে ঝাল খেতে পারে না,—তার জামা কাপড় ধপধপে চাই,—মশারি সে নিজে টাঙায়,—বিছানা,—ঘর,—সব পরিষ্কার চাই।

আন্না মনে মনে ভাবল, স—ব করে দোব।

আশ্চর্য তো সেও কম হয়নি। বিয়ে না হতেই অনুকূল তাকে নোনতা মিষ্টি খাবার,—নয় তো আমসত্ত কিনে দিয়ে যায়।

সবাই বলল, সোয়ামি দোকানি,—শউর দেকলাম বটে! কপাল করে এইছিল আন্না।

ভেনাতি আর মেনাতি বলল, ম্যা গো! পাড়া গাঁ! না ইলেকট্রির, না কিছু!

মা বলল, সেই ভালো।

মাসি বলল, ওলো! তোদের বরেদের মতন শউরে বর ওর শউর দু'বেলা কিনতে পারে।

মামা যেন আন্নার বিয়ে বলে পাগল হয়ে উঠল। যেমন বরের ধুতি পাঞ্জাবি, তেমন বরের আংটি। যেমন নমস্কারীর শাড়ি, তেমনি ননদপুঁটুলি। সদাসর্বদা পরবে আন্না, রুপোর মোটা বালা, হার আর মাকড়ি।

বর বসবে মামার মনিবের আপিসঘরে। তা'বাদে বরযাত্রীরা? থাকতে চাইলে পাড়ার ক্লাবঘরে থাকবে।

মাসি বলল, খাওয়া খরচ আমার।

মামা বলল, আমার। আপনি দই মিষ্টিটা দিন।

তিনি যদি বিনি দেন্-পাওন্ ছেলের বে' দিতে পারে, আমরাও যতাসাদ্যি খরচ করব। কেউ বলবে নে' ঠিকে ঝি-র মেয়ের বে' হচ্চে।

আর মাসি বলল, সেই তো চলেই যাবে। এলে দেকতে পাব, নচেৎ নয়। ক'টা দিন আমার কাচে রাকি, খাওয়াই, মাকাই।

মা বলল, তোমারই তো মেয়ে,—তোমার, দাদার,—আমি কে যে কতা কইব ?

মাসি বলল, মতির বুক ফাটচে। আম্নারে ও যে ভালবাসে।

আজ গায়ে হলুদ,—তত্ত্ব এসে গেল। মাছ রে, দই রে, মিষ্টি রে,—সব ময় ময় কাণ্ড। আম্নার শাড়িটি ঘোর নীল রঙের কৃত্রিম সিল্‌ক—তাতে রচিত খচিত রোলেক্সের ঝলমল ময়ূর !

রাত ফুরালে বে' ! রাত ফুরালে বে' ! আম্না ঘুমোচ্ছিল অসাড়ে।

সাত সকালে অনুকূল নস্করকে আসতে দেখে মামার মনে কু ডেকেছিল।

—বে'ই মশাই ! আপনি।

অনুকূলের পেছন পেছন বড় ছেলে গোকুল।

অনুকূল আম্নার হাত ধরে কেঁদে উঠেছিল।

সর্বনাশ ! কোন সর্বনাশের খবর হবে। কোন ভীষণ ঝড়ের সংকেত ! মাসি বলল, আমার ঘরে চলুন।

—মা রে ! তোরে আমি মুক দেকাব কি করে ?

—কি হয়েচে ?

—মহাকেলেঙ্কার !

গোকুল বলল, আমি বলচি।

খবরের মতো খবর বটে।

বিয়ের তারিখ এখন পরপর চলছে। গত কাল "দোকানে চা খেয়ে আসি" বলে তারক বেরিয়ে যায়। আর তার দেখা নেই।

কাল···রাত দশটায় সে সদ্য বিবাহিতা বউ নিয়ে গাঁয়ে ঢুকেছে, মনোহর মাইতির বাড়িতে।

মনোহর মাইতি বলেছে, তুমি খেঁটে তুলে মারবে ভয়ে সে বাড়ি আসচে না।

—এ বে' হল কি করে ?

—স—ব মাইতির যোগসাজসে। সে গু-খেগো মাওলা তদ্‌বিরে যায়, আদ্‌লতের চা-দোকানী যুব্‌তি মেয়ে দেইকে তারকের··সে মেয়ে বয়সে অনেক...শউরে আবভাব · ছেলে আমারে...

মতি বলেছিল, আপনারা জানতেন না কিছু ?

—কিছু না বে'ই, ওটোনের ধুলো খেয়ে কিরে কাড়চি। সারাদিন খাটি পিটি, সন্ধেয় মনোসাথানে একবার বসি,—পুজো কমিটির পেসিডেন্ তো ! তা' বাদে ঘরে এসে হাত মুক ধুয়ে ভাত খেয়ে ঘুমোই। এই যে তোড়জোড় হচ্চে, মা'রে, বা বন্দুদেরে, বা বউদিদেরে একবারও বলে নি যে আমার নাক কাটচে।

মতি সগর্জনে বলেছিল, আমাদের মেয়ের কি হবে ?

—তাই বলতেই এইচি গো সজ্জন মশাই ! আহা হা...লক্ষ্মী পিতিমে গো ! ধম্মে পতিত হব ? শুনুন !

অনুকূল নস্কর যেন কোন দৈবাদেশ পেল। বলল, জ্ঞানত কোন অধম্ম করিনি। আপনাদের উপর অধম্ম কল্যে মাদুলায় ডুবে মত্তে হতু। ছোট ছেলে তো নিহাৎ বালক, ষোল বছুরে ছেলে। পোশার সঙ্গে বে' দোব মায়ের।

—আপনার সেই ভাইপো ?

—সাতে এনেছি। চক্যে দেকুন !

ধপধপে রং রোদে জলে তামাটে, সুগঠন, দীর্ঘদেহী। কটা চোখ, কটাশে একমাথা কোঁকড়া চুল।

—ওর দোষগুণের কতা বলিচি সবই। একন এটা আমার দায়। যা পোশা, বাইরে যা গোকলোর সঙ্গে।

—খেয়ালী ! অসংসারী ! বাপ দ্বিতীয় পক্য বে' করে গাঁ ছাড়ল। বোঠান আর পোশা হেতাক্। তা মা যে জমি জমা রক্যা কল্য, আমিই চাষ তুলে দিইচি,—মা মত্তে এ সবই জলে দিয়েচে···বলিচি সব ! কিন্তুক আমার বাড়ি বউভাত হবে·· সব হবে...আমি দেকব মা যেন কণ্ট না পায়। মা বলিচি... ছেলে হব...

গোকুল বলল, আশীর্ব্বাদ করো।

—এনারা বলুক, রাজী কিনা ?

মামা বলল, কি বলব ?

মাসি বলল, বলতে বুক ফেটে যাচে, কিন্তুক এৎ আওজোন কি বেরথা যাবে ?

মা বলল, আন্না।

মা কেঁদে উঠল।

আন্না বলল, কাঁদ কেন ?

—ছেলের চ্যায়রা তো মহাদেব যেমন। কিন্তু বেই, আমার মেয়েরে কণ্ট দেবে নে তো ?

—আমি থাগতে ? না বে'ন ! জমি ওরে ভাগে দিতে পারি, তবে ও হাতে লাঙ্গল ধরবে নে। বাঁদা বন্দক দেবে। মেয়ে দে' অন্য আজ করাব। মা'রে ঘর বসত তো আমি করাব। অন্ন কণ্ট, বস্ত কণ্ট মা'র হবে নে। একন আপনারা যা বলবে...

আন্না এগিয়ে গিয়ে মামার হত ধরল। বলল, মামা ! তুমি হ্যাঁ বলো।

—আন্না রে —— !

—কেঁদো না মামা·· আমি ভাল থাগব। কি করবে বল ? কপালে যা

আচে তাই তো হবে।

—তোর কপালে কেন মা? কেন?

—মামা! সব্যস্য দে' আওজোন করোচো,—একনে কি না বলতে পারো?

অনুকূল আর গোকুল আশ্চর্য হয়ে দেখছিল, ছোট্ট আম্না কেমন করে জগজ্জননী হয়ে উঠছে, সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

মাসি কে'দে ফেলল, অন্য সম্মন্দো তো দেকাই যেত রে! তুই এ কি বলচিস?

—আমাদের ঘরে হয় না মাসি। মামা দু'বার পারে? মামার কতায় ছেলেরা এত কচ্যে, আবার করবে? ইনি বা কি করবে? গতিকে পড়েচে যে কালে? তোমার ব্যগ্যতা করি মাসি...

এখন বিকট, অথচ আন্তরিক বিলাপে অনুকূল ভেঙে পড়ল, এমন মা-রে আমার ঘরে নিতি পাল্লাম না রে গোকলো, নিতি পাল্লাম না।

অরবিন্দ, সুজয় আর মাম্না তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা এগিয়ে এল।

—তবে মতি দাদা!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বর পালটে গেচে। তোরা যা হয় কর।

—দেখুন মশাই! বিয়ে করছেন কে?

—আমার...জ্ঞাত ভাইপো!

—চায়ের দোকানে বসে আছেন যিনি?

—সে।

—চাশশো বিশ নয় তো?

—না বাবা! খ্যায়লী, অসংসারী।

—যা হোক, এ বিয়ে হচ্চে?

—অবিশ্যি, এনারা বললে...

—সাঁঝে আর কেউ আসবেন?

—সবাই তো তোয়ের ছিল।

—তবে আপনি আর বর হেথায় থাকুন। মতি দাদার ঘরে। আমরা দু'জন যাচ্ছি আপনার বড় ছেলের সঙ্গে। ওনাদের নিয়ে আসব। আমি আর মাম্না যাচ্ছি। সুজয়রা ইদিকে সামলে দেবে। দেখুন! নানা জনকে আনবেন না। গরিবের বিয়ে। সুজয় যা! মাছ কম আসবে, খরচাপাতি যতটা কমে। মতিদাদার ভাগনী বলে কথা! উঠুন আপনারা...গা তুলুন—

অনুকূল রক্তাভ চোখ তুলে বলল, মা'রে আশীর্বাদটা করে যাই। সাঁজে কত্তান, একনি করি।

সুমতি মাসি রেকাবিতে ধান দুর্বো, পিদিম এনেছে। কার্পেটের আসনে বসেছে অনুকূল। আম্না সামনে নতমুখে বসল।

একজোড়া রুলি। সরু হলেও সোনার রুলি। আম্না গড় হয়ে প্রণাম করল।

শাঁখ বাজাল অলকার মা।

বিয়ের পর অরবিন্দ বলেছিল, অনুকূল সত্যি ধর্মভীরু লোক বটে। তার নিজের ছেলে বউকে বাড়িতে ঢোকাতে সাহস পায়নি বাড়ির লোক। লোকটা মনোসাথানে পুজো দিয়ে আম্নাকে চেয়েছিল। ওর বড় ছেলেও বলল, বাবার কর্তব্য না করলে মনোসার কোপে পড়ে নির্বংশ হব না আমরা?

কালু ডাক্তার বলল, থাকে, মানুষ থাকে। দেখা যায় না এই যা!

সুজয় বলল, আশ্চর্য মানুষ মাইরি! পশুপতি খুড়োর পায়ে হাত বুলিয়েই যাচ্ছে, আর বুড়ো তাকে উপদেশ দিয়েই যাচ্ছে। দেখার মতো বস্তু বটে!

মামা বলল, ওরা কি খাবে সুজয়?

—তোমার কি হল দাদা? মনে জোর পাচ্ছ না মোটে? ওদের লুচি, তরকারি, মিষ্টি খাইয়ে দিচ্ছি। বিয়ের দিনে ভাত খায় না।

—বরকত্তাকে ভাতই দে'।

—তাই দোব।

—খারাপ হবে না দাদা। ধরো সোনার রুলি তো তিনি না দিলেও পারত, দিল তো?

—শউর ভাল তো নিচ্চয়, তার ঘরে তো যাচ্চে না।

কালু ডাক্তার বলল, সে ছেলের থেকে এ হয়তো ভালই হবে। চেহারা দেখেচ? ঠিক যেন মহাদেব! সে ছেলে তো জোচ্চোর! বাপকে বললেই পারত খুলে মেলে।

মামা বলল, কোন্ সাওসে বলবে? সব তো বাপের! সম্পত্তির আশা নেই তার?

আম্নার বিয়ে এমনভাবেই হয়। কামারপাড়ায় সে যেন ভূমিকম্প একটা। ছেলে নারাজ তো ভাইপো নিয়ে এসে বিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ১৯৭৫ সালে? এ যে গল্পকথা! আবার সোনা দিয়ে আশীর্বাদ?

মাসি বলল, ধম্ম আচে. ধম্ম মরে নি। দেকা যায় নে, মাজে মাজে দেকা দেয়।

বরযাত্রী মাত্র দশজন। অনুকূল বলল, এ বউরে হেনস্তা কল্যে পোশা...

—না গো কাকা, কতা দিচ্চি।

—সোমসারী না হয়েচো তো...

—দেকো, মাতায় করে রাকব।

পাঞ্জাবীটা বেঁটে হয়। ধুতিচাদর পরে বর সভায় বসল তো মেয়েরা

বলাবলি করল, যেন মহাদেব !

গোকলো বিরসবদনে বলল, হ্যাঁ, বংশে পোশা দাদাই সুপুরুষ বটে।

বিদায়কালে মা আর মামা বলল, দুঃখিনীর মেয়ে, ওরে দুক্য দিও না।

পশুপতি মাথা হেলাল।

সকলকে বেশি কাঁদিয়ে, নিজে কম কেঁদে আম্না বিদায় নিল।

সে সব কবে ঘটেছিল, কোন্ আম্নার জীবনে? মাতলা ফেরিঘাটে কে একজন আধবুড়ো লোক অনুকূল নস্করকে বলল, সে দু'বার পোশা নিজে কীত্তি করিছিল। এবারে আপনি যেয়ে মাতা দিলেন?

—কপাল! কপাল তিলোচন! তারক গুয়োটা আমারে পাতকি কল্য।

—তাদের মেয়ে তারা বুজত?

—আমারে দুষো না আর! মা বলিাচ ওরে, আমি দেকব। আর আমার পায়ে পা বাদিয়ে পোশা ক'দিন বাঁচবে?

আম্না এ সব কথা থেকে যেন কিছু বুঝিছল, তার জীবনটা কেমন হবে। ও বিয়ে ভেঙে এ বিয়ে হওয়া থেকেই তো আম্না বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে গেছে সরস্বতীর জীবন কথা শুনে। সরস্বতী সয়েছে, মৌরি সয়েছে, আম্নাকেও সইতে হবে।

গরুর গাড়িতে গ্রামে যাওয়া। সহরে বড় বিষ, তাই মা-মাসি-মামা গ্রাম খুঁজেছিল। বড় বিষ শহরে।

বউকে নামিয়ে মুখ দেখে অনুকূলের বউ কেঁদে উঠেছিল, তারক কি কল্য গো! এ মেয়ে তো...

অনুকূল বলল, কেঁদো না, কেঁদো না, নে' চলো ঘরে।

উলু উলু উলু! শাঁখ শাঁখ শাঁখ! দুধ আলতার পাথরে পা রাখো বউ! মাছ ধরো, ধরতে হয়। ও লো! দুধ উথলেছে তো?

টানা কড়ি বরগা দেয়া নিচু একতলা দালান বাড়ি। অনুকূলের বউ হাতে সোনার মকরমুখো তার জড়ানো লোহা পরাল। কে বলল, ওরে এট্টু জিরোতে দাও।

কালরাত্তির, পাকস্পর্শ, বড় চৌকিতে ফুলশয্যা। হেমন্তের শীতেও আম্না ঘেমে উঠেছিল। পশুপতি "দুত্তোর" বলে লণ্ঠনের সলতে নামিয়ে ঘর আঁধার-প্রায় করল। কাজ চাইতে এসেছিলুম কাকার ঠেঙে, কে জানত এমন শিকে ছিঁড়বে বরাতে? এসো, ইদিকে এসো। লজ্জা কিসের? কেউ আড়ি পাতবে নে'। পোশা নস্কর আগে বে' করেচে,—আর, ওদের বেটা এক শউরে ধিংগি এনেচে ব'লে সব শোগে মচ্চে! আমার কাকা ধম্ম ধম্ম করে...।

দিন পাঁচ ছয় ওখানেই কাটে।

খুড়শাউড়ি বলেছিল, কদিন থাকবে হেতা, কিছু ভাবচো ?

অনুকূল বলেছিল ঘরদোরটা সেরে দোব,—পোশাকেই জন খাটাচ্চি,—আর বসত কত্তে যা লাগে।

মেয়েটার মুক যেমন...

—মীরার মতো, নয় গো ?

—হ্যাঁ...তেমনি নজ্জাভাব···কপাল !

—ওরে রুপোর গয়না দেচে মামা।

—দেকিচি।

—ধুলো পা করাতে সঙ্গে যাব।

—কেন এত বাড়াচ্চ ?

—বড় দুক্যে গোকলোর মা ! পোশা আচে, আচে, আবার নিমেষে...মেয়েটা সব খোয়াবে কেন ?

—বেশ !

ঘাটে গিয়ে গোকুলের বউ বলেছিল, আম্না ! মা বলেচে,—বাবা তোমারে নে' যাবেন ধুলো পা কত্তে।

কাছে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, সোনাদানা সব্যস্য হোতা রেকে এসো। রুপো পরে এসো।

—তোমার দেওর কেড়ে নেবে, দিদি ?

—উনি তো সোমসারী নয় ! খ্যালের মানুষ। আর··· তোমার ঘরদোরও এমন নয়···

—বেশ ! কাকা যা বলবেন !

—তোমার জন্যে আম্না...

—তোমাদের বউ আনতে পারচ না দিদি ?

—না ভাই ! তোমার কতা ভাবলে...সবাই, সবাই মনে দুক্য হয়ে রয়েচে··

আম্নাকে বারবার জগজ্জননী হতে হচ্ছে, সে বরাভয়দাত্রী হল। গভীর সহানুভূতিতে বলল, আমার যা হবার, তা হবে। তরে হেতো না এসে তো জানতাম না তোমাদের সগলার মত মানুষ পিথিবিতে হয় !

—হ্যাঁ...আমার শউরকে সবাই···সত্যযুগের মানুষ বল্যে হয়। আজ মুনিষ মান্দেররে গাল দেবে তো কাল তার কাচে মাপ চাইবে। সেজদেওর ওনারে...কিন্তুক তোমার মা আচে...মামা আচে...

—কি কও দিদি ? তারা কোমরভাঙা দ'পড়া মানুষ ! আর সেতা তো এমন কেউ নি, যে দো'পড়া মেয়েরে বে' করবে !

—নিজের মামা নয় ?

দিদ্‌মার ধন্যছেলে,-- নিজের অধিক।

মামী নি'?

—ওই, বে'র আসরে ট্যাকা নে' বে' ভেঙে যাচ্ছিল, --মামা তারে বে' করে, —কিন্তুক মামা অক্ষ্যামতা, ছেলে হবে নে'—মামী চলে গেচে। এ আমি শুনিচি মাত্তরে! আমরা মামাকে ভয় পাই, কতা তেমন বলি না।

—তিনি খুব ভাল মানুষ।

—হ্যাঁ খুব

---আর · মাসি?

--বাড়িউলি উনি···আমারে ছোটবেলা হতে খুব খুব ভালবাসে। সবই তো জানো দিদি। আমার মা তো দীন দুঃক্যি মানুষ।

—মেয়ে হয়ে জন্ম নিলে আন্না···

—আমার তরে ভেব না দিদি!

ধুলো-পা করতে গিয়ে খুড়শ্বশুরের কথায় আন্না সোনা সব খুলে রেখে আসে মাসির কাছে। হাতে শুধু থাকে সোনা বাঁধানো লোহা।

—বুজলি পোশা! হোতা তোর ঘর দোর তো তেমন নয়...

—তাই সাবদানে রেকে যাচ্চ? বেশ!

--এ নে' মা'রে কিচু বলোচো তো...

—বলিচি, বলব না?

মামা, মাসি, মা, সবাই কত জানতে চেয়েছিল। আন্না ঈষৎ হেসে বলল, এদের ঘরদোর, চালচলন আচারব্যাভার খুব ভাল। আমারে ভালবেসেচে খুব।

—হোতা তো থাগবি না মা?

—তাদের হাতে তো দাওনি?

—জামাই আদর যত্ন করে?

—মামা! ঘর করতে গেলে বুঝব। সেতা তো গিন্নি হতে হবে, নয়?

—সব্যদা ঠাকুরকে ডাগচি।

—ভেবো না মামা।

—চ্যায়রা কান্তি তো মহাদেবের মতো।

—হ্যাঁ মামা!

মামা বুঝল আন্না বড় হয়ে গেছে।

॥ আট ॥

না, পেছনে চাইলে আন্না বোঝে, অনুকূল নস্কর একা কেন, তারা সবাই আন্নার জন্যে যথেষ্ট করেছিল। কেননা, পশুপতিকে তারা জানত।

ঘরদোর পশুপতি, তার থেকেও বয়সে অনেক ছোট রবিকে নিয়ে সেরে নেয়।

চৌকি, বাসনপত্তর, সব দিয়ে যায় অনুকূলের বাড়ি থেকে।

অনুকূলের বউ বলে ফেলেছিল, বাসুন ফগবেনে দিলাম বউ! পোশা সব বেচেবুচে তো দেবেই এগদিন। ক' পরুন্ত কিনতে হয় দেকো।

আর অনুকূল পশুপতিকে মাঠে ঠেলেছিল।

—সদাসব্বদা কাজে রাকব তোরে। দুম করে বেরুলে এবারে পার নি' পোশা। থানায় বলে তোমারে আমি...

পোশা পরম ঔদার্যে বলেছিল, বাপ নি', মা নি', তুমি বেরক্ত হয়ে দেকতে নে—তাতেই ভুল করিচি দুটো। এবারে আমি...

আন্নাকে বলত, তুই আমারে বেঁদে ফেলালি বউ! তোরে আমি দুক্য দোব না।

—তুমি তো সব পারো। অমন কত্তে বা কে!?

—কুসঙ্গ! তায় কাকার বাড়বাড়ন্ত দেকে রিষ!

—হ্যাঁ গো! ওদের ছেলে বউ আসবে নে?

—সে জানে মনা মাইতি। আসবে, তবে বউ নাকি আলাদা থাগতে চায়।

—কোতা?

—ডাইমনহারবারে। শওরে।

প্রথম বছরে পশুপতি বাঁশপাতা, কাঠকুটোর জ্বালানিও এনে বোঝা করেছিল।

অনুকূল বলত, ভালো, ভালো! মা আমার পোশারে বশ করচে। মা তো আর যাও নে?

—সময় পাই না তেমন। আর...ঘরও তো পড়ে থাগবে।

নিকোন উঠান, ঘর, বাগান আবর্জনাহীন, উঠোনে মেলা ধপধপে কাপড়, —লক্ষ্মীশ্রী, লক্ষ্মীশ্রী!

পঞ্চমী যখন ছ' মাস পেটে,—মামা নিয়ে গিয়েছিল।

ফুটফুটে মেয়ে হয়...গলায় একটা লাল তিল,...মাসি বলল, দুগগা পক্যে পঞ্চমীতে জম্মো,—নাম থাগ পঞ্চমী।

তিন মাসের মেয়ে নিয়ে ফিরেছিল আন্না। "ছেলে নয় মেয়ে!" এ কথা

পাঁচজন বললেও পশুপতি বলেনি। বলেছিল, আমার চ্যায়রা দেকোচো? পিত্তিমুকি কন্যে সুকী। পরেরবার পুত্ত লাব হতেই হবে।

তা তো হয়নি।

পনের পুরতে পঞ্চমী, সতেরো পুরতে সপ্তমী।

সপ্তমীর পর পশুপতি হাত দেখিয়েছিল কোথার যেন। আম্নাকে বলেছিল, পর পর মেয়ে বিয়োস নি' পঞ্চমীর মা! পোশা নম্কর ভালো তো ভালো... মন্দ তো পিচেশ!

সপ্তমী হবার কালে কলকাতা যেতে পারেনি আম্না। এক তো মামার মনিব বর্ধমানে চলে যায়, মামাকেও নিয়ে যায়। বর্ধমান থেকেও মামা মাঝে সাঝে আসত কলকাতা। সপ্তমী হবার কালে মা এসে থাকল ক'দিন। বলল, অ্যানেক দিন থাকবার কপাল তো করে আসিনি মা! কাজ যেতা যেতা করি, সেতা সেতা মালার মা ঠেকো দিচ্চে। যাক। আঁতুড়টা তুলে দে' যাব।

—আসবেই বা কেন, মা? সগলের কি মা থাকে, না এত করে? দেকচো তো ও ধাড়ি থে' খবর নিচ্চে, দুদ পাটাচ্চে, সাবু পাটাচ্চে।

—অত আসে নে' আর?

—তাদের সেই ছেলে বউ নে' ঘোর অশান্তি। ছেলে নাকি বাপকে বলেচে, বিশ হাজার টাকা দাও, নইলে মাওলায় ফাঁসাবো।

—সি কি সব্যনাশ গো!

—খুব নাটাঝামটা হচ্ছে ওরা।

—জামাই ঘরে থাগচে নে' কেন?

—পরের পর মেয়ে হচ্চে বলে ক'দিন যেয়ে মনোসাতলায় থাগচে।

—তোরে···

—না...মারধর করে নে...ওই তো ভাবের পাগল! মেয়ে দেকে বলল, সপ্তমী নাম দিলাম তোর...রবি রইল ঘরে। যা বলবি ওরে বলিস। আমি চললুম মনোসাতল। কোন লোক বাণ মারচে বোদয়। নইলে পর পর মেয়ে বা জন্মাবে কেন?

মেয়েদের ওপর বীতরাগ ভাবটা কিন্তু সাগরমেলা ঘুরে এসে কেটে গেল পশুপতির।

মোটেমাটে মাসে বিশ দিন কাজ করে। গাঁয়ে না হোক পারঘাটে। কারা ঝিনুক গুঁড়োয়, সে ঝিনুক নিয়ে ক্যানিং যায় বেচতে চুনভাটিতে। চাল আনে, মাছ আনে,—বলে, মেয়ের মর্ম বুঝিনি আগে বউ!

—সাগর মেলা যেয়ে বুজলে?

—সাদু সন্নিসির মহাকাণ্ড তো! বসে কতা শুনলিও জ্ঞান হয়।

—হলেই ভাল। তা কলসিটা কি বল্যো?

—বেচে দিয়েচি। তেমন মেটে কলসি এনে দিইচি। দিই নি ?

—কাকার হোতা যাও নি আর ?

—কে যাবে ? একখানা টিন বেচেচি বলে গোকলো আমারে মুক করবে, আমি যাব তা বাদেও ? কেন ? পয়সা কি একা ওর বাপের আচে ?

—তিনি তোমার এত কল্য...

—ট্যাকা থাগলে পারঘাটে দোকান দিতু।

—কিসের দোকান ?

—বিস্কুট, ল্যাবেঞ্চুস, মনোহারি জিনিস, নানানিদি...

দশমী হল আপ্‌নার একুশ বছরে। আর তদ্দিনে পঞ্চমীর ছয়, সপ্তমীর চার। মেয়েদের আঁচলে বেঁধে ঘোরে আপ্‌না। এমন সুন্দরী মেয়েরা, গোকুলের বউ অবরে সবরে দেকা হলে বলে,—ও লো! সামলে রাকিস। সোন্দরী মেয়ে কে কোতা চুরি করে নেবে।

—সব্যদা সাতে রাকি।

—শুনি কাজও করে ঘরে ?

—হ্যাঁ দিদি...উটোন ঝেঁটোবে, শাগ বেচে দেবে,—বাপ এলে তো মেয়েরা হাতে চাঁদ পায়।

—সেই আশ্চাজ্য মেনিচি। পোশা ঠাকুরপো মেয়েদের নে, খুব সোয়াগ করে।

—খু—ব!

—মেয়ে দেকে রাগ নে' আর ?

—না। রাগ ঝাল কমেচে।

—ভাল হয়ে যাচ্চে বোদ হয়। টানা সাত বচর গেরামে, এই তো আশ্চাজ্য কতা!

—যা করেচে...মরমে মরে আচি দিদি!

—তুই কি করবি বল ? বলে টিন বেচে বউরে টাকা দিইচি।

—সপ্তমীর মাতায় হাত দিদি! ট্যাকা আজও দেয় নে'। ককনো চাল এনে ফলল, ককনো ডাল মশলা এনে দিল,—বড় জোর তেল নুনের পয়সা। কিনতে কনে সাবান। সে ময়লা পত্তে পারেনে বলে।

দশমীর বয়স তিন। পঞ্চমীর দশ। সপ্তমীর আট!

পশুপতি মেয়েদের নতুন জামা প্যান্ট গায়ের চাদর কিনে আনল। বলল, দেরকে গঙ্গাসাগরে মেলা দেইকে আনি গে।

—সে কি গো ? সেই ভিড়ের মদ্যে ?

—বচর বচর যাচ্চি, সাদুদের তাঁবুতে থাগব। কোন কণ্ট হবে নে।

—বড্ড শীত যে!

—সেতা ধ্বনি জ্বলে। কম্বল দেয় ওরা। দেকার জিনিস বটে!

—ভিড়ে ছটকে গেলে ?

—রবি গ্যুয়োটা তো যাচ্চে সঙ্গে। আমি তো একা নয়। গাঁ হতে এগটা দলই যাবে।

—আমারে নে' চলো।

—দ্যূর! দশ্যুমিটা একনো গে'দি।

—ঠাণ্ডা লাগবে ওদের!

—আমি থাগতে ? তুলোর জামা কিনে নোব।

—ট্যাকা কোতা ?

—আচে আচে!

আম্নার হাতে বিশ টাকা গ'্যুজে দেয় পশ্যুপতি। বলে। ওজগার কচ্যি, আর ন্যূক্যে রাকচি,—চাল ডাল কিনে দে' গেলাম,—যেতে আসতে চাদ্দিন।

তেল মাখিয়ে ম্যুখ ম্যুছিয়ে, চ্যুল বেঁধে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল মেয়েদের।

—বাবার হাত ধরে থাগবি মা! কোতাও যাবি নি। রবিকাকা আর বাবার মধ্যিখানে থাগবি। কেউ দিলে খাবি নি. কেউ ডাকলে যাবি নি। খ্যুব সাবদান পঞ্চ্যুমী!

—হ্যাঁ মা!

মেয়েরা নেচে নেচে চলে গিয়েছিল। বাপ সপ্তমীকে কাঁধে বসিয়ে পঞ্চমীর হাত ধরে ষষ্ঠীতলার মোড় ঘ্যুরতেই চোখের অদেখা।

এ বাড়ি—ও বাড়ি—সে বাড়ি,—গাঁ থেকে তেরো চোদ্দজনই যায়।

সবাই ফিরল, ওরা ফেরে না।

আম্নার ব্যুকে সাগরের ঢেউ, আম্নার ব্যুকে হাতুড়ির ঘা, আম্না ঘরবার করে।

তারপর মনোসাতলা থেকে অনেক, অনেক লোক ওদের ঘরে এসেছিল।

পশ্যুপতির গলায়—'পঞ্চ্যুমী রে! সপ্তুমী রে!' শ্যুনেই আম্না ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সে চিল-চিৎকারে বলে, তারা কোতা?

—আমারে জ্যুতো মার বউ,—আমারে নাতি মার,—ভিড়ে হাত ছট্‌কে... সেই হতে খ্যুঁজে খ্যুঁজে...

—নাইতে নেমিছিলে ?

—তাতেই তো হাত ছটকে...মা রে আমার। ই কি সব্যনাশ হল ?

—কোতা রেকে এলে তাদের ?

পোশার হাহাকার কান্না, কপাল ঠোকা, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া কিছ্যু চোখে পড়ে না আম্নার।

—সাগরে দে' এলে তাদেরে, সাগরে? তুমি মল্যে না কেন?

—ভেসে যেতু বউ…এমন এট্টা ঢেউ এল !

আম্না ঢলে পড়ল, অজ্ঞান,—দশমীকে বুকে জাপটে ভেঙে পড়ল। অনুকূলের বড় ছেলে বলল, এরে ঘরে নাও তোমরা।

অনুকূলের বউ বলল, মা মনোসার কোপ, নইলে…

ক' বচরে সাগরে ক'টা করে জান নেয় তো !

অনুকূল সদুঃখে বলল, ওদেরি নিতে হল ? সোনার পুতুলি মেয়ে… নির্দোষী শিশু…পোশার হাড় মাস আল্‌দা কল্যে আমার রাগ যাবে নে। কোন কত্তব্য করে না,—মেয়েদেরে নে' সাগরমেলা দেকতে গেচে…

না, আম্না ঘর ছেড়ে অনুকূলের বাড়ি যায়নি,—কলকাতাও যায়নি।

—যদি তাদেরে ফিরিয়ে আনে কেউ ? আমারে না দেকলে তারা তো…

লণ্ঠন নিয়ে বারান্দায় বসে থাকত, ঘরবার করত।

অনুকূল বলল, থানায় বলেচি…সর্বত্তরে বলেচি…সাগরের ঢেউরে মা…

আম্না মনে মনে শুনত, কোন মাঝি মাল্লা যদি ওদের তুলে নে বাঁচায়।

ডুবে যাবে ? সাঁতার জানত, ডুবে যাবে ?

কাঁদতে কাঁদতে পশুপতি বলত, সেতা সাঁতার জেনে লাব ? নানাখানা সোঁত বইচে, চা'দ্দিকে টেনে নিচ্চে…

—রইল একা দশমী ! এ বাদে যদি কোন দিন সাগরের নাম করোচো তো…

—ও কাজ আর করি ?

—মন কেন বলে তারা আচে ?

—বেভ্রম বউ !

—স—ব বেভ্রম !

—ভাত চাপাবি নি ?

—ওই মুড়িতে জল ঢেলে খাওগে ! আমার আর হাত পা ওটেনে। হেতা মাতার ফিতে ঝুলচে, —হোতা খ্যাঁল্লাপাতি…সপ্তমী আমার এই ঘটিতে জল নে' আসবে, পি'ড়ি পাতবে, বলবে ভাত দে মা !

সম্ভবত মনের দহনে, কিংবা অন্য কোন কারণে পশুপতি সংসারের হাল ছেড়ে দিল ক্রমে ক্রমে।

এখন আম্নার গলা বেরিয়েছে। সে বলল, কাজে মোটে যাচ্চ না যে ?

—মন ওটেনে বউ।

—ভাত আসবে কোথেকে ?

—ভাবতে পারি না।

—তবে কি আমি ভাবব ?

—ভেনভেন কল্যে আমি যেতা দু'চোখ যায়...

—তাই যাও। তবে চাল আনবে, তো ভাত পাবে।

—তুই কি খাবি ?

—জুটলে খাব, নইলে মরব।

—তাই মর। আমার হাড় জুড়োয়। বল্লাম, হারটা এনে দে, বেচে দোকান দিই।

—তুমি দেবে দোকান ?

—ওগুনো আনবি নাই বা কেন ?

—ও আমার মেয়ের জন্যে, বুজোচো ?

—বটে ! সোয়ামির চে' মেয়ে বড় ?

—আমার কাচে।

চড় চাপড়টা সয়ে গিয়েছিল। আজ পশুপতি মেরেধরে আম্না রুপোর বালা জোড়া কেড়ে নিয়ে চলে যায়। দশমীকে আগলাতে গিয়েই আম্না বেশি মারটা খায়।

সেই যে বেরোয় পশুপতি, আর তার দেখা নেই। এর তিন দিনের মাথাতেই আম্না অনুকূলের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। না, জ্ঞাতি ভাইপো'র বউ হিসাবে নয়, যে কোন দুঃস্থ মেয়ের মতো।

অনুকূল বলল, ওটোনে কেন মা ?

ঘোমটার আড়াল থেকে আম্না বলল, ঘরে নি'। কবে আসবে জানি নি। কাজ করে খাব।

—পারবে কেন মা ?

অনুকূলের বউ বলল, পাত্তেই হবে। নিদোম মেরে ধরে পোশা হাতের বালা কেড়ে নে' চলে গেচে। কচি মে নে' কি করবে ?

—হ্যাঁ...আমিও ঘরের মাওলায় ফেঁসে আচি। পোশার ঘরও একটেরে। সদাসব্যদা কি হয় জানতে পারি নি'। কাজ বলতে...

—যা বলবেন ! গইলের কাজ, ঘরের কাজ, ধানকটারির কাজ...

—পারবি গো মা ?

—খুব পারব।

—কাল হতে এসো। আর...ওদের খাইয়ে দাও গোকলোর মা।

আম্না উঠোনের মাটি খুঁড়ল বুড়ো আঙুল দিয়ে। তারপর ভেতর বাড়ি গেল। কতকগুলো নারকোল পাড়া ছিল, সেগুলো ছাড়িয়ে দিল। বালতি ক'টা মেজে দিল। স্নানের সময়ে এক বালতি খারও কাচল।

অনুকূলের বউ বলল, কেন করচো মা ?

—কল্লাম বা ! এ কি কোন কাজ ?

খেয়ে দেয়ে দশমীকে কোলে নিয়ে ঘরে গেল। ঠিক যে কোনও শরণাগতের মতো।

গোকুলের বউ বলল, চেহারা কি হয়েছে মা?

—পোশার হাতে পড়েচে না?

—কি ঝকঝকে করে বালতি মাজল।

—কাজ করে খেতে হবে নে' ওকে?

—এ মেয়েও রূপসী!

—খায় না, মাখে না, এত রূপ! তা পোশারও তো চ্যায়রাকান্তি ভালো...

—কলকাতা যায় নে' মোটে?

—কার কাচে যাবে বাছা? মা খাটে পর ঘরে। মাসি তো বাড়িউলি, নিজের মত আচে,—আর মামা চলে গেচে...জ্ঞাত হলেও আপনগুষ্টি। হেতা কাজ করবে...

অনুকূল বলল, আর পাঁচজনার মতই করবে। পোশা তো মুতে হেগে চলে গেল যারে বলে।

—এত কল্যে, তবু দুক্য ঘুচল না মেয়েটার?

—কপাল! কপাল যারে বলে।

ওই যা একদিন। তারপর আন্না কোন জ্ঞাত বউয়ের মত এ বাড়ি ঢোকে নি।

কাজের লোকের মতো এসেছে, গিয়েছে। গোকুলের বউ, নকুলের বউ জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছে ওদের পরা কাপড়, মেয়েদের জামা। আন্না নিয়েছে।

মাসি দেখলে মূর্ছা যেত।

পশুপতি কদিন বাদেই ফিরল।

—তুই হোতা কাজে লেগেচিস?

—সোয়ামির যুগ্যি কতা বটে!

—অবিশ্যি তকনে "মা মা" কত্ত, এটুকু করা কাকার কত্তব্য।

—আমার কত্তব্য কাজ করা, ওনার কত্তব্য কাজ দেয়া, তোমার কোন কত্তব্য নি'?

—দেক না কেন, চাল এনিচি...এট্টা কুমড়ো। বেশ করে রাঁদ্ দিকি।

—নারকোলগুলো পেড়ে নে' হাটে বেচে এসো।

—দূর! ও সব আমার কম্ম নয়। টেরেনে গান গাওয়া বেশ কাজ বউ!

আন্না জবাব দিল না।

—সোয়ামি এয়েচে বলে কাচে বসতে পারিস নি?

—দশমি একনো ছোট।

দশমি দু' বছরের, আন্না আবার পোয়াতি হল। পশুপতি ঘরে থাকে, না। ঘরের চালে জল পড়ে,—দাওয়া গলে যায়। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক, চটের বস্তা মাথায় দিয়ে আন্না কাজে যায়। মনে মনে বলে, পেটে আসে বা কেন? কি খাওয়াব কি পরাব, আর কত পারি!

চতুর্থ পর্বে আন্না বেটার মা।

ছেলে দেখে পশুপতি বলল, মেয়েগুনো তো দিব্বি বিয়োস। ছেলে তো দেকচি আঁতুড়েই যাবে।

দাই বলল, ধন্যি বেটাছেলে বলতে হবে। ঘরে ছিলে না ক'দ্দিন? বউ তো উঠোন থে' ঘরে উটতে পারে নি! এই অসাগর খাডনি, সময়ে খাওয়া নি' কিছু নি'?

ছেলে হল তো আন্না গোপালের মা। কিন্তু এ গোপাল থাকতে আসে নি। হাত পা ছিনে পড়া, কাঁদতে গেলে চোখ উলটে যেত।

এক বছর না পুরতে গোপাল চোখ উলটে মরে যায়। আন্না অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে বসে থাকল।

মনোসাথান থেকে পশুপতিকে ধরে আনল সবাই। পশুপতির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে আন্না দশমীকে নিয়ে দাওয়ায় বসে ছিল।

আজ বসল, রাত কাটল, সকাল হল। আন্নার দু'চোখ খোলা,—সামনে পা বিছানো। কোলে দশমী ঘুমোচ্ছে।

পশুপতি বলল, বউ?

আন্না নিরুত্তর।

—চ্যান করিবি নি? কাজে যাবি নি?

আন্না মাথা নাড়ল।

—ধর...সে থাগতে আসে নি।

—পঞ্চমী...সপ্তমী...গোপাল...এট্টা কাজ করবে?

—কি বকছিস?

—ওদের খেওচো...দশমীকেও খাও, আর আমার মাতায় কোপ দে' যেতা ইচ্ছে সেতা যাও।

—আমি...কোনদিন...ওদের গায়ে হাত তুলিচি?

—না। আমারে মেরোচো। তা বালা...হার...কানের দুটো...রুপোর যা ছিল, সগলি তো খেয়েচো। আর তো কিছু নি'। দশমীরে খাও।

গোকুলদের পাটকরুনী বাসিনী খবর নিতে এসে এ দৃশ্য দেখে। বলে, যাও দিকি পোশা! যেতা হতে পারো কিছু নে' এসো। বড় বউয়ে বলো গে'।

আম্না বলল, ও সগলারে খেয়েচে, দশমীরেও খাক্। আর আমারে

সব মনে আছে আম্নার।

গোকুলরা এসে পড়েছিল। অনুকূল বলেছিল, গাচে বেঁদে মার্ ওকে। ঘরে একদানা চাল নি', কিচু নি',...বাসিনী থাগ্ হেতা ঘরে নে' বউমারে।

—ঘরের আবস্থা দেকোচো?

—চল্ ওরে আর মেয়েরে নে...পোশারে দশঘর পঞ্চেৎ করাই। বাঁশ রয়েচে, পোয়াল চাইলে নিতি পারে...গতর রয়েচে...ও মরচে বউমার সোনা-গুনো নেবার জন্যি..

আম্না বলল ফিসফিস ক'রে, হেতোই থাকি। বারবার কৎবার কাঁদে চাপব?

এ সময়টি তবু সুসময় সূচনা করল! চাল ডাল এনে রেঁধেবেড়ে বাসিনী খাওয়াল আম্নাকে।

পশুপতি ঘর মেরামতে হাত দিল। বলল, তুই আর বেরুস নি'। আমি যা পারব করব।

পঞ্চেত থেকেই মাসে দশ পনের দিন কাজ। এ সময়েই রবি আম্নার বড় অনুগত হয়ে যায়। বলে, কি লাগে? সব আমি বেবোস্তো করে দিচ্চি বৌঠান, —হেতায় তুমি মুড়ি ভাজো দিকি? আমি নে যাব মুকুন্দর হোতা। তিনি মুড়ির কারবারি,—চাল দেবে,—তুমি ভেজে দেবে।

রবি দশমীকে বড় ভালবাসত।

ছেলে মরার তিন বছর বাদে আম্নার হল যমজ মেয়ে। দেখে পশুপতির আল্লাদ কি। রূপ দেকেচো? রূপ দেকেচো?

সবাই বলল, পশুপতির মদ্যে দেবভাব এসে যাচ্চে। ধর্ম্যপতে থাগলে যা হয়! সর্বত্তর দেক মেয়েবিয়োনী বউকে খ্যাদাচ্চে। হেতা দেক সগ্যরাজ্য! পোশা জোড়া মেয়ে দেকে আনন্দ কচ্যে। সবারে বাসাতা বিলোচ্চে। আবার বো'য়ের জন্যে সাবু, দুদ উটনো করেচে। পোশা একনে ভাল মানুষ।

মাইতি বলল, হত্তেই হবে। পোশার দেহে দেবভাব ভর করেচে।

অনুকূলরাও নিশ্চিন্ত।

এতকাল বাদে রতন ঘরে ফিরেছে। সেই বউও নিমু হয়েছে এখন। সংসার, কাজকর্ম, অনেক বেড়েছে। একদা আম্নার বিষয়ে যে মমতা ছিল, তা চাপা পড়েছে। পোশাও যখন তখন পেন্নাম করে যায়। এমন কি, এ কথাও বলছে, পাল্যে কিচু জমি নোব। এই তো ভাল। নস্করর‍া ভাল থাকলে অনুকূলের শান্তি।

পঞ্চমীর জন্ম, আম্নার বয়স পনেরো। সপ্তমীর জন্ম, আম্নার বয়স

সতেরো। দশমীর জম্ম, আম্নার বয়স একুশ। গোপালের জম্ম, আম্নার বয়স তেইশ। যমজ মেয়ের জম্ম, আম্নার বয়স ছাব্বিশ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জম্ম,—আম্না বলল, অপোরেশান কইরে যাই।

পোশা বলল, না বউ। ওটা অধম্য। ভাবিস নি, আর তোরে জ্বালাব না। নিত্যি মনোসাথানে যাচ্চি, মনের ভাব অন্য রকম। তা, এদের নাম কি দোব, --একাদশী দোয়াদশী?

আম্না বলল, না। উলি আর ঝুলি।

—সি কি?

—নামের বাহারে দরকার নি'। সেই তো ধান ভানাবে, মুড়ি ভাজবে, লাথি খাবে,--নাম দে' কি হবে?

—রবি তোর খুব ন্যাওটো হয়েচে।

—তা হয়েচে। ওর তো কেউ নি'। আর সোমসারে কৎ কাজ কচ্চে দেক না? ঝাড়ের বাঁশ বেচে আসচে, নারকোল বেচে আসচে, জ্বালানি গুইড়ে দেয়, জল আনে, সোমসারে ছিরি এসেচে।

—তা বটে! আমার সেথো তো!

নিজেও পতে থাকো...ওরেও রাকো। উলি আর ঝুলির মুক দেক! যেমন পঞ্চমী আর সপ্তমী। আজ থাগলে এর বয়স এগারো, ওর বয়স নয় হতু।

—তা হতু!

—দেক! এবারে এট্টু জমি দেক।

—বলিচি কাকারে।

চোখ বুজে আম্না বলল, আগে যদি সোমসারী হও, এত কষ্ট হয় নে। সোনায় লোভ কোর না। তিনটে মেয়ে পার কত্তে...

—না বউ! নোবে পাপ, পাপে মিত্যু।

এসব কথাও পশুপতি তাৎক্ষণিক আন্তরিকতায় বলে। আম্না বলে, শওর তো নয়...আমার মা কাজ করে করে...

—এবার চুপ কর্।

—তোমাদের কষ্ট হচ্চে?

—রবি থাকতে কষ্ট? দশমীকে খ্যাল্লা দে' পাশে বইসে রান্না করে।

—ওরে ছাড়ব না।

—না না, তাই ছাড়ি?

বয়সে আম্নার চেয়ে কিছু বড়, কিন্তু রবি যেন আম্নার ছেলের সমান হয়ে সেবা করত। তার স্বভাব মেয়েলী, গলার স্বর মেয়েলী, দেহও যেন তেমন

বাড়বাড়ন্ত নয়।

আম্না ঘরে ফিরতে মাছ, কাঁকড়া, গুগলি ধরে এনে দিত। বলত, দেহে অক্ত হবে গো!

এই শাকপাতা-থোড়-থানকুনিপাতা-মোচা আনছে,—গভীর উৎসাহে উঠোনে লঙ্কা, ডাঁটা, লাউ, কুমড়োর বাগান করছে। এই তুলসী বেদী বসিয়ে তুলসী চারা লাগাচ্ছে। সিজ মনসার ডাল বসিয়ে সেখানে ঘট রাখছে।

গোকুলের বউ একদিন দেখতে এল।

—আশ্চাজ্জ করল রবি! তোর সোমসারে ছিরি কত ফিরেছে।

—আশীব্বাদ করো দিদি! ভাই বললে হয়, ছেলে বললে হয়।

—আশীব্বাদই করি। আম্না অনেক দুক্ক্য পেয়েচে. মা মনোসা সুকে রাকুক।

দশমীর যখন হঠাৎ করে ম্যালেরিয়া ধরে, রবিই তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দোড়েছিল।

সে বছরে সমগ্র তল্লাটে সেই ভুতুড়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জায়গা নেই,—যে পারছে ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছে, নয়তো কলকাতায় নীলরতনে।

ঘাড় টেলে গিয়ে রক্তবমি করে দশমী চলে যায়।

আম্না সেদিন মনসাতলায় মাথা কুটে দেবীকে শাপশাপান্ত করেছিল।

—এট্টা দেবে, দুটো নেবে,—দুটো দেবে, এট্টা নেবে,—কেমন বিচের কচ্য মা! পঞ্চুমী, সপ্তুমী, গোপাল, দশুমী, সগল নাম তুলে নিলে? আমার দশুমী বিসজ্যন হয়ে গেল, আমি ঘরে ঢুকব কোন্ পরাণে গো!

ঘরে এসেও আছাড়ি পিছাড়ি, তা' বাদে অজ্ঞান অজ্ঞান।

জ্ঞান হয় উলি ঝুলির "মা! মা!" ডাক শুনে।

পশুপতি বলে. সাত, না আট বচর থেগে মায়া কাড়িয়ে দশুমী...।

রবিই কলকাতা যেয়ে আম্নার মা-কে ধরে আনে। মাকে দেকে আম্না অবাক!

—এত নিণ্টুরতা হতে পাল্যে? মাজে সাজে আসলে...যদি কলকেতা নিতে পাত্তাম,—দশুমী থাগত!

মা মেয়েকে ধরে অনেক কাঁদল। মাসি ফল, হর্লিক্স. মিষ্টি, উলি ঝুলির জামা, আম্নার কাপড়, অনেক পাঠিয়েছে।

—হর্ল্যিক আমার বাচারা কেউ দেকেনি, আমি কোন্ মুকে খাব?

রবি বলল, উলি ঝুলি খাবে।

ক'দিন বাদে মা বলল, কলকেতা যাবি মা? ঘুরে ঘেরে আসবি?

—না মা! বে' হয়ে ঢুকিচি, মাচায় চেপে বেরুব।

—জামাই তো একনে খুব···

—হ্যাঁ মা! সরে গেলে যদি বোরেগী হয়ে যায়?

—রবি তোর পেটের ছেলেই ছিল…

—সব করবে। সোমসারে আমার একনে যেমন সুক,—তেমন আগে যদি হতু…

রবি বলল, অ্যানেক পাপ করেচি গো মাসি…পাচিত্তির কচ্চি একনে। তোমার মেয়ে দেবতা গো!

—হ্যাঁ মা! সব্যদা এক কতা বলে।

—খুড়শউরেরা?

—তারা অনেক টেনেচে। আর পারে? তারাই তো কাজ দে' বাঁইচে রেকেচে অনেক কাল।

—রবি রান্নাও করে?

—স—ব কত্তে যায়।

—যাগ, এ দেকেও শান্তি পেলাম রে মা! তুই মামা পেইছিলি, এরাও মামা পেয়েচে। জামাইও তো সুমতি দেকচি।

—আশীব্বাদ করো।

—সব্যদা কচ্চি।

যাবার কালে রবিকে দশটি টাকা, আন্নার হাতে লুকিয়ে একশো টাকা দিয়ে যায় মা। আন্না বলে, সোনা দানা সুমলে রেকো!

—তাই রেকেচে তোর মাসি।

—মাসিরে পেন্নাম দিও মা, মামারেও!

—দোব মা!

মা চলে গেলে আন্না বলে, কিসের পাচিত্তির কচ্চিস রবি?

—জেবনে কত অন্যাই করিচি…

—আমার সেবা কল্যে পাচিত্তির হবে?

—খুব হবে। আর কার সেবা কব্য? হেতা কে আমারে মানুষ বলে পোঁচে?

—তা বটে।

—উলি ঝুলি খানিগ বড় হচ্চে। ওদেরে কলকেতা রেকে পড়াপোরোত না?

—মার বয়স হয়েচে…মাসিও আপন নয়…মামা আচে বধ্যমানে…আমি বা ওদের ছেড়ে…

রবি হঠাৎ বলল, ওদের নে' সেতা থেগে ঝি খাটতেও পারো!

—কি বললি রে রবি? পশুপতি একবোঝা নারকোলের ডেগো ফেলে দিয়ে বলল।

—না · কলকেতা যেয়ে সবাই থাগলে···

পশুপতি কান দিল না। বলল, পাতা চাঁচলে জ্বালানী, ঝাঁটার কাটি বেচা যাবে।

—মা চলে গেল।

—হোই খলিপুর যে' আসতে পারি? নে' কুড়িটা ট্যাকা রাক বউ। কিচু না হলেও হাজার না জমলে তো ভাগে জমি নিতে পারব না। পাঁচ হাজার ফেলতে পাল্যে মাইতিই জমি দেবে···সে তো পারব না, দেকি!

এ ভাবে দু' বছর আরোই যায়। আন্নার জীবনের সুসময় এটি। স্বামী খাটছে, সে খাটছে, রবি খাটছে. খাটলেই অন্ন।

রবির এটাও জেদ ছিল। টুকটাক খেটে পয়সা সে আন্নাকেই দিত।

আন্না বলত, তুইও সোমসারী হ'!

—না দিদি! সে পরজন্মে হবে। নাও, ক'টা চেঙো মাচ পেলাম, বেশ ঝাল দে'··

কিন্তু এক ঝড়ে সব উড়ে গেল।

॥ নয় ॥

আষাঢে জল, শ্রাবণে জল, ভাদ্রে জল ঢেলে আকাশ ক্ষান্ত দিয়েছিল, পশুপতি ঘরে নেই, গোকুলহাটে আটকে আছে,—এমন কালে মনসার নিষ্ঠ সেবক রবিকে কাটল কালাজ সাপ।

ভোর রাতে আন্না কোথা যায়, কাকে ডাকে?

রবি বলল, কোতা যাচ্চ?

—বাসিনীর ছেলেরে ডাকি? ই কি সব্যনাশ!

—কোতা যেও না, হেতা এসো। পরে জিব এড়ে যাবে দিদি!

—না রবি! আমি যাব আর আসব। মুশুরি না টাইনে শোয় কেউ? ই কি কল্যে?

—টাইন নি' দিদি! শোন···

—এট্টু আলো হোক, আমি যেয়ে...

—শোনো! পাচিত্তির কাচ্যলাম...করে যাই.. পঞ্চমী...আর... সপ্তমী...

আন্না শুনে পাথর।

—এদের সাত পুরে গেল···সাগরে নেয় নি...বেচে...দেচে...

—রবি...তুই?

—পাপ...পাপের ভরা...তকনে ও যা বলতু...ওদেরে বাঁচাও...

রাত ফরসা হতে আন্না মেয়েদের ছিঁচকে তোলে...মাটি খুঁড়ে কৌটা হতে

টাকা নেয়,—তারপরে পথে নেমেছিল। যাবার কালে বাসিনীর দোরে ঘা দিয়ে বলেছিল, রবিরে কালাচ কেটেচে গো! বদনরে বলো—!

ওরা শুনল কি না তা দেখতে দাঁড়ায় নি।

তারপর কলকাতা। তারপর ফিরে আসা। ঘরে ফিরে পশুপতির মাথা লক্ষ্য করে ভারি পিঁড়ি সজোরে নামিয়ে আনা।

বাবা গো! মা গো! বলে পশুপতি ছুটেছিল। আন্না পিঁড়িটা এবারে ছুঁড়ে মারে পায়ে।

লেংচাতে লেংচাতে পশুপতি পালায়, আছাড় খায়, আবার পালায়।

হেঁতালপাড়া কেন, দশটা গ্রাম সরগরম। সকলের চোখের ওপর দিয়ে আন্না গিয়ে গরুর গাড়িতে উঠেছিল।

না, সে আত্মসমর্থনের কথাই ভাবে নি। বারবার বলেছে, মাতায় মাত্তে গিইছিলাম, ফসকে যেয়ে কাঁদে লাগবে জানব কি করে?

খুব, খুব বিভ্রান্ত হেঁতালপাড়া।

যখন পোশা নরাধম ছিল, তখন ঘর করল। যখন সংসার সেজে উঠছে, তখন মারল?

সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড।

সাত বছর, রেমিশান হয়ে সাড়ে পাঁচ বছর হয়! মা কিছুদিন আসে না কিন্তু সে তো জেনেছে এ খবর?

খালাস পেয়ে শুধু মামাকে দেখে আন্নার মনে "কু" ডাকে।

—মামা...মা?

—চল্ মা!

—মা'র কি হয়েচে?

—সব্যনাশ হয়েচে, তুই চল্।

—আমার মা—নি?

—কতা কোস নি' আন্না—আমার পেসার অ্যানেক বেড়ে যাবে—সবে হাস-পাতাল থে' বেইরেচি। চল্, ট্যাস্কিতে উটি।

—মামা! উলি ঝুলি?

—ঘরে চল্ আন্না!

মা মাটিতে পড়ে ছিল—মাসি বিছানায় শুয়ে ছিল। আন্নাকে দেখে ওরা ফুকরে কেঁদে ওঠে।

—মরে গেচে?

—ওদের···বাপ...নে গেচে···

—সে ওদেরে পেল কি করে ?

—বোস মা ! মামা বলে, বলচি।

কিছুকাল ধরেই আসে যায় ওদের বাপ। সন্নেসী হেন বেশ। পাড়া দিয়ে ঘোরে। চায়ের দোকানে বসে, চা খায়। খুব সাম্য শোভন কথাবার্তা। মা, মামা, মাসি, কেউ বলেনি উলি ঝুলি কোথায়। খবরবার্তা করে খবর বের করে থাকবে।

—ওদের নাগাল পেল কি করে ?

কথা তো চাপা থাকে না। চায়ের দোকানেই জেনে থাকবে ওরা কোন্ বাড়িতে কাজ করে। পাড়ার ছেলেরা যে তাড়িয়ে দেবে, কেন দেবে ?

তারা তো এইটুকুই জানে, যে আন্না তার স্বামীকে মারাত্মক জখম করে জেলে গেছে।

বস্তুত, কেন আন্না অমন সর্বনাশা ক্ষিপ্ত হয়, তা তো মা, মাসি, বা মামাও জানে না,—আন্দাজ করে মাত্র।

—তা' বাদে ?

আন্নার জন্যেই সত্যনারায়ণ পুজো আর সিন্নি ব্যবস্থা করেছিল আন্নার মা। সেই উপলক্ষেই মেয়েদের আনা।

—তা' বাদে ?

এখানে এসে উঠল পশুপতি, বলল, মেয়েদের দেখে চলে যাবে। আন্নার মা আর মাসি বলল, দেখে চলে যাও, বোস না।

—তা' বাদে ?

—মেয়েরা বাপকে চিনিছিল।

—তা' বাদে ?

পশুপতি চলে যায় সকালেই। কেউ তাকে পাডায় দেখেনি। বিকেলে আন্নার মা মেয়েদের কাজের বাড়ি পেঁছিতে যায় মোড় অবধি।

—বাডি অবধি যাউ নি ?

মাসে মাসে আসে যায়...বাড়ও হয়েছে...আর আন্নার মায়ের চোখেও সাঁঝ লাগলে ঝাপসা ঠেকে···আর ওই ফেলাটে কোথা নামগান হচ্ছে, বেজায় ভিড...বেজায় ভিড়···

—তা' বাদে ?

ওদের মনিব গিন্নিরা সকালে সুমতিকে ডেকে বলেছে, মেয়েরা কাজে যায়নি কেন !

—তা' বাদে ?

তা' বাদে ঝড়ঝঞ্জা, বিশৃংখল। মামা তো হেঁতালপাডা ঘুরেও এসেছে গতকাল।

কেউ কিছু বলতে পারে না। পশুপতি থানাথানে বসে আছে। মামার সঙ্গে সেও থানায় ছুটেছিল—ডাইরি করেছে।

—ক'দ্দিন হ'ল ?

—তা' ন'দশ দিন হবে।

মামা বলল, তাদের ফটোক দে' লালবাজারে...আজ ক'দিন ধরে...

—দেকতে খুব সোন্দরী হইছিল ?

—বাড়ন্ত গড়ন সে:জগুজে থাকে···তারাও তো বাবারে চিনিছিল· সন্নেসী যেমন। হেসে হেসে কতা কয়। সগলার সামনে বলল, বাপ হইছি মাত্তর ' মা তোদের সব্যস্য, জানলি ? তোর কত সুনাম কল্য···

· -ন' দিন, না দশ দিন ?

—দশ দিন হল আজগে।

—নম্বা হইছিল ?

মামা বলল, "ছিল", "ছিল" বলতে নি' মা! একনে পুলিশ সব পারে। আজিও যেয়ে এমেলে ধরেচ ··

আম্না বলল, ঘরে যেয়ে শুই এট্টু।

—একন ?

মাসি বলল, কিচু খা' মা!

—খাব ? আবারও খাব ? দাও, খাই।

কে বলবে সে মেয়ে বিকেলে হাওয়া হয়ে যাবে! কেমন কুশলবার্তা নিল সকলের, খাবার খেল, বলল, দুপুরে এট্টু মাচ ঝাল করো।

সব কথাই স্বাভাবিক।- মাসি এট্টু মোটা হয়েচে। ও মা! তনুর বে' হয়ে গেল ? সুমতি মাসির চুলে পাক কেন গো ? মামার দেহগতিই ভেঙেচে খুব। মা এট্টু শুক্যে গেচে। কেলাবের ঘর বড় হয়েচে কবে ? দিদি মেজদি'র খবর পাও.

না. আন্না সেতা বেশি খাটে নি। খুব ভাল ব্যাভার সগলের। সবাই ভালবেসেচে।

ও, উলি ঝুলির বাপ জানে আম্না এখনো দু' মাস জেলে থাকবে ? কেন, সে খবর রাখে নি ? যাক গে, দু'মাস আগে আর পরে!

না মামা, আম্না উতলা হচ্চে না। পুলিশ তো এখন কত মেয়ে খুঁজে এনে দেয়, তোমরাই বলচো। কাগজে ছবি বেরুবে ? দেখি. ছবি দেখি! মা গো মা! এরা সেই উলি আর ঝুলি : হ্যাঁ, উলির কপালে জড়ুলটা পষ্ট। এমন কত কথা, কত কথা!

দুপুরে কেমন মাছ ভাত খেল। বিকেল পড়ো, পড়ো,-- মাকে বলল, এট্টু দেকে আসি বাজারটা। আজ আমার ট্যাকায় সবাই মাচ খাবে। না মামা, তুমি

দাওয়ায় শুয়ে থাকো। কেমন করে জানব, তোমার এমন পেশারের ব্যামো হয়েচে ?

হেসে হেসে বেরিয়ে গেল।

হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার—মনসাতলায়—শনি ঠাকুর থানে—শেতলা তলায়, —দিকে দিকে পুজো, দিকে দিকে পুজো।

সাঁজ গড়িয়ে রাতের দিকে। পারঘাট হতে হেঁতালপাড়া অব্দি ভ্যান রিকশা। কিন্তু অন্ধকার, অন্ধকার, হেতাসেতা জেনারেটারের ভটভটি। মোড়েই নেমেছিল আন্না।

কয়েকদিনের বিষ্টিতেই সব পেছল পেছল।

মনসাথানে জেনারেটারের ভটভটি, গান শোনা যায়। বাজারতলার মধ্যে দিয়ে ভ্যান রিকসা যাচ্ছে। আন্না জলে উবুচুবু ধান ক্ষেতে নেমেছিল। পেট-কাপড়ে বঁটির ফলা! আসি বঁটি গড়ায়, কেনে না।

কাঁঠালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল আন্না। ও যেন জানত, কালাজও ওকে ভয় পাবে।

ট্রানজিস্টর কাঁধে ঝুলিয়ে পশুপতি আসছিল। লাঠি ঠুকছিল, আসছিল, মাঝে মাঝে ব্যাটারি মারছিল।

ঘরের দোর খোলার আগেই আন্না ওকে পা ধরে টানে। পশুপতি পড়ে যায়।

—উলি ঝুলিরে কোতা বেচলে ?

—বউ, তুই ?

—কোতা ?

—বলচি · বলচি··

—বেচেচো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ...শোন···আন্...

"না" বলতে সময় দেয়নি আন্না। আঁশবঁটির ফলা নামিয়ে এনেছিল গলায়। সকল সাবধানতা ভুলে চেঁচাচ্ছিল, পঞ্চমীর জন্যি এটা, সপ্তমীর জন্যি···উলির জন্যি···ঝুলির জন্যি··· ।

তারপর আন্না বসে থাকল। তাড়া কিসের ? রাত কাটুক। দিনমানেই থানায় যাবে। গ্রামের লোকেরা ওর চীৎকার শুনেছিল।

আবার আন্না নস্কর—আবার থানা। এবার স্বীকারোক্তি, তখন দুটো মেয়েকে বেচেছিল সাগরমেলায়। এবারেও কোথা বেচে দিয়েছে যমজ মেয়েকে।

সেবারে মাথায় মাত্তে পারিনি। এবারে গলায় মেরেছি।

হে'তালপাড়া কেন, দশটা গ্রামের জনতার সামনে দিয়ে আম্না, ওরফে অনুরাধা নস্কর মাথা তুলে চালান চলে গেল।

মাকে বলল, মোটে ছুটবে নে'।

—ও...সপ্তমীদেরে বেচে দিইছিল ?

—এদেরও বেচেই দিয়েচে।

—কি বলিস্য রে মা !

আম্না জবাব দিল না।

—একনে আমি···

আম্না চোখ বুজে বলল, ছোটাছুটি করবে নে'। আমি তো সব্যস্ব কতা কবুল যাব। তা বাদে ঝা হয় হবে ! একনে ফাঁস হয় না মা ! চোদ্দ বচর হয়। যাও, ঘর যাও। আদালত, থানা, সব'ত্তর কবুল গেচি। তারপর জগজ্জননী হয়ে সস্নেহে বলল, ঘর যাও মা !

মা ফিরে গেল।

ফিরে আসে

আবিরের স্বপ্ন

দিদি দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। মাঝে মাঝে বলছে, 'না মিলনদা, না ! আপনি চলে যান মিলনদা ! বাড়িতে কেউ নেই, আপনি চলে যান···ছি ছি ছি·· না মিলনদা ··' দুপ দুপ করে আর কারও উঠে আসার শব্দ। দিদি দৌড়ে এসে ঢুকল। আমি দেখলাম ভীষণ ভয়ে দিদির মুখ সাদা—হলদে জামা ঘামে ভিজে গেছে, কমলা রঙা শাড়িটার আঁচল কোমরে জড়ানো, দিদি পড়ে যাচ্ছিল,—আমি জড়িয়ে ধরলাম। দিদি বলল, 'সুকু···তুই ··? দরজা বন্ধ ·'

খোলা দরজায় অকারণে লাথ মেরে ঢুকল মিলনদা।

ভীষণ, ভীষণ জোরে মাইকে বাজছে বাজনা··ফাংশান জমজমাট···বাপীদা মাউথ অগ্যানে বাজাচ্ছে, 'হাম তুম ! এক কামরে মে···

মিলনদা কথা বলছে না···কিরকম একটা শব্দ করছে··চুল্লুর গন্ধ···স্ত্রীলোকে ···ছেড়ে দে সুকু···ওকে আমি···'

আমি বললাম, 'আর এগিও না মিলনদা···আমার মাথায় কষ্ট হচ্ছে · আমি দানব হয়ে যাচ্ছি···আমার হাতে দিদির ভার···'

'স্ স্ সা—লী ! পেড়ে ফেলেছিলাম···'

মিলনদা আমার হাত থেকেই দিদিকে টেনে নেবে···আমি হাত ঝেঁকে দিদিকে ফেলে দিচ্ছি···দিদি পড়ে গেল ··আমি মিলনদাকে ঠেলছি···ঠেলছি··· মিলনদা কিরকম ড্রাকুলার গলায় বলল, 'তুই দেখবি ? দেখ। তোর দিদির গোমর আমি···'

আমি বুঝতে পারছি মিলনদা কি করতে যাচ্ছে···এসব নিয়ে আমরা বহুত আলোচনা করি···বন্ধুরা ··ফুলির মাকে ড্রাইভারটা যা করেছিল · সেই যে সিনেমাটা···ঠিক সেই সিনেমাটার মতো মিলনদা বলছে···কাপড় খুলে·· আমি মিলনদাকে ঠেলছি···ঠেলছি···টেবিল পড়ে গেল···ধাম করে ইস্ত্রিটা পড়ল··· আমি ইস্ত্রিটা তুলে নিলাম·· সব ধোঁয়া ধোঁয়া···ট্রেনের বাঁশি কানের পর্দায় ফেটে পড়ল · দিদি চেঁচাচ্ছে···'সু কু উ উ উ।'

দিদি আমার হাত টানছে···ধোঁয়া সরে গেল।

মিলনদা পড়ে আছে… আমি ইস্ত্রি দিয়ে ওকে থেঁতলে যাচ্ছি…থেঁতলে যাচ্ছি…থেঁতলে যাচ্ছি…দিদি আবার চেঁচাল, 'সু—কু—উ—উ—উ—।'

কী বীভৎস মিলনদার মুখ…কপালটা ডেবে গেছে…গলাটা পাশে ঝুলে আছে. রক্ত…রক্ত…রক্ত…আমি চেঁচালাম, 'না—আ- আ— আ—আ—।'

আমি চেঁচালাম, 'না—আ - -আ—আ।'

তারপর আলো জ্বলল।

পিসি জেলেছে।

কি হইছে ? অ সুকু ! চেঁচাস কেন বাপ ? সপন দেখছিস…

'হ্যাঁ পিসি…আবার দেখলাম…'

ল, উঠ্ দেখি…জল খা…ইশ্‌শ। ঘাইমা ভূত হইয়া এক্কেরে…ল'। পাখা বারাইয়া দিলাম…ঠিক হইয়া শো দেখি ? দারা ! বালিশে রাম নাম লিখ্যা দেই…বুকে হাত রাইখা জপ কইরা দেই…'

'দাঁড়াও, বাথরুম থেকে আসি।'

বাথরুমে পঁচিশ ওয়াটের আলো অন্ধকারকেই বাড়িয়ে দেয়। কোনও কোনও আলো আলোকিত করে। জেল টাওয়ারের সার্চলাইট। বা হাইওয়েতে গর্জমান ট্রাকের আলো। সে সব আলোও আসলে অন্ধকারই। নির্যাতিতা ফুলির মা একটা ট্রাকের সামনে কয়েক সেকেণ্ড ঝলসে উঠে, ট্রাকের চাকার নিচে অন্ধকারে চলে গেল। ফুলি লেবুতলা বাজারে লাইনে নেমে গেছে।

জেলের টাওয়ারের সার্চলাইট যাদের খোঁজে, তাদেরও তো অন্ধকার করে দেয়। ডেডবডি। শুনেছি আমি জেলে বিচারাধীন থাকার আগেই রাজবন্দিরা পালাতে চেষ্টা করে টুপটাপ অন্ধকারে ডুবে গেছে।

বাথরুমে পঁচিশ ওয়াট, ঘরে চল্লিশ ওয়াট। বড় বড় ঘর, যোল বাই আঠারো। রং হয় না। শেষ চুনকাম কবে হয়েছে কে জানে। বাড়িতে একটি ঘরেই নেরোল্যাক রং ও সুরিয়া টিউব জ্বলে।

সুবীর দত্তের ঘরে। দূরদর্শন ও ঘরে রঙিন। বাবা মা'র ঘরে সাদাকালো। বাবা মা যখন বাংলা সংবাদ শোনে, ও ঘরে জি-টিভি তখন পুরুষদের জাঙিয়ার অপার শক্তি, বা 'আমার স্বামী আমার চামড়া দেখে বধূ নির্বাচন করেছিলেন' এমন সব সুসমাচার ঘোষণা করে দেশবাসীকে,— ওরা চারজন। দাদা. বউদি। পিয়া ও পিউ আজকাল এসেলওআর্ল্ডেই থাকে তো।

কিচেন ঢেলে সাজানো, বাথরুমে মোজায়িক।

মা-বাবার ঘরে একশো পাওয়ারের আলো, বাবা পেনসান পায়।

দাদার ঘরে জি-টিভির সিরিয়ালের গৃহসজ্জা, দাদা ঠিকাদার। ইত্যাদি বৈভবের মূলে মেট্রো রেল।

আমি আর পিসিমা, আমাদের পেনসান, বা ঠিকাদারি, বা বিজিতদার মতো বিছানার দোকান নেই। তাই আমরা চল্লিশ ও পঁচিশে আছি। ঠাকুরদা'র ইজিচেয়ার, ঠাকুমার বাসনের আলমারি। একটি ফিলিপস রেডিওর খোল, কয়েকটি নিঃশব্দ দেওয়াল ঘড়ি ও আমরা।

বাথরুমটার আলোয় দেখে নিলাম।

না, রক্ত নেই কোথাও।

স্বপ্নই দেখছিলাম তবে।

পিসিমা জল নিয়ে বসেছিল।

'ল, জল খা।'

'দাও।'

'সপন দেখিস, সুকু?'

'হ্যাঁ পিসিমা। শুয়ে পড়ো।'

'খাবি কিছু?'

'এত রাতে?'

পিসিমা কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'আমি তো টুকটাক রাখি, খাইও। মনটা তর লিগ্যা খুব জ্বলত। তহন উইঠা মোয়া ভিজাইতাম জলে, খাইতাম।'

'তুমি কি মোয়া কর?'

'অহনে তো কিছুই করি না। ওই টোপ জ্বালাইল্যা দু'গা ফুটাই। তুই আইত্যাছস জাইনা কিন্যা থুইছি। ল, খা দুইটা।'

ঘরের দেয়ালে সময় নিয়ে কি আশ্চর্য খেলা। বারোটা বেজে চার, বারোটা বাজতে এগারো, দশটা বেজে কুড়ি, এমন নানা সময় মুখে এঁকে ঘড়িগুলো আমাদের দেখছে।

সন্ধ্যা আটটা বেজেছিল টুং টাং করে।

বয়রাবাগানে আমাদের বাড়িতে দোতলায় রাত গভীরে আমি ও পিসি গভীর তৃপ্তিতে তোবলের দোকানের মুড়ির মোয়া জলে ভিজিয়ে খাচ্ছি। তৃপ্তিতে পিসির চোখ নিমীলিত।

'পিসি! খিদেই পেয়েছিল।'

'বুজছি। খাওয়ার কালে মাছ দিছিল?'

'হ্যাঁ পিসি।'

'আগে ত হকল জনেরডা খাইয়া সারতিস। অহনও ডাকাতি কইরা খাইয়া লইতে পারস না?'

'খাই তো।'

'বয়সের পোলা। খাইবি, লইবি, নয় তো শরীল থাকে? তর মা'রে তো

বইলা লাভ নাই। হেয় মন্তর লইয়া খাওয়া ছাড়ছে। ম্যানকা অহনে পাকঘরে ছাড় ঘুরায়।'

'বাবা মা মন্ত্র নিল কবে?'

'অনেক দিন।'

খেয়ে দেয়ে আলো নিভিয়ে আমি আর পিসি শুয়ে পড়ি। পিসির গায়ে কেমন কবরেজী তেলের গন্ধ, শীর্ণ বুক, আধময়লা কাপড়। কিন্তু পিসির গায়ের গন্ধে আমি বড় শান্তি পাই।

বলি, 'কাল অনেক কিছু কিনে এনে রেখে দেব।'

'হ...দিস...অহনে ঘুমা। জপ কইরা দিছি...বুকে হাত রাখছি তর... কপালে আছিল দুর্ভোগ...তয় তুই না থাকলে খুকিরে ফাস লইতে হইত... তার হাত অইতে কুনো মাইয়া বাচে নাই...বংশে অইটাই আছিল কুলাঙ্গার... ঘুম আসো মানিক!

পিসির হাত কি নির্ভার, পলকা...কিন্তু বুকে হাতটা আছে জেনে আমি ধীরে ঘুমে তলিয়ে যাই, ধীরে...ধীরে...

তারপর...দিদি সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে উঠে আসে...পেছনে দুপ দুপ শব্দ...ফাংশান চলছে...বাপীদা...মাউথ অর্গ্যান বাজাচ্ছে...

মাত্র কয়েকদিন বাড়ি ফিরেছি আমি। জেলেই কি বাঁচতাম, যদি শানুদারা আমাকে কাছে টেনে না নিত?

বলেছিল, 'বোকা ছেলে। আরে, পুলকের তো একই কেস। ভাল করে দাড়ি গোঁফ গজায়নি...ষোল বছরের ছেলে...উকিল তাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে কেন হ্যাঁচড প্যাঁচড় করে দিল...পুলক কি কম কেঁদেছে সে সময়ে?

পুলকদাকে আমি হাসতেই দেখি। ও কবে কাঁদত, জানব কি করে?

শানুদা বলত, 'দারুণ চেহারাখানা তোর। খুব ব্যায়াম করতিস বুঝি?'

সে সব দিকেই তো মন ছিল বেশি। খুব খেলাধুলো, খুব ব্যায়াম...খুব সাঁতার কাটতাম...বাবা বলত, 'সুকু পুলিশে ঢুকবে।'

মা বলত, 'ছি ছি।'

'আরে, আই পি এস হবে ও।'

আমার বাবা সরকারি পূর্ত (সড়ক) বিভাগে কাজ করত। বরাবরই শুনেছি, ঠাকুরদা নাকি ফেমিলি দেখে নাই। দ্যাশের জমিজমারও খবর রাখে নাই। দাদারা যা পাঠাইছে, তাই লইছে।

বয়রাবাগানের এ বাড়ি বাবার ভাষায় 'একচেঞ্জ প্রপার্টি'। বাবা সেই সময়, অর্থাৎ দেশভাগের সময়ই চাকরি পায়। চাকুরিদাতা বলেছিলেন, 'বুঝে শুনে কাজ করলে মাইনের টাকায় হাত পড়বে না।'

বয়রাবাগানের বাড়ির তুলনায় আমার জ্যাঠাদের ঘরদোর অনেক ভাল। দাদা, দিদি, বা আমি দেশ দেখিনি, অন্য বাড়িঘর দেখিনি, এটাই আমাদের কাছে প্রাসাদতুল্য বললে হয়।

যে বাড়ি ছিল, তাকে বাড়িয়ে নেয় বাবা। তখন এ বাড়ি দামি বাড়ি ছিল না। কিন্তু এখানে যে কোনওদিন মুসলিমপাড়া বা বসতি ছিল, তার চিহ্নও তো নেই কোথাও।

আমি বলি "বয়রাবাগান", কিন্তু নাম 'মনমোহন কলোনি' হয়ে গেছে।

বাড়িটা দোতলা, ছাত আছে। চিলেকোঠায় যা হয়, ঝড়তি পড়তি জিনিসে বোঝাই। একতলায় চারটে ঘর, দুটোয় দাদার অফিস, আর দুটোতে ভাড়াটে।

দোতলায় ওদিকে তিনটে ঘর, চওড়া বারান্দা। দুটোতে দাদারা থাকে, একটায় বাবা মা। দাদার রান্নাঘর ও বাথরুম আলাদা। এটা হতেই হত। মা বাবা তো দীক্ষা নেওয়ার পর নিরামিষাশী। দাদারা মাছ-মাংস খায়।

পিসিমা আর আমি যে ঘরটায় থাকি. সিঁড়ির মুখে, এ ঘরেই দিদি আর আমি থাকতাম। এ ঘরেই মিলনদা...

পাশে ভাঁড়ার ঘর, তারপর রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘরে মেনকা, বাবা মা'র ভাগের হোলটাইমার ঘুমায়। রান্নাঘরে নিভেজাল নিরিমিষ রেঁধে ও মা'র ঘরে তুলে দিয়ে আসে।

পিসি তার নিজের ঘরের কোণেই 'টোপে ফুটাইয়া খায়।' বলে, 'হকের ভাত খাইত্যাছি।'

পিসি তো অকালে বিধবা, তায় নিঃসন্তান। অতীতের কথা জানি না কিছুই। কোথায় ঢাকা, কোথায় বহর। কোথায় নারায়ণপুরে দত্তদের বাড়ি, জমি, পুকুর, বাগান, কোনও ধারণাই নেই।

'পয়সা পয়সা সের দুধ আছিল।'

'মাছ কেও কিনত না, জাল ফালাইত।'

'বরতো উদ্‌যাপন কইরা মায়ে একশৎ সধবারে নতুন থালে ত্যাল, সিন্দুর. নতুন কাপড় পাঠাইছে। তর জ্যেঠার বিয়াৎ যে পাকস্পর্শ হইছিল...

'জমিদার ছিলে তোমরা?'

'কিসের জমিদার? জমিদার গ্রামে আসত কই? হেয় ঢাকা শহরে কইলকাতা থনে থেটার আনাইত, ফুর্তি করত। ফুর্তি কইরা কইরা...ভরা কলসের জল গরাইয়া খাইতে খাইতে এক্কেরে হ্যাষ। আমার ঠাউরদা আছিল এগো নায়েব। এগো সম্পত্তিই কিইনা কিইনা...

কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর বলতে চায় না পিসি। কেন পিসিকে দশ বছর না হতে নিজের বড়বোনের স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেয়া হল?

পিসি বলে, 'বিয়া এট্টা কপাল।'

'আবার সঙ্গে সঙ্গে না হলেও তার পরেই বিধবা?'

'তাও এট্টা কপাল। আইলাম যহন, ঠাউরদায় এক কোচর টাকা ঢাইলা দিয়া কইল, লারবি চারবি সুদ খাটাবি, টাকার পরশে বরো সুখ রে না। হকল দুঃখ ভোলবা। সংসারের টাকাও তুমি রাখবা।'

পিসির অহৈতুকী স্নেহ ছিল ছোটভাই, আমার বাবার ওপর। তাই বন্নরা-বাগানের এ বাড়িতে ঘর-বাথরুম বানানো ইত্যাদিতে পিসি পাঁচ হাজার টাকা বাবাকে দেয়। তাতেই পিসি বলে, 'হকের ভাত খাইত্যাছি।'

পিসি মায়ের আঁতুড় কেড়ে স্নান করেছে। আমাদের মানুষ করেছে। বাবাকে বকতে সে পারত, এখনও পারে।

বাবাও পিসির বিষয়ে খুবই দুর্বল। নিজে মস্তর নিক, যা করুক, পিসিকে দেখে।

'তুমি এ ঘরে চলে এলে?'

'এহানেই তো সেই হারামজাদা...কেও দেহি ভয়ে ঢুকে না। আমি মহনরে কইলাম, ঘর শুদ্ধি করা, আমি ঠাকুরঠুকুর লইয়া বসি, ভয় পালাইব।'

মা বলেছিল, 'না বড়দি...একা...'

পিসি নাকি বলেছিল, 'আমার বিয়ার পর আমার বরদি তো গলায় কলস বাইন্ধা ডুইবা মরে। অনেক সন্তান হয় আর মরে, নাড়িতে ঘা, জ্বইলা মরত। আমি ডরাই নাই। কাটাকাটি অনেক দেখছি লো,—কারেও দেখলাম না ভূত হইয়া ঘুরত্যাছে। আমি মরলে ভূত হইলে হইতে পারি। মহনের সংসারের উপর এত টান—সুকুর এট্টা দিশা না হইলে আমি মইরা শান্তি পাইতাম না।'

আমার পিসি দেশের কথ্যভাষা বলে।

মেনকা বা ম্যানকা পদবীতে মিত্র (পদবীটি সগর্বে বলে), ছত্রিশ বছরের ঘোর আচারনিষ্ঠ, খটখটে বিধবা, যে মুসুর ডাল বা ফুলকে আমিষ জ্ঞান করে। সে বিশুদ্ধ গাঙ্গেয় কলকাতার ভাষা বলে।

আমার বাবা ও মা দেশের কথ্য ভাষা বলে না, কিন্তু তাদের কথায় টান-টোন বুঝিয়ে দেয় দেশটা ওপারে। আমার মামাবাড়িও কলকাতায়। তাঁদের কথাও এরকম।

দাদা, দিদি, ও আমি চিরকাল সম্ভবত এপারের টানাটোনে এপারের ভাষা বলছি।

তবে বউদির ভাবা ঝকঝকে, তাতে ইংরিজি অ্যাকসেন্ট। পিয়া আর পিউ সাত বছর বয়সেই ঝরঝরিয়ে ইংরিজি বলে।

বাড়িতে সাংস্কৃতিক সংঘাত নানারকম।

বাবা ও মা ধর্ম বা ভক্তিসঙ্গীত ব্যতীত শোনে না! আবার পিসি ও মেনকা, দুজনেই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাংলা গান ও সিনেমা ভালবাসে।

দাদা একদা কিশোরকুমার-কণ্ঠ ছিল, এখন নেই। বউদি যদিও নিজেকে সংস্কৃতিমন্য মনে করে, ওদের ঘরে ও মনে দূরদর্শনের নানা চ্যানেল ঢুকে গেছে। আমি জানি (পিসির গুপ্তকথা) যে দাদা গোছা গোছা পোস্ট কার্ড আনে, বউদি গোছা গোছা পোস্টকার্ডে জবাব পাঠায়। দূরদর্শন তো অক্লান্ত প্রশ্নকর্তা।

দিদি সহাস্যে বলল, 'আমি গান গাইতে ভুলে গেছি।'

'বিজিতদা পছন্দ করেন না?'

'না, না, সময় কোথায় বল?'

ওর কোনও ভানভণিতা নেই। নিজেকে বিজিতদার মতই মোটাসোটা করে ফেলেছে। মেয়েদের নাম রিয়া ও রিচা, ছেলের নাম জিৎ।

দিদি ও বউদি এ-ওকে 'আনকালচার্ড' বলে।

এ বাড়িতে রান্নাও নানাস্তরে হয়। বাবা মা'র হেঁসেল থেকেই খাবার আসে। পিসি বড়াটা, ছেঁচকিটা ইত্যাদি দেয়।

বউদির ঘর থেকে মাছ বা মাংস আসে। অন্তত প্রত্যহই আসছে।

এ বাড়িতে একদা বাবা ইলিশ নিয়ে ঢুকলে উৎসব পড়ে যেত।

দাদা তো কিছু টাকা পেলেই মাংস আনবে। দিদি টিউশনির টাকা থেকে আমাকে টাকা দিত।

আমি সব খেয়ে উড়িয়ে দিতাম। জন্মেছিলাম বোধহয় রাক্ষস খোক্কস হয়ে। অসম্ভব খেতাম, সব হজম করতাম, ব্যায়াম করতাম। আট বছরে মনে হত বারো বছরের ছেলে, আর ষোল বছরে?

মুখ দেখলে ষোল বছর। শরীর তো তখনই পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি, মাংসপেশী লোহার মতো।

স্বপ্নও একটাই। পাড়ায় তেমন সুযোগ নেই, কোনও ভাল জায়গায় গিয়ে দেহ গঠন করব।

মা বলত, 'ভদ্রলোকের ছেলে কি কুস্তি করবি! বাঙালির চাই দেহে শক্তি'।

মিলনদার দাদা দোলনদা, তার দাদা শক্তিদা, এরা ছিল অন্যরকম। আমাদের নিয়ে ক্লাব করত, সরস্বতী পুজো, পাড়ায় দুর্গা পুজো, নাটক, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা...

শুনতাম মিলনদা খারাপ ছেলে হয়ে গেছে। সে মস্তানদের নেতা হতে চাইছে।

আমরা তখন ম্যানেজ করতে পারলেই সিনেমা দেখি। সবাই অমিতাভ বচ্চনের ভক্ত। সে কলকাতায় ছিল, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছে, আমরা

'অমিতাভ ফ্যান ক্লাব'ও করেছিলাম।

বন্ধুরা যখন আলোচনা করতাম, সিনেমায় অমিতাভ যা করে, আমরাও তা করব। দুষ্টকে বা দুষ্টচক্রকে একা ফেলে দেব।

বলতাম, 'রোগা প্যাংলা, তার হাতে অত জোর?'

শান্তদা মানুষটাও শান্ত, সে আমাদের আবৃত্তি শেখাত, সে বলত, 'না ভাই, ও সব করে ডামিরা। মানে ওদের ডবলরা।'

এ কথা জেনে আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আর একদিন এক কাণ্ডই ঘটে যায়।

ফুটবল নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে ক্ষেপে গিয়ে আমি টেবিলে দমাস করে এক ঘুষি মারি। টেবিলটা ফেটে গেল।

শান্তদা নির্বাক। আমরা নির্বাক।

শান্তদা বলল, 'দোস্ত্ন টেবিলটা প্রেজেন্ট করেছিল।'

আবার নির্বাক।

তারপর বলল, 'নিজেকে রাশে রাখতে চেষ্টা করবি সুকু। তোর মুখচোখ আমি দেখছিলাম। ওই ঘুষি বেকায়দায় লাগলে মানুষ মরে যাবে।'

'হঠাৎ...'

'হঠাৎই তো হয় সুকু!'

আমার জীবনে ঘটনাটা হঠাৎই তো হল। অতর্কিতে আমাকে ফেলে দিল রাক্ষুসে ঘূর্ণিতে। আমি তলিয়ে গেলাম।

শানুদারা বলত, 'তুই এত কাঁদিস কেন?'

'খুন করে ফেললাম।'

'কোনও কোনও খুন করতে হয় সুকু! তুই না থাকলে তোর দিদির জীবনটা কি হত? আর সে লোকের খুঁটোর জোর এত বেশি, যে দিদি কোনও সুবিচার পেত না। তোরাও ওকে ধরতে ছুঁতে পারতিস না।'

পুলকদা বলত, 'বিচারের কোন মাথামুণ্ডু আছে? একটা মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে অপরাধী খুন হয়ে যায় যদি · কেন খুন করল, তাও তো দেখতে হবে।'

'আমার জ্ঞানই থাকে না পুকলদা, আমি রাগতে ভয় পাই।'

শানুদা বলত, 'আমাদের ওপর রাগলে সুকু...আমরা তিনজন তোর ওপর চেপে বসব।মন্টুকে তো দেখিস রোগাটে, হাতের সাইড দিয়ে মারলে গলার চেহারা ঝুলিয়ে দেবে।'

পুলকদা বলত, 'বাসার মানুষয়া বোঝে, তুই কেন মারছিলি। নয়তো এত আসে? এমন কাঁদে? এত খাবার আনে?

দিনে দিনে···বছরে বছরে ··আমি উচ্চমাধ্যমিক···বি এ পাশ করেছি···শানুদা বলত, 'বেরিয়েই কাজের সন্ধান করবি।'

ওই 'কেন'টা শানুদাকে নয়, ডাক্তারকে বলেছিলাম। এই ডাক্তারবাবু দরদী মানুষ। আমাদের ওষুধ-বিষুধ দিত। তার চেষ্টাতেই আমরা হাসপাতালে ডিউটি শিখেছিলাম। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, আমি তাকে ঠেলছি, তা মনে পড়ে, ইঁদুরটা তুলে নিলাম, তা মনে পড়ে, কিন্তু তারপর কিছু মনে পড়ে না। ওই ২ / ৩ মিনিট মাথায় নেই।

'এমন হয়েই থাকে আবির। এমন কেস আমরা পাই। এটা অদ্ভুত কিছু নয়। তোমার কেসে তো খেপে যাওয়ার ন্যায্য কারণই আছে।'

আমিও তাই বিশ্বাস করতে পেরে বেঁচে গেলাম। মারতে তো চাইনি···দিদির ইজ্জৎ চলে যেত...মারতে তো চাইনি··· ।

আমি খালাস পাবার আগেই শানুদারা বেরিয়ে যায়। আর খালাস পাবার মাসখানেক বাদে হঠাৎ পুলকদা এল দেখা করতে। বলল, 'আমার ঠিকানাটা রাখ।'

'এ কি···এত দূরে চলে গেছ ? তোমার না...'

'সমাজের শত্রুই ছিল লোকটা···বয়সও আমাদের কম ছিল--বাইরের দুনিয়াটা খুব পালটে গেছে সুকু—'

'এ তো···বর্ডারে· ·'

'ভ্যান রিকশায় পটল বেগুন বেচা যাবে—চাষীর কাছে কিনব—বাজারে বেচব--'

'তোমার শেলীদি ?'

'কেউ কারও জন্যে বসে থাকে সুকু ?'

মা বলে যেত, 'তোর জন্য বসে আছি।'

কখনও, কেউ বোধহয় সবটা সত্য বলে না, অথবা জানেও না যে তারা অর্ধসত্য বলছে। দোলনদা আর শক্তিদা, চুয়াত্তর সালের এক নেতার বংশবদ ছিল। ওদের মানসিকতা পুরনো জমানা মার্কা। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মড়াপড়ানো, পাড়ায় ছেলেদের সাহায্য করা, দেদার খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি করত। দু'ভাই বছর বছর নেতাজী দিবসে ক্লাব মারফৎ গরিব ছাত্রদের বই দিত।

বউ, ছেলেমেয়ে, মা-অন্ত প্রাণ ওরা।

ওদের বাবা মরে যেতে আমাদের বলল, 'বাবা কাঁদে চেপে যাবে, ম্যানুয়েল চিতায় পুড়বে।'

মিলনদা বলল, 'চন্নন, চন্নন কাট।'

ভেটেরান শান্ত কাকা দোলনদা'র কানে কানে বলল, খাঁটি ঘি আর মাইশোর চন্দন কাট ওপরে চারটি দিলেই হবে।'

মিলনদা বাড়িতে থাকতই না। এ সময়েও কোথা থেকে চুল্লু খেয়ে ভোঁ হয়ে এসেছিল।

'আমার বাবাকে নারকেল দড়িতে বাঁদতে দেবো না' বলে সে কি বুক চাপড়াচাপড়ি।

শেষে শক্তিদা বলল, 'বেশি ব্যাগড়া দিবি তো তোকেও বেঁদে-ছেদে নিয়ে যাব। তিনদিন বাড়িতে ফেরার নাম নেই। বাবাকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে দেখে চলে গেলি, এখন নাটক হচ্ছে? সরে যা, সরে যা, আর দেরি করলে বাবা দোষ পাবে।

তখনকার মতো সামলানো গেল মিলনদাকে। শ্রাদ্ধেও খুব ঘটাপটা হল। দোলনদা আমাদের বেশি যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল, শ্মশানবন্ধু বলে কথা! শান্ত কাকা, আমি, তোবলে, ভেবুল, বাঁশি, নন্দন, আমরা ছ'জন বোধ হয় বিশজনের খাবার খেলাম। আবার ওরা পাঁচজন যখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে, তখনও আমি খেয়ে যাচ্ছি। শান্ত কাকা বলল, 'সুকু! খাবারটা ওদের, পেটটা তোর।'

দোলনদা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আহা! চোখ জুড়িয়ে গেল। আজকাল এ রকম—'

না, ওদের সঙ্গে কোনও বাদবিবাদ ছিল না। থাকার কথাও নয়।

বাবা মরে যেতে ওদের মধ্যে নাকি খুব লাঠালাঠি লেগে যায়। মিলনদা একদিকে, দোলনদা আর শক্তিদা একদিকে! এটা চলাকালীন অবস্থাতেই মিলনদা বাড়ি ছেড়ে চলেও যায়। শুনলাম রেলওয়েতে ঠিকাদারি পেয়েছে কোনও মন্ত্রী জোগাড় করে দিয়েছে, মিলনদা টাকায় উড়ছে।

এ সব অনেক, অনেক আগে হয়ে যায়।

মিলনদা যখন দেবী বউদিকে বিয়ে করে ফিরে এল, শান্ত কাকা বলল 'এখন যদি ঠাণ্ডা হয়।'

মিলনদা'র মাও পুজো অঙ্গনে মাকে বলল, 'বয়সে বে'থা না হলে ছেলে পিলে খানিক বেয়াড়া হয় বটে। এখন ও শুধরে যাবে।'

শুধরে তো যায়নি।

পুজোর মধ্যেই কোনও মেয়েকে টানাটানি করা নিয়ে খুব গোলমাল হয় তখন নন্দনের দাদা আনন্দ ওপরে উঠছে, সে মাঝে মাথা দিয়ে কেলেঙ্কারি ঠেকাল। সবচেয়ে অবাক কথা হল, দেবী বউদি চিৎকার করে আনন্দদা'কে বলল, 'একটা লোকের বদনাম হয়ে গেছে, তা বলে যা নয় তাই করবে? যত দোষ তোমাদের মিলনদা'র? মেয়েছেলে ঢলে ঢলে বেটাছেলের গায়ে পড়ে কেন?'

এই ছোট ঘটনা থেকে প্যাণ্ডেলেই জনমত বিভক্ত। তারপর মারামারি, হাতাহাতি—ব্যাপারটা খুব বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা।

বাড়ি এসে মা বাবাকে বলল, 'বাড়ি করে বসে আছি। পাড়ার গতিক কিন্তু ভাল বুঝি না।'

'ছোট ছেলেকে বল।'

'ও কি করল ?'

'এত খেলাধুলা, এত ক্লাবে পেশীসঞ্চালন দেখানো, লেখাপড়ায় মন দিক বেশি। সুবীর যাদবপুরে পড়ছে হস্টেলে, ওকেও সরিয়ে দেব। সময়ও তো ভাল নয়।'

'খুকিকেও মানা করব অত বেরোতে।'

'সে তো গান শিখতে যায়—তবে পাড়া অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে—মিলনের দাদারা নেশা ভাং করে না—মিলন যে কি একটা—

'অশিক্ষিত ধনীর কনিষ্ঠ পুত্র। বাঁদর হবার কথা, হয়েছেও অনেক দিন।'

'অশিক্ষিত ?

'আর কি ! মাছের ভেড়ি মালিক, শিক্ষার দরকার কি তার ? যাক গে ! সময়টাই—'

আজ বুঝি সময়ের গায়ে কত উত্তাপ ছিল। কত জ্বর ! অনেক কম বুঝে ও কম জেনেই জেলে চলে যাই।

রাজনীতি কোনওদিন করিনি। 'জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়' কেউ লিখেছিল কোনওদিন তিন নম্বর বয়রাবাগান বস্তির এপারে এক পরিত্যক্ত গুদাম ঘরের দেয়ালে।

শান্ত কাকা বলত, 'সে সব ছেলেরা বিপজ্জনক। পুলিশই তাদের নিকেশ করে দিয়েছে।'

আমার কাছে সে সব ছেলেরা ফেসলেস।

কিন্তু যা শিখলাম তা তো জেলে বসে, যদি শিখে থাকি কিছু।

শানুদা বলত, 'নিজের দুঃখ খুব বড় মনে হয় তো ? তোর বাবা, মা, দাদা মাঝেমধ্যে দিদিও আসে। পুলকের আসে কেউ ?

পুলকদা ঈষৎ হেসে বলত, 'কে আসবে ? মাসি ? সে মেসো মরতে ব্যারাকপুরে ক্লাস ফোর স্টাফ। কেউ থাকলে তো আসবে ?'

শানুদা বলত, 'বেশ ! বেশ ! তোর কথা বলাটা ভুল হয়েছে। ওই দিলীপ বেরাকে দ্যাখ। কোথায় কোন অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি। বাসার লোক খরচ করে আসতেই পারে না। অনেক দিলীপ আছে সুকু। পাঁচটা জেলে অনেক আছে।'

পুলকদা বলত, 'তুই তো শ্রেণী হিসাবে উপরে আছিস।'

'কেন ?'

'তোর বাবা হাইকোর্ট করেছিল। আমরা নব্বুই শতাংশই সেশান কোর্ট থেকে চলে এসেছি।'

কত কি জানলাম !

'হাইকোর্ট করেও তো –'

'তুমি মন্ত্রীর পেটোয়াকে মারবে। হাইকোর্ট তোমায় ছেড়ে দেবে ?'

মণ্টুদা বলত, 'অধিক আহার ! অধিক আহার ! গাদা গোচ্ছার খেয়েছ। বডি বানিয়েছ, তাতেই তো ষোলকে আঠারো বানাতে পারলে।

অথচ, যখন ফিস্ট করতাম, মণ্টুদা সবচেয়ে বেশি খেত।

জেলে বসে বসেই তো পড়লাম…পাশ করলাম…বি এ পাশ করার পর বাবা মাথায় হাত রেখে চোখ মুছেছিল।

সেই সব মুখ না থাকা ছেলেদের দেখলে বলতাম, 'জেলখানা বিশ্ববিদ্যালয় বটে ! আমার মতো একটা বুনো শুওরকেও ভাবতে শিখিয়েছে।'

বই কি কম পড়েছি এই কয় বছরে ? বই পড়ার অভ্যাসই ছিল না। অভ্যাস হল।

ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে পারিনি। তবে জেলের সরস্বতী পুজোয় কবিতা আবৃত্তি করেছি। গান গেয়েছি।

ডাক্তারবাবু ঠিকই বলত, 'যদি ভেবেই চল কেমন করে থাকবে এতবছর, মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তা হলে পাগলা ওয়ার্ডে রাখবে ?'

'পাগল হবে কেন ? থাকতে যখন হবে।'

'মেনে নিতে শেখো, সহজ হয়ে যাবে।'

শুধু শানুদারাই বলেনি, ডাক্তারবাবুও বলত, 'একসময়ে মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে জান দিত ছেলেরা, জান নিতও।'

আমি এভাবেই দিনে দিনে বুঝতে শিখলাম। দিদির ইজ্জৎ রাখার জন্য কাজটা করেছি যখন, তখন সমাজও আমাকে সে চোখে দেখবে। অন্তত, আমি তো ঢ্যাপ নই, যে আটটাকে মেরেছে, না দশটা, জিগ্যেস করলে বলে না।'

শানুদা বলত, টাকা নিয়ে খুন করে, কিসে ফেঁসে সাজা হয়ে গেছে… বেরিয়েও এক কাজই করবে। ওদের সংস্পর্শে যাব না। শালারা নরকের পোকা।'

বিচার ব্যবস্থাও ফেসলেস।

শানুদাদের নরহত্যার পিছনে আদর্শবাদ। যে জন্য ওরা মাথা তুলে বেড়াত।

চ্যাপের নরহত্যা সকলের পিছনে শুধুই নোটের তাড়া।

আমার মতো দু'একজন কি থাকবে না। যারা তাৎক্ষণিকতার তাড়নায় এ কাজ করেছে?

বিচারব্যবস্থা 'কেন' দেখে না, 'কাজ' দেখে। সকলকে সমান করে দেয়।

মণ্টুদা বলত, 'ছাই সমান করে দেয়। আসল খুনী কত ঘুরে বেড়াচ্ছে··· তাদের ধরে কে? যার খুঁটি যত শক্ত, তাকে ধরা তত কঠিন। রাম ধরলে শ্যাম ছাড়াবে। বাঘের উপর টাগ, তার উপর টাগ,—যা, পড়গা যা।'

চলে আসার দিন বাবা আর দাদা আমাকে আনতে যাবে বলেছিল।

আমি খুব ভোরে বেরিয়ে আসি। সেদিনই আসার কথা নয়, পরদিন আসার কথা।

দরজা খুলে দিল পিসিমা। পিসির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পিসি বলল, 'নিত্য বইয়া থাকি—ভোলা যেন বলত্যাছিল তুই আজই—'

'পিসি'। মা? বাবা? দাদা?'

'লাফাইয়া নয় সুকু! ধীরে ধীরে উঠ্। সুবুর বউ দেরি কইরা উঠে—'

কে শোনে কার কথা!

'মা!'

আমি কি বড্ড জোরে চেঁচিয়েছিলাম?

কেমন করে জানব কে কোন ঘরে থাকে?

হালকা সবুজ দরজাটা খুলল না। দাদার গলা শুনলাম, 'বাঁ দিকে যা সুকু, বাঁ দিকে—'

দাদা দরজা খোলেনি তখন। অনেক পরে খুলল।

আবিরের বাবা এবং

সকল কিছুর মূলেই কিছু উলটোপালটা ঘটনার ধাক্কাধাক্কি।

আরও গভীরে গেলে সকলই আমার কপাল। কপালে এত দুর্ভোগ যদি লিখে দেয় বিধাতা, আমি, ক্ষুদ্র মানুষ, কি করতে পারি? নইলে মোহন দত্তের ছেলে নরঘাতী হয়? নিয়তি কে ন বাধ্যতে; আমার ঠাকুরের বইয়ে আছে। ঠাকুরের বই না পড়লে, আশ্রমে দীক্ষা না নিলে চলতেই পারতাম না।

ঠিকই বলত পূর্বপুরুষরা, স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মতই থাকা উচিত। না

থাকলেই গণ্ডগোল। আমার দিদি, আমার স্ত্রী, কেউ স্কুল কলেজেও পড়ল না, রংচঙা শাড়িও পরল না আমার বউ, পাড়ার ফাংশানের সময়ে বন্ধুর বাড়ি আড্ডা মেরে অলিগলি দিয়ে দৌড়েও ফিরল না, তাদের ধাওয়াও করল না কেউ!

আধিক্য ভাল নয়, আধিক্য ভাল নয়। সুকু খায়, তার মা খাওয়ায়।

সুকু আলমারি ঠেলে, গদী মাথায় নিয়ে ছাতে উঠে রোদে দেয়, দু'হাতে দু'বালতি জল নিয়ে ছাতের টবে ফুলগাছে জল দেয়, টবও অগণন—ওঠে আর নামেও বিশ পঁচিশ বার। মা বলে, 'বাঃ!'

আমার দিদি বলে, 'বাঃ!'

সুকুর দিদি বলে, 'বাঃ!'

আমি কিন্তু পরে আশ্রমে যেয়ে বুঝলাম, অধিক টাকা, অধিক দারিদ্র্য, অধিক দেহবল, অধিক ক্ষুধা, সকলই পাপ।

দেহ তো কিছু নয়, আত্মাই সব। দেহ বাড়াবাড়ি করে, আত্মা কলুষিত হয়। সুকুর এই যে অত্যন্ত রাগ, তার ফলটা কি হল? হতে পারে তোর দিদির মানসম্মান···

মিলন তো তখন মানুষ নাই। সে তখন জানোয়ার! রাবণ। রাক্ষস!

হাতটা ভেঙে দিতিস। পা ভেঙে দিতিস। জীবনটা নিয়ে নিলি?

সকলই পাপচক্র।

নচেৎ ইস্ত্রি বা ওখানে থাকবে কেন, সুকুই বা তা হাতে নেবে কেন?

'এ কি, ধাক্কা দাও কেন? সুবুর মা?'

তখন হতে বিড়বিড় করছ কি? জপ তো করছ না?'

'আমার কপালের কথা ভাবছি।'

'সুকুর কথা ভাবো একটু।'

'কি ভাবব? সে তো নিজের ব্যবস্থা করেই নিয়েছে।'

'কি ব্যবস্থা করেছে? এতদিন যে জেলে থাকল···নির্দোষে জেল খাটল···'

'কিসের নির্দোষ? সে খুন করে নাই?'

'চেঁচিও না। দিনে দিনে···সুবু আর বউমা আর তোমার গুরুভাইদের উসকানিতে তোমার মাথাটা গেছে। সে খুন করবে বলে খুন করে নাই। তোমার মেয়েকে নইলে···কি বলব! মরতে হত। বুঝেছ?'

'এখন আমার কাছে কী চাও? উকিল দিই নাই? হাইকোর্ট করি নাই?'

'হ্যাঁ···এমন উকিল দিলে যে সে ওদের টাকা খেয়ে ছেলের বয়স পালটে দিল···নইলে সুকু কবেই বেরোত।'

'আমারে বিরক্ত করো না। জেলে যায় চোর-চোট্টা-বদমাশ। আমাদের বংশে কেউ জেলের ভাত খায় নাই।'

'এই যদি মনোভাব, তবে জেলে যেতে কেন ?'

'সে আমার···দুর্বলতা...'

'যখন যেতে, তখন জানতে না যে, সে একদিন বেরোবে, এখানেই আসবে ?'

'দেখ সুবুর মা···'

'কেন, সুবুর মা বল কেন ? 'সুকুর মা' বলতে যদি জিভ আটকে যায়, অতসী বলতে পার। বাপ-মা নাম তো দিয়েছিল।'

'আমি কি করব তার জন্য' ?

'তুমি করবে না, সুবু করবে না, তবে সে কী করবে ? খাবে কী করে ?'

'আমি জানি ?'

'সে বা কী জানে ? আজ দিদি আছেন বলে ছেলেটা দুটো কথা শুনতে পায়। এ বাড়ি তারও নয় ? তার অংশ নেই ? তাকে কোথায় ফেলে রেখেছ ? দিদির ঘরে ঢুকে দেখেছ একদিন ?'

'আমি ও মহল মাড়াই না।'

'কেন, দীক্ষা নিয়েছ বলে ?'

'আমি জবাব দিব না।'

'তবে শোনো, রইল তোমার দীক্ষা, রইল তোমার ঠাকুরের বই। আমি ওরে নিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'সেইটাই বাকি আছে।'

'একবার কথা বলেছ তার সঙ্গে ? বলেছ, যা হবার তা হয়ে গেছে, পাশও করেছিস, এবার কাজকর্ম দ্যাখ, নয় ব্যবসাপাতি কর...নয় দোকান দে একটা···'

'বলতে গেলে···'

'সুবুর নিষেধ, তাই না ?'

'আমার টাকা কোথায় !'

'এই তোমার শেষ কথা ? ছি ছি ছি···এ বাড়ির মেয়ে বেইজ্জৎ হত, তার জীবন ভেসে যেত...সুকু নিজের জীবন জলে দিয়ে তারে বাঁচাল। তাতেই তার ঘরসংসার হল, সেও ভাই দেখলে মুখ ফিরায়, সুবুকে তো আমার মানুষ বলেই মনে হয় না · আমার ছেলেটার কেউ নাই রে !'

'থাক, কেঁদো না···কেঁদো না...ঠাকুর ধরেছি বড় দুঃখে গো...যখন হতে শুনি খুনির বাপ···আবার ক্লাবের নাম মিলনের নামে···মিলনের বউ এখনে কাউন্সিলার···আর দোলন তো এক নেতা বললে হয়···

'সুকুর কি হবে ?'

'তুমি···তারে ছাতের ঘর দিতে পার···'

'না। সুকু রাতে স্বপন দেখে, ভয় পায়। দিদির কাছে সে ভাল থাকে।

আমি, আমি কাল দাদার বাড়ি যাব।'

'সে কী করবে ?'

'জানি না···চেষ্টা তো করব। ছেলের কথা বলতে আমার মান যাবে না।'

'দাঁড়াও···ভাবি ··'

'ভাবার সময় চলে গিয়েছে। সে আসলে এমন বিপদে পড়বে যখন, এখানে আসতে দিলে বা কেন ?

'কেঁদো না···কী করছ ?'

'আমার ব্যাঙ্কের খাতা খুঁজছি।'

'মাত্র তো সাত হাজার টাকা !'

'তাতেই কাজ হবে।'

আবিরের পিসি

'অহন দেখি হকলই নতুন হইত্যাছে। আজ কাকসকালে বউ আইয়া সুবুরে ঝাড় দিল। বাড়ি তগো একার নয়। সুকুর সমান ভাগ আছে। আজই আমারে মেম্বার ডাইকা দিবি।'

'কেন, মা ?'

'দিদি আর সুকুর ঘর রং করামু। ঘরের পোলা ঘরে আইল। তারে ঠেলছ পিসির গোদামে। আর বউয়ের পা ধইরা লেছরাইতেছ।'

'এটা কি বলছ ?'

'ঠিকোই কই। পয়সার তো পাহাড় জমাইছ। যাও না উইঠা যেথা চাও। আমরা এই দিক নিয়া থাকুম, ও দিক ভারা দিমু। সুকুর জীবন কাইটা যাবে।

সুকু তো কাইপা ঝাইপা অস্থির। 'দাদার ডসসায় বাস কইরা তারে এমুন কথা ?'

আমি কই, 'তুই দেখ না মজাডা।'

অমুনি সুবুর বউ বাইরাল। কি বা বলতে আছিল সুবুরে, তা বউ কইল, তুমি ঢুকছ, আমার ঘরে শনি ঢুকছে। বংশ যেমুন, মাইয়াও তেমুন। ঘুটইরা ঝাড়ে কি ফুটইরা বাঁশ হয় ?

দেহ। আমরা পইচা মরুম, তোমরা ফুটানি করবা, এ আর চলব না। সুকুর বেলা একখানা মাছ। তোমার সেই বউ পুড়াইন্যা ভাই জেল থনে আইল তো

রাজভোগ। তোমারে কইয়া বা কি লাভ। সুবুই হইছে গোলামের গোলাম।'

এমুন কইরা তো বলে নাই কুনো দিন।

সুবু হকচকাইয়া কইল, 'দেখত্যাছি।'

'তুই যা দেখবি তা আমি জানি। মেস্তরির খরচ আমিই দিমু। ছি ছি ছি। অ্যাদ্দিন পরে ভাই আইল, তার লগে কুনো কথা না, কিছু না, যে খাইব কী কইরা, কী করব জীবন লইয়া · ভগবান এমুন কইরা কাছিমকাটা করত্যাছে আমারে···এমুন কইরা···

'আমি কই, যা সুকু। তর মা'রে ধর···

আমি দৌড়ে গেলাম। মাকে জড়িয়ে ধরলাম। কান্নায় ভেঙে পড়ল মা। আমার বুকের কাছে গেঞ্জিও ভিজে যাচ্ছে মায়ের চোখের জলে। সে সময়ে মা কেঁদেছে, পরে মা কেঁদেছে, মাকে আমি বড়ই কাঁদিয়ে চলেছি সারা-জীবন।

মা যেন ঢলে পড়ছে।

আমি বললাম, 'মা! মা?'

মা কথা বলে না।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'দাদা! মাকে ধর। মা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

দাদা দৌড়ে এল। পিসি বলল, 'জল দে, জল দে মাথায়।'

মাকে আমরা ধরাধরি করে ঘরে নিলাম।

বাবা বলল, 'ডাক্তার বাবুরে···'

দাদা বলল, 'আমি যাচ্ছি। তপতী, মায়ের মাথায় জল ঢালো।'

মেনকা বলল, 'দেখি। মায়ের মাতাটা এদিকে আনো। আমি ধরচি। তুমি জল আনো ছোড়দা। দেকি, এইটে মাতার নিচে দাও।'

মা'র মাথার নিচে প্লাস্টিক। মেনকার কুশলী হাত বটে। আমি মাথার নিচে ধরে আছি। মেনকা জল ঢালছে।

মা একসময় বলল, 'থাক!'

বউদি একটা মস্ত তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিসি বলল, 'মাথা মুছাও ম্যানকা।'

মাথা মুছিয়ে মাকে চিত করে শোয়ালাম। চুল ছড়িয়ে দিলাম। মেনকা বলল, 'তোমরা বাইরে যাও। আমি কাপড় পালটে দিই।'

দাদা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল। এ ডাক্তারকে আমি চিনি না। নতুন লোক হবেন। এখনকার ডাক্তার, পিওন, রিকশাঅলা, ঠেলাঅলা, জমাদার কাউকে চিনি

না। আমার বনবাসকালে সব পালটে গেছে, সব।

না-যুবক, না-প্রৌঢ় ডাক্তার, মাকে যত্ন করে দেখলেন।

বললেন, 'প্রেসার কিছু হাই। হাইপারটেনশান খুব খারাপ জিনিস। এ সময়ে এই ওষুধগুলো···কাঁচা নুন খাবেন না·· সর্বদা বিশ্রাম, একজন যেন দেখেন···।'

আমি বললাম, 'আমিই পারব।'

দাদা বলল, 'আমি ওষুধগুলো নিয়ে আসি।

'রায় কোম্পানি থেকে নেবেন। আর সব দোকানই এ পাড়ায়—'

হ্যাঁ—সেখান থেকেই—'দাদা বলল, 'নার্সিংহোমের আয়া আনব?'

বেচারা দাদা বেজায় ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পারলাম। এতদিন আমাকে শুধু এড়িয়ে গেছে। দেখা হলেই অ্যারিস্টোক্র্যাট অফিস ব্যাগ হাতে বলেছে, 'কাজে বেরোচ্ছি।'

কী কাজ, জানি না। ভাল কাজ হবে।

এখন সেই দাদাই আতান্তরে পড়েছে। কেননা মা কখনও এমন করে কথা বলেনি তার সঙ্গে। এমন অজ্ঞান হয়ে যায়নি। সুকু মাকে ধরে থাকেনি। এসব তো নিয়মভাঙা কাণ্ডকারখানা। দাদা বোধহয় নিয়মের রাজত্বে বাস করে। চারপাশে অদৃশ্য বর্ম এঁটে থাকে, যাতে সুকু যে ওর ভাই, সে কথাটা ওকে শুনতে না হয়।

বড় বিপদে ফেলেছি ওদের।

আমি বললাম, 'হাসপাতালে ডিউটি তো করতাম। কাকে আনবি, তাদেরও সাত বাহানা থাকে। আমিই পারব। মাকে সেবা করব, এ তো ভাগ্য।'

'হ্যাঁ—তোর বউদি—দুটো মেয়েই সীজারিয়ান তো·· তেমন—'

বাবা হঠাৎ বলল, 'যেটুকু পারত, মিষ্ট মুখে কথা বলা, তাই করে না।'

পিসি বলল, 'চুপ কর মহন। তুই কি করছস বউয়ের লিগ্যা? অহনে চুপ কর।'

আমি বললাম, 'তোমরা যাও তো। মাকে একটু ঘুমোতে দাও।'

মা'র চোখ মুছিয়ে দিলাম।

কত বা বয়স মা'র? পয়ষট্টিই হবে; বাবার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। কিন্তু দুঃখের রেখায় রেখায় মুখটা পিসির চেয়েও বুড়িয়ে গেছে।

পিসি অস্ফুটে বলল, 'মাছকোছ ছাইড়া—আহার কম করতে করতে—'

আমি বললাম, 'মাকে ভাল করে তুলব পিসি।'

মা'র অসুস্থতা যেন অনেকটা সহজ করে দিল পরিস্থিতি। অন্তত কিছু-দিনের মতো।

বাবা মা শুয়ে থাকে, আমি মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি, যাতে মাথা

তুললে দেখতে পাই মাকে।

ভাবতে হবে, ভাবতে হবে, আমাকেও ভাবতে হবে। এরা যে-যার জীবনে স্থিত হয়ে গেছে চৌদ্দ বছরে। রামের বনবাস, সেও চৌদ্দ বছরের।

যাবজ্জীবন কারাবাসও শেষ অবধি চৌদ্দ বছর।

আমি তো চলে গেলাম, কিন্তু সে সময়ে তো বাবাকে এখান থেকেই ছুটোছুটি করতে হয়েছে উকিলের বাড়ি। সেশন কোর্ট দণ্ড দিয়ে দিল। তারপর হাইকোর্ট। এই পথে ফিরেছে। মানুষের কথায় জবাব দিয়েছে। প্রাত্যহিকতা চালিয়ে যেতে হয়েছে।

এতদিনের পর আমার ফিরে আসা…ওদের বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

আমাকে ভাবতে হবে।

শানুদা'র ব্যাপার জানি, ওর অবস্থাও ভাল, ওর পরিবারও ওর জন্যে কোনও ব্যবস্থা করেই দেবে।

মণ্টুদা নিজের কথা কমই বলে। কিন্তু ওর ভাইকে ও-ই প্রেস করে দিয়েছিল। নিজেও কম্পোজের কাজ জানত। ও বলত, 'দেখবি, দু'বছরে যা হয় করব।'

পুলকদা সম্ভবত বুঝেছিল যে, ওরা যে একজন সমাজের শত্রুকে মেরেছিল, যে-সমাজে ফিরে গেল, সে—স্থানীয় সমাজ তা মনে করে না।

সে জন্যেই সে চলে গেল।

পুলকদা একটা ছবি এঁকেছিল, গারদের মধ্যে বন্দি কয়েকটি বালক হাত বাড়িয়ে সূর্যকে ধরতে চেষ্টা করছে।

বন্দি জীবনে বাইরের আলো, সূর্য, মাঠ, এ সবের ছবিই আঁকে বেশি, দেখেছি :

কিন্তু যে বাইরের জন্যে মনে এমন হাহাকার, সেখানে সে -বাইরে তোমার জন্যে কতটা প্রস্তুত ?

মা জল চায়, আমি দিই।

মা কাঁদে, আমি বলি, 'সব ঠিক আছে।'

'তোর কি হবে ?'

'দাদা তো আছে, তুমি ভাব কেন ?'

'বাবার সঙ্গে—কথা বলিস··'

'সব হয়ে যাবে। সবাই তো আছে আমার। ভেবে ভেবে প্রেসার বাড়িও না—মা।'

'বউমা—কথা বলে ?'

'বলে, অনেক কথা বলে। তুমি না ঘুমোও, আমি ঘুমোচ্ছি।'

মা ঘুমিয়ে পড়ে।

মা ভাল হলে একবার পাড়ায় বেরোব।

আবিরের বাবা মোহন দত্ত

অনেক অনেক দোষারোপ করে গেল ওদের মা। মনের মধ্যে জমা ছিল সব, উদ্‌গীরণ করে তো সামলাতে পারল না। হায়! তার মনেও থাকে না, বয়স আমার সত্তর। কাজে যাই, বাড়ি আসি, ছেলে মেয়ে বিষয়ে পরিকল্পনাও নিয়ে চলি। বড় ছেলেকে যাদবপুরে ভর্তি করেছিলাম। মেয়ের তেমন মাথা নেই, কোনমতে পাশ করে। ওকে একুশ বাইশে বিয়ে দেওয়ার মন করেছিলাম, দিয়েছি।

ছোট ছেলে বিষয়েই প্রত্যাশা ছিল খুব। স্বাস্থ্য ভাল, পড়াশোনাতেও খারাপ নয়, কষ্ট করেও ওকে আই পি এস করব।

সৎপথে থাকলে সরকারি কাজ করে দেশের ভাল করা যায় এমন বিশ্বাস তো ছিল।

সবাই বলবে শিক্ষিতের বাড়ি।

বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হল বটে, সরকারি কাজও পেল, কিন্তু এখনকার এই সংক্রামক জ্বর যে! বিশ বছরে ত্রিশ বছরে নয়, পাঁচ বছরে অনেক টাকা চাই। টাকা হলেই প্রতিপত্তি হয়, সমাজ সম্মান করে।

হয়তো তাই। প্রাণকিশোরবাবু, যে নাকি অনুশীলন পার্টির লোক ছিল, কত না জেল খেটেছে, পেনশানও নেয়নি, তাম্রপদকও নয়, তিনি যে বয়রাবাগান বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, তিন নম্বর বস্তির কাছে থাকত, তা তো কাগজ দেখে জানলাম।

শুনলাম দোলন খুব হাঁকড়েছে ওর চেলাদের। এমন একটা লোক ছিল··· কোন খবর রাখ নাই···ছি ছি ছি।

ছি ছি! আমাদেরকেই বলা উচিত। সে লোক অষ্টআশি বৎসর বয়সে মরে গেল, আমিই জানতাম না। আমরাই জানি না! সন্তানদের জানাব কি!

যা বলছিলাম, চাকরি ছেড়ে আমার ছেলে মেট্রো রেলের এক সাবকণ্ট্রাক্টর।

কি আশাভঙ্গ। আমরা জানতাম ঠিকাদারি বা দালালি মন্দ কাজ। তাতে পয়সা মিলে, সম্মান মিলে না।

কোথায়। সে দোলনদেরও গুডবুকে আছে, আনন্দদেরও। এরেও চাঁদা দেয়, ওরেও চাঁদা দেয়। চক্রান্ত করে তোর ভাইকে জেলে পাঠাল, তাদের

পূজায় মোটা টাকা দিল, বিজ্ঞাপন এনে দিল। এ বড় মর্মান্তিক।

আমার খুকি! শ্রীমতী শ্রীলা!

আর তো কোন পাত্র জুটল না, শেষ অবধি গদী-বালিশ-মশারির হেনতেনের দোকানের। দোকানের নাম 'সুখ শয্যা' দিতে পার, দোকানি তো বট!

আমার মেয়ে কাগজের ভাঁজ খোলে না। কোন বই পড়ে না। কিন্তু গর্ব করে, মেয়েদের ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছে।

এগুলি যে আশাভঙ্গ, তা ওদের মা বুঝে না। না বুঝে ওদের মা, ওদের পিসিমা, কিন্তু ছেলে আর মেয়ের গর্ব কি, ওরা ইংরাজিতে কথা কয়।

দুইটাই আকাট।

ছোটছেলের বিষয়ে বড় আশা ছিল। কপাল এমন, সে-ই আমার কোমর ভেঙে দিল। জানতাম, মিলন আর ভাইদের মনের মিল নাই। মিলনের বিবাহের পর তো শক্তি আর দোলন ভাইয়ের নামও করত না।

বলত, সে বড় গাছে নৌকা বেঁধেছে। নইলে রেলের ঠিকাদারি পায় কে।'

বলত, তার সাঙ্গপাঙ্গগুলি গুণ্ডা বদমাশ।'

মিলন চুল্লু খেত। মিলন মেয়েছেলের লালসা করত, এ সবে দাদাদের বড ঘিন্না।

আমি তো বাসায় ছিলামই না। পাড়ায় ফাংশান না কি, ওদের মা গেল, খুকি কোন বন্ধুর বাসায়, আমি যেয়ে রোজকার মত অতুল্যদের বাসায় বসলাম। বরাবরই সন্ধ্যায় আমি, অতুল্য শ্রীশবাবু খানিক গল্প-সল্প করি। তারপর ফিরে এসে ইংরাজি কাগজ পড়ি। তখনে 'অমৃতবাজার' রাখতাম।

দৌড়াতে দৌড়াতে অতুল্যর ছেলে অশেষ এল। বলে, 'কাকাবাবু। শীঘ্র যান! বাসায় যান!

'কেন অশেষ, কেন?'

'যান আপনে...বাপ রে! রক্তগঙ্গা।'

কার কি হল? ছুটতে ছুটতে আসলাম। আর ফাংশানের মানুষ সব আমার বাসার সামনে। ঢুকতে ঢুকতে খুকির চিৎকার শুনলাম, 'সুকু রে এ এ এ।'

আমি তো জানি, সুকু বুঝি নাই। কিন্তু উঠে যা দেখলাম··

সেই রাতে মিলনরে নিল মর্গে, আর সুকুর সঙ্গে আমিও থানায়। সুকু ঘটনা সবই বলল দারোগারে। খুকিকেও আনল ওরা। আমারে দিয়ে লেখালও।

আর ঢুকল মিলনের বউ।

সে শুধু দাপায় আর চেঁচায়, 'ওই মেয়ে আমার স্বামীরে বলল, বাসায় পেঁছে দেন···তার মৎলব বা কি ছিল...' খুব নোংরা সব গালাগালি দিল।

আমি তো দারোগার পায়ে পড়তে বাকি রাখলাম। ষোল বছরের ছেলে ...দিদির বেইজ্জৎ দেখে মিলনরে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছিল···সে দুর্ধর্ষ···

দারোগা বলে, 'আপনার ছেলে কি শ্রীচৈতন্য? যারে দুর্ধর্ষ বলছেন. মরেছে তো সে। আপনে ঘটনাস্থলে ছিলেনই না, কথা বলছেন?'

তখনে আমি তো বুদ্ধিহারা। পাড়ার মুরুব্বিরা, বা যাদের বন্ধু মনে করতাম, তারা যদি বুদ্ধি দেয় যে থানারে টাকা খাওয়াও, বেতন পেয়েছি··· বাসায় হাজার খানেক ওর মা রাখেও—গহনা বাঁধা দিয়েও টাকা খাওয়াই।

কেউ বুদ্ধি দিলই না। 'খুন' শুনেই সব সরে পড়ল।

আর। দোলনরা ঘরে টাকাও রাখে, খাওয়ালও। তাদের ডায়েরি না কি আগে হয়। আমাদের ডায়েরি পরে, অর্থাৎ থানা হতেই হেঁচড়পেঁচড়ের গোড়াপত্তন।

ঘটনা জেনে কিন্তু পরদিন অনেকেই, যেমন আনন্দরা, অতুল্যরা, পাড়াতে যাদেরি দোলনদের উপর রাগ তারা, এমন কি শান্তবাবুও বলে গেল, 'কোন অন্যায় করে নাই সুকু। সে বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে যেয়ে কাজটা করে ফেলেছে।'

উকিলও তাই বলল। বলল, এতো পরিষ্কার প্রোভেকেশান ছিল,—আর মারব বলে তো মারে নাই—এরে বলে কালপেবল হমিসাইড। তাতে ছেলে নাবালক। ভাববেন না।'

তখনে দোলনরা কি করবে তা আমরা জানি না। শান্তবাবুও অত বুঝে না। সে আমারে বলল, 'ওরাও বেঁচে গেল। মিলন তো ওদের গলার কাঁটা হয়েছিল। যে মেয়েরে বিয়া করেছে, সেও খুব বাজে মেয়েছেলে। এই হিসাব ভুল। দোলনরা সবংশে একজোটে মিলনের হত্যার শোধ নিতে নেমে পড়ে।

বাড়ির কারণে, না পৈতৃক সম্পত্তির কারণে, না মিলনের টাকা পয়সার কারণে জানি না। দোলনরা সুকুরে এক নিঃশংস খুনী সাব্যস্ত করার জন্য বৃহৎ টাকা ঢেলেছে।

তারা বড় বড় উকিল তো ধরলই, তা বাবদ আমাদের উকিলরেও হাত করল। নচেৎ সুকুর বয়স আঠার পূর্ণ হয়ে চার মাস প্রতিপন্ন হয়?

কর্পোরেশনের সার্টিফিকেট কারোই করাই নাই। তখন এগারো ক্লাসে পরীক্ষা হয়। সুকু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে নাই যে সার্টিফিকেটে বয়স থাকবে।

খুকির সাক্ষ্য আর সুকুর সাক্ষ্য —কিন্তু সুকু নিজেই বলে বসল, রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। সাক্ষীই বা তেমন ডাকল কোথায়? এক যা হেডমাস্টারই বলে গেলেন, এমন ঘটনায় একজন কিশোর ছেলে যে অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছে এতে আমি আশান্বিত। ঘরে ঘরে আবির দত্ত থাকলে মা-বোন-কন্যার লাঞ্ছনা

কমে যেত।

শান্তবাবু, বা সুকুর বন্ধুদের সাক্ষ্য ওরা শুনেই গেল। ওদের উকিল বলেছিল, 'তারে ঠেকানো বা আঘাত করা এক কথা, আর বারবার মেরে চলাতেই প্রমাণ হয়—'

বিচার বোধহয় আগেই হয়েছিল কোথাও। রায় বেরোল।

'সুকুর মা' কেন বলি না? বললে তুমি কানতা তখন। যে কাছে নাই তার নাম কেন বল?

কত অভিশাপ না দিলা। তখনের সকলই ভুলে গেছ, এখনো আফিসে সবাই মুখে সহানুভূতি দেখায়, আড়ালে বলে···

কি বলে?

আত্মীয়স্বজনে, দোলনেরা যা বলে।

খুকিও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। মেয়েছেলে না উশকালে বেটাছেলে কি অমনি নাচে?

দোলনরা তো রটাতে থাকল, খুকির সঙ্গে মিলনের বিয়ে দিতে ওদের উশকাচ্ছিলাম। মিলন বিয়ে করল বলে সেই আক্রোশে আমরা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছি। এ কথা বলার পরে পরে দোলনেরে কারা যে মেরে ধরে পাটপাট করল তা বলতে পারব না।

ওরা পুলিশ আনল।

আমার বাড়িতেও পুলিশ "শুধু জিজ্ঞাসাবাদ" করতে এল।

বললাম, আমি তো আপিসে, বড় ছেলে যাদবপুরে, বেলেঘাটা যেয়ে বিকাল সন্ধ্যার মুখে তার ভেড়ি আপিসের পিছনে মেরেছে তো? এখান হতে কোন না সাত মাইল দূরে। তবে আমিই কই। এ আমার স্ত্রী বা দিদির কার্য হবে। খুকিও তো মামাবাড়িতে। এদেরে ধরে নিয়ে যান। দারোগার মুখ আমসি হয়ে গেল। তখন করি না কি? সুকুরে দেখতে যাই, তার কান্না দেখি। আর নতুন, বড় উকিল ধরে উচ্চ আদালতে ছুটি। হাইকোর্টে সুবিচার সুকু যদি পায়।

পায় নাই। পায় নাই।

বড় বেদনা বুকে। আমার মত ল'-এবাইডিং সিটিজেন যা করতে পারে, সব করছি। কিন্তু ল' তো আমার মত মানুষদের দেখে না। কত মারদাঙ্গা, মেয়েছেলের ইজ্জৎ হানি, ওই মিলন করেছে।

কোন ল' ওরে শাস্তি দিয়েছে?

হাইকোর্টের রায়ও বেরোল, আদালতও বন্ধ হল। সেবারেই দোলনের দুর্গাপূজায় নিদারুণ মারামারি, প্যাণ্ডেলে আগুন, ওদের গাড়ি পুড়ল, সে অনেক কেলেঙ্কার যাকে বলে। দোলন তা মিলনের লোকদের দিয়েই পূজো ম্যানেজ করাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের মারামারি, শেষে ইট ছোড়া

চলল। ওদের বাড়ির একতলার একটা জানলার কাচ, গেটের আলো থাকল না। শান্তবাবু পরে বলল, 'দারোগাও ইট খেয়েছে।'

তা খেতে পারে, কিন্তু আমার ছেলে তো জেলেই থাকল। সে হুতাশন আমি নিভাই কি দিয়ে?

তারপর, দিনে দিনে, সকলই বদল।

আবির দত্ত তো আর দেখি না পাড়ায়। এখনে মেয়েছেলের অসম্মান সর্বত্র।

দোলনরা না কি বিরোধী দলে।

প্রতাপ তো তার দিনে দিনে বেড়েছে। নচেৎ, সকলের মুখে জুতা মেরে বয়েজ ক্লাবকে মিলন স্মৃতি ক্লাব করে?

মিলনের বউ আবার বড় করে ছবি ছাপায় মিলনের ছবি দিয়ে, 'ভুলিনি, ভুলছি না, ভুলব না' ল্যাখ্যা থাকে নিচে।

পাড়াও তো তেমন নাই আর।

তখনে সুকুকে সমর্থন করার মানসিকতা ছিল। এখন সে মানসিকতাই নাই। বরানগরে কোথায় সাঁতার কাটতে যেয়ে তোবলে আর বাঁশি ডুবে যাচ্ছিল। সুকু তাদেরে টেনে তোলে।

আবার নন্দন বাস চাপা পড়ত, আমাদের শচীন তারে বাঁচায়।

এ নিয়ে কোন মাতামাতি ছিল না।

এখন পরের প্রাণ বাঁচালেই হয় না। সে বীরত্বের পুরস্কারও পায়। যারা মিলন স্মৃতি ক্লাবে ধেই ধেই নাচে, তারা জানেও না মিলন লোকটা কেমন ছিল।

তখন সুকুর দণ্ডাদেশ শুনে বুক ভেঙে গিয়েছিল। এখন শুনি, বিচারপতিরাও ঘুষ খায়। অন্তত অনেকে খায়।

মিলনের বউয়ের আলাদা বাড়ি, গাড়ি, কোথায় পোশাকের দোকান, কোন গুরুভাই সঙ্গে থাকে শুনি।

কেউ মন্দ বলে না।

সকলই উলটাপালটা এখনে।

এর মধ্যে সুকু কোথায় ফিট করবে? ফেলতে তো চাই না, রাখবে কোথায়?

আমার ভাড়াটেই বলল, 'আপনার সেই লাইফার ছেলে ফিরছে, কিছু করবে না তো?'

সুকু, এ পাড়ার সমাজচক্ষেই এক 'খুনী'। খুনের পিছনের 'কেন' কারো মনে নাই।

'কেন'টা যেখানে ভুলে গেছে, সেখানে সুকু...

ভুলে যে যাচ্ছে, সেটা বছর পাঁচেক আগেই বুঝি। যখনে খুকিকে বললাম, 'বিজয়াতে তারে একটা চিঠিও দিলি না। সে বাড়ি বাড়ি করে...'

খুকি বলল, 'না বাবা। শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে আমি জবাব দিতে দিতে নাজেহাল।'

'তুই আর বিজিত তো।'

'নয় আলাদা থাকি। আছে তো সবাই। আসা যাওয়াও আছে।'

'তোরে কথা শুনায় ?'

'বলতে ছাড়ে কেউ ? আমি তো ভাবি নাই যে সুকু তারে একেবারে...'

আসার কালে পার্কে যেয়ে বসলাম। শান্তবাবু ক্লাবে আসে না, তবে পার্কে আসে। তিন নম্বর বস্তির ছেলে মাঝে মাঝে।

সেদিনও বসলাম। বললাম, 'অন্যরে কি বা বলব, খুকিই ভুলে গেছে, সুকু কেন অমন কাজ করেছিল। এইটা ভাবি নাই।'

'মনে রাখলেই যে বিপদ মোহনবাবু। ভুলে গেলে কেমন সুন্দর বাঁচা যায়।'

'আমার যে যাবজ্জীবন ! আমি ভুলি কেমনে ?'

'কিছু বলবার নাই। তবে আমি তারে ভুলি নাই। সে এলে বলব তারে।'

এরপরেই ঘরে এসে বললাম. 'দুজনেই হুতাশে মরতেয়াছি। চল গুরুমন্ত্র লই গিয়া। তাতে যদি কিছু ভুলতে পারি।'

'ভুলুম কেন ?'

'সর্বক্ষণ হুতাশন। জপেতপে, পুঁথিপাঠে, নিরামিষ ভোজনে, মন ব্যস্ত রাখব। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী ক্যানসারে মরল, পোলা বিদেশে মরল, মেয়ে জামাই বিমান দুর্ঘটনায়, সে বলে, 'অখন মন অত জ্বলে না।'

এক সময়ে রাগ উঠে, তখন সকলরেই মনে মনে গাল দেই। অহন তা পারতেয়াছি না।

সুকু। সুকু রে। তুই আমর সেই সুকু। কিন্তু সমাজ বল, সংসার বল, খুব, খুব অন্যরকম এখনে।

এ বাড়ি চার ভাগ করতাম। আমাদের এক, তোদের তিন। আমাদের আর তোর ভাগ বেচতে পারি যদি, দুই ভাগের টাকা নিয়া আমরা আর দিদি নয় আশ্রমে উঠব ! সে এক ভাগের টাকায়।

তোর ভাগ তোরে দিব। তুই অন্য কোথাও যাইয়া নতুন কইরা বাঁচ। আমরা তো রইলামই।

এই ভাল মনে হয়। গোটা জিনিস ভাঙা পড়ছে, জোড়াতালি দিয়া যেমন চলে চলুক।

আবিরের দাদা

জানতাম, আমি জানতাম, মা আর পারছে না। সুকুর জন্যে ভাবতে ভাবতে···ভাবতে ভাবতে...

আর তারপর দেখলাম, মা'র জন্যে সুকু যা করছে, তার সিকির সিকিও আমি পারতাম না। কী যত্নে নিয়ে যায় মাকে বাথরুমে, কী যত্নে সব করায়।

মা বলে, 'ছি ছি।'

সুকু বলে, 'অসুস্থ লোক আর ছোট বাচ্চা, দুই সমান, মা। ছোটবেলা আমাকে করাও নি সব?'

'তোদের পিসি ছিলেন...'

পিসি তো সুযোগই দেবে না। এখনও কাঁথা সেলাই করে, "সংক্ষিপ্ত কথামৃত" পড়ে...

মাকে খাওয়ায় কত যত্নে।

মা'র অসুখটা বাড়িটাকে সাময়িক বদলে দিয়েছে।

তপতীও অনেক সমঝে চলেছে। টি ভি তো একেবারেই বন্ধ। মেয়েরাও পা টিপে টিপে চলে।

আমিও কী স্বার্থপর হয়ে গেছি, কতদিন...তাই ভাবি। সুকু আসবে তা জানতাম।

কত সহজে বলেছিলাম, তোমাদের ছেলে, তোমরা বোঝো। আমি কী বলব?

জানি না, আমার এখনকার মনের অবস্থা কদিন থাকবে। ভাল সংকল্প বারবার করেছি। রাখতে পারিনি।

তপতীকে বিয়ে করে এখানে আনলাম কেন?

বাবা মা তো জানেও না যে আমার ফ্ল্যাট কবে শেষ হয়ে গেছে। যে কোন-দিন আমরা চলেও যাব।

মা যখন বলল, 'পয়সার তো পাহাড় জমিয়েছ। যাও না উঠে যেখানে চাও।' তখন তপতী বলছিল, আমারও মনে হচ্ছিল, বাড়ির ভাগ ছাড়ব কেন?

তবে এখন আমার চোখে সানগ্লাস বা টিন্টেড গ্লাস নেই। রঙিন চশমায় তো সবই রঙিন দেখায়। স্বীকার করা ভাল, রঙিন চশমায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন খুলে রেখেছি। আবার তুলে নেব।

তোমাদের ছেলে, তোমরা বোঝ। আমি কি জানি?' বলেছিলাম অনেকটা

নিষ্ঠুর হয়ে। মনে মনে যখন ভাবি, কোন সমাধানে পেঁছতে পারি না বলেই রাগ হয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭৪ সালে। আমার বয়স কুড়ি। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি হস্টেলে থেকে। শিবপুরে জায়গা পেলে শিবপুরেই যেতাম। যাদবপুরে গেলে আমিও রাজনীতি করব কিনা, বাবার ভয় ছিল।

অমূলক ভয়। আমি চিরকালই অরাজনীতিক। কেননা আমি কেরিয়ার করাকে ধ্রুবতারা বলে জানতাম। আমার বন্ধুবান্ধবও কমই ছিল। ভাল ছেলে, গ্রন্থকীট, অধ্যাপকদের দালাল। শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

সেদিন আমি এখানে। শীতকালে পাড়ার যে ফাংশান হয়, তাতে আসব না, এ আমি ভাবতে পারতাম না। পাড়ার পুজোয় থাকব না, ক্লাবের ফাংশানে আসব না, এ হয় না।

ফাংশানে আসার অন্যতম আকর্ষণ, সুকুর বন্ধু নন্দর দিদি রুবি। রুবি আর আমার গোপন প্রেম ছিল। যৌবন, প্রথম যৌবন! রুবির বাবা কোনদিন একটা ছাত্রের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিত না। আমরা পরস্পরকে না পেলে আত্মহত্যাও করতাম না নিশীথ আর রঞ্জনার মতো। আবার, দুজনে পালিয়েও যেতাম না।

দুজনের একজনেরও সে সাহস ছিল না, তবু আমরা প্রেম করতাম। ফাংশানের দিনও ওর সঙ্গে দেখা হল, আমরা গল্প করছিলাম।

এখনো ক্লাবের ফাংশান, পাড়ার পুজো, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সপ্তাহ ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।

ঈষৎ হেসে চাঁদা দিই। কক্ষনো যাই না।

কে খবরটা এনেছিল জানি না, হঠাৎ মাইকে শুনি শান্ত কাকার গলা, 'সুবীর দত্ত। বাড়ি চলে যাও। সুবীর দত্ত! বাড়ি চলে যাও।'

মা যে ফাংশানে, আমি মাকে খুঁজলাম না। দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম।

দরজা খোলা হাঁ করে। নিচে কিছু লোকের ভিড়। আমি দুটো তিনটে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠলাম।

খুকি আর্ত-কাঁদছে, কি বলছে, আমি ওদের ঘরের দিকে দৌড়লাম।

মিলনদা'র কপাল পিষ্ট, মুখ থেঁতলানো, আর রক্তাক্ত ইস্ত্রি হাতে সুকু।

শহরের বুকে নকশাল আন্দোলন দ্রষ্টার মতো দেখেছি বাইরে থেকে। এত কাছে এত রক্ত কখনো দেখিনি। সুকু যে এমন একটা কাজ করতে পারে, স্বপ্নে ভাবিনি কখনো।

খুকি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছিল, কি হয়েছে। আমার

মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, খুকি যখন ফাংশানেই যাবে, সন্ধ্যা অবধি বন্ধুর বাসায় সে কী করছিল ?

তার পরের প্রতিক্রিয়াই হল, ভয়ংকর স্ক্যান্ডাল। এখন পুলিশ আসবে, লোকজন...কেচ্ছা কেলেঙ্কারি।

আমার মাথা টলছিল। সুকু যেন কাকে বলল, 'দিদিকে...মিলনদা... দিদিকে' বলতে বলতে ও কেঁদে ফেলল। হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কা লাগল। ভীষণ ধাক্কা।

আমি ওর হাত থেকে ইস্ত্রি ফেলে দিলাম। বাথরুমে নিয়ে গেলাম। বললাম, 'সব ছেড়ে ফেল। গা ধুয়ে ফেল।'

দোলনবাবুর গলা শুনলাম, 'পুলিশ আসার আগে কিছু সরাবে না, নড়া.ব না।'

আমি সুকুকে বললাম, 'শুনিস না।'

পুলিশ যখন এল, তখন সুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমার হাত শক্ত করে চেপে বসেছিল। ভীষণ, ভীষণ জোর ওর কবজিতে।

'আমার ভয় করছে দাদা।'

'আমরা তো আছি।'

'কেন, কেন মিলনদা ও রকম···বলল আমার সামনে···দিদির কাপড় টানছিল··'

এই তো সমাজ, এই তো ব্যবস্থা। একটা লুচ্চা লম্পটের হাতে খুকি ধর্ষণ হয়ে যেত। ধর্ষিতা মেয়ে মৃতের সমান! তার বিচার হত না। মিলন বেরিয়ে যেত, খুকিকে বিয়ে করত না কেউ। আমরা ব্রাত্য হয়ে থাকতাম। হয়তো তাকে মরতেই হত।

বোনকে তো লাইনে নামিয়ে দিতে পারতাম না।

ধর্ষণটা হল না। লুচ্চা লম্পটটা খুন হয়ে গেল। মাঝখান থেকে ভাইটা হয়ে গেল লাইফার।

হাইকোর্টে হেরে যাবার পর বাবা কেমন মরিয়া হতাশায় বলল, 'তুই তোর কেরিয়ার করে বেরিয়ে যা সুবু, তোরে প্রতিষ্ঠিত দেখলেও জানব সবটাই লস নয়।'

আমিও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, কয়েক মুহূর্তের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সুকু আমাদের প্রত্যেকের মনে গুরুভার হয়ে চেপে আছে।

বাবা 'প্রতিষ্ঠিত' বলতে বুঝত সরকারি চাকরি। আমি তা মনে করতাম না।

দোলন ও শান্তু, ওরা একজোটে যা করল, সেটা তো অন্যায়। যাকে বলে প্রতিহিংসাপরায়ণতা। দোলন বলেই ছিল, জানি জানি মিলন লুচ্চা লম্পট

ছিল। তবে তা থাকলেই নস্করবাড়ির ছেলেকে কোন উড়ে এসে জুড়ে বসা বাঙালের ছেলে খুন করে চলে যেতে পারে না। না থাকল লাট। ভোড়িও আছে, সে মেজাজও আছে।

এরা সব কাকদ্বীপ-তেভাগার পর প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা লাটদার সেদিনের।

বেরিয়ে যে গেল, সে তো টাকার জোরে। বাবার রীডিং ভুল। টাকা থাকলে ল অ্যান্ড অর্ডারও তার, থানাও তার, জনমতও তার।

দেবীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই। কিন্তু তাকে কাউন্সিলার বানাল তো ওই দোলন। দিনে দিনে কি সুকৌশলে খেলে গেল খেলা! মিলন মেমোরিয়াল ক্লাব উদ্বোধন করে বলল, 'দেখ হে শান্তবাবু। লুচ্চা লম্পটের নামে ক্লাব হয় না।'

শান্তবাবু বলল, 'একটা হল, আরও হবে। তবে দোলনবাবু, চিরদিন সমানও যায় না। সুকু তো তোমাদের উপকারই করে গেলে। মিলন থাকলে তোমাদের উঠতে দিত?'

শান্তবাবু বলে, 'পয়সা আর চেনাশোনার জোরে ওঠার মধ্যে নৈতিকতা নেই।'

আমি ভাবি, সুকুর কাজের মধ্যে নৈতিকতা ছিল, তা তো ভুলতে চায় মানুষ। নৈতিকতা নিয়ে পড়ে থাকলে আর করে খেতে হত না।

বেপাড়ায় গিয়ে নয়, এ পাড়ায় বসেই আমি দেখিয়ে দিয়েছি আমি টাকা করতে জানি, রাখতে জানি, এবং দোলন নস্করদের পা না চেটেই। এ ভাবেই তো গুছিয়ে নিয়েছিলাম সব।

তপতীর একটা কথাই ছিল, 'তোমার খুনে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না।'

'রাখবে কেন? তুমি নিজের মতো থাকবে।'

সে ভাগ পাবে কেন এ বাড়ির?'

'বাবার বাড়ি। তিনজনই ভাগ পাবে।'

'বলো না তুমি হাইরাইজ তুলবে, ওদের সকলকে ফ্ল্যাট দেবে?'

'বাবা তাতে রাজি হবে না।'

'ওদের শেয়ারগুলো কিনে নাও। নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে আমরা এখানে হাই-রাইজ তুলব।'

এটা আমার মনোমত প্রস্তাব। আর এসব পরিকল্পনা যখন করি সুকুকে কোথাও রাখি না।

সবই উলটোপালটা হয়ে গেল।

এখন তো আমি আর সুকু রাতে একসঙ্গেও খাই। খাওয়ার পর কথাও

বলি।

তপতী পরিবেশন করে চলে যায়। সুকুকে উপেক্ষা করে আমাকে বলে, 'বাসনকোসন তুলে দিয়ে যেও, কেমন?'

'ঠিক আছে, তুলে দেব।'

তারপর তপতী সুকুকে বলে, 'মেয়েটা মোটে রাঁধতে জানে না। দেখেছ, কি বিস্বাদ রাঁধে।'

সুকু খুব সহজভাবেই বলে, 'বেশ তো রেঁধেছে। কেন আমার জন্যে কষ্ট করছ তোমরা!'

'না না, একটা বিপদের সময়…'

তারপর আমি আর সুকু বারান্দায় একটু বসি।

'সিগারেট নিবি?'

'আমি খাই না দাদা।'

'কি করবি কিছু ভেবেছিস?'

'ভাবছি। চাকরি পাওয়া তো '

'অসম্ভব।'

'কিছু তো করতে হবে। আমাকে কিছু করতে দেখলে বাবা, মা আর পিসি শান্তি পাবে। ধরে করে একটা ট্যাক্সি বের করতে পারলে…'

'চালাতিস?'

'শিখে নিতাম ড্রাইভিং। জেলে বসে তো এ সব আলোচনাই হত। বেরিয়ে কে কি করব। মানে…চেষ্টা করব।'

'ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি তো হতেই পারিস।'

'মা একটু ভাল হোক। দিদি কি এখানে নেই?'

'আছে নিশ্চয়। এখন মেয়েদের স্কুলও খোলা।'

'মাকে দেখতে এল না একবারও...'

'খুব তো আসে না।'

'কি ভাবছিস? কিছু বলবি?'

'না·· ভাবছিলাম, বাবারও তো বয়স হচ্ছে। বাড়িটার বিষয়ে একটা কিছু ভাবা দরকার।'

সুকু একটু হেসে বলল, 'তোর তো উচিত বাবার সঙ্গে আলোচনা করা। করলেই পারিস…তুই কি ভাবিস জানি না…আমার জন্যে কিন্তু কিছু ভাবার দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'তখন হাতে যা ছিল, এখন তার চেয়ে বেশি আছে। ভয় পাস না · কোথাও না কোথাও কোন একটা কাজ পেয়েই যাব। এটাও বুঝি যে আমি এখানে

থাকলে তোদের পক্ষে সেটা খুব অস্বস্তির কারণ। তাই দূরেই যাব।'

'কোথায় ?'

'জানি না। কিন্তু বাড়িতে আমার ভাল লাগছে না দাদা···সবাই আলাদা আলাদা···এর চেয়ে শানুদাদের বাড়ি অনেক ভাল। সবাই কৃতী···সবাই যে যার মত থাকে···সম্পর্কও ভাল···'

'সেই লম্বা ছেলেটি তো ? কোঁকড়া চুল···'

'হ্যাঁ· বড় ঘরের ছেলে · তুই ফ্ল্যাট কিনেছিস, না করাচ্ছিস ?'

'কে বলল তোকে ?'

'মা কাল বলছিল · '

'বাবা মা জানে ?'

'তাই তো মনে হল। সে তো খুব ভাল কথা দাদা। মা ভাল হোক...সব খুলে বল তোরা···আমাকে ধরিস না কোন কিছুর মধ্যে···'

'তোরও তো ভাগ থাকবে এ বাড়িতে।'

'বাড়ি বাবার। তোরা যা বলবি আমি তাই মেনে নেব। আমার জন্য ভয় পাস না। বউদিও ভয় পায়.. পাবার কথাও···কিন্তু তুইও কি ভাবিস...থাক। তুই 'না' বলতে পারছিস না।'

আমি বলতে চাইলাম, 'না সুকু ভাবি না। তোকে খুনি ভাবি না। আমার যুক্তিবাদী মন বোঝে। হঠাৎ কাজটা হয়েছিল। রাগে যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করছিল না তোর···হাতেও প্রচণ্ড জোর ছিল! কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির বাইরের মন সর্বদা ভয় পায়, হঠাৎ তোর তেমন সর্বনাশা রাগ হবে কি না।'

কিন্তু সুকু উঠে গেল।

না, মা ভাল হোক। বাবা মা-র সঙ্গে কথা বলে আমরা তো চলে যাই। সাততলায় তিনটে শোবার ঘর আর দুটো ব্যালকনি। ব্যানার্জি'রা মিলে মিশে ফ্ল্যাটগুলো করেছে তাই ওই দামে পেলাম। আমি ব্যানার্জি'কে অনেক পাইয়ে দিয়েছি, ও আমাকে বাড়ি পাইয়ে দিচ্ছে।

বলা যায় না, বলা যায় না, কখন সুকু ওরকম ক্ষেপে উঠবে।

ব্যানার্জি তপতীরই দাদা। কিন্তু ওকে আমি আত্মীয় ভাবতে পারি না. 'ব্যানার্জি' ভাবি।

দূরে, এ সব কিছু থেকে দূরে—যেখানে আমাকে সুকুর ছায়া নিয়ে বাস করতে হবে না।

আঙুর, বেদানা, কমপ্লান, সয়া-নাগেট, সয়া-মিল্ক টেবিলে রেখে শ্রীলা বলল, 'এখন মা'র শরীরে শক্তি দরকার। এত রোগা হয়ে গেছে।'

পিসি বলল, 'আহার ছারলে পোকপতংও বাঁচে না। আহার ছাইরা এমুন অবস্থা।'

'বাবা কোথায় ?'

'এট্টু বারাইল। বললাম, তুই ঘরে বইয়া দেহ নষ্ট করিস ক্যান ? হকল তো সুকুই করত্যাছে। তুই ঘুইরা আয়।'

শ্রীলা ঈষৎ অভিমানে বলল, 'দাদা দোকানে ফোন করেছিল। এত অসুখ তো বলেনি !'

সুকু বলল, 'তোকে ব্যস্ত করতে চায়নি।'

'আমার আর ব্যস্ততা কি ?'

শ্রীলা ভাবল, সুকু যদি বলে, 'আমি আসার পর একদিনও আসিসনি—চিঠিও লিখিস না—অথচ তোর জন্যে—'

সুকু বলল, 'একটা টি ভি পরিবারের গিন্নিদের তো ব্যস্তই থাকতে হয়।'

'দাদার ঘরে খুব টি ভি দেখছিস বুঝি ?'

'টি ভি এখন ভেতরের ঘরে। বউদি মেয়েদের নিয়ে দরজা বন্ধ করে, শব্দ কমিয়ে মাঝে মাঝে দেখে। মা দেখেই বা কি করবে।'

সুকু বলল, 'খুব নয়, একদিন—একটুখানি—বউদি তো মায়ের অসুখ থেকে টি ভি চালায় না।'

'টি ভি পরিবার কেমন হয় রে ?'

'ঝকঝকে। নেরোল্যাকের রং—দারুণ কিচেনে দারুণ ঝলমলে গৃহবধূরা তাদের দারুণ স্বামী ও দারুণ সন্তানদের জন্য দারুণ রান্না করে।'

'না না, কুকিং রেঞ্জ সেদিন কিনলাম।'

'কেমন বলে দিলাম দেখ।'

'নিশ্চয় বউদি বলেছে !'

'কেউ বলেনি।'

'সেজে এসেছে, ভীষণ সেজে এসেছে দিদি। অসম্ভব অচেনা মুখ, হালকা মেকাপ, ফুরফুরে চুল, অদ্ভুত সব সুগন্ধ।

'মা কথা বলছে না কেন ? মা। আমি খুকি।'

'বুঝেছি।'

'কথা বলছ না কেন?'

'কিছু বলার নাই। সুকু।'

সুকু বলল, 'তোরা বাইরে যা একটু। মা বাথরুমে যাবে।'

'বেডপ্যান—ইউরিনাল—'

'মা'র অভ্যেস নেই।'

শ্রীলা বেরিয়ে এল। পিসি বলল, 'বাইরেই বস্। বেশি কথাবার্তা বউ সহ্য করতে পারে না। মাথায় কষ্ট হয় অর।'

'সুকুই সব করছে?'

সুকু ছিল বইলা—সুকু কুন-অ-দিন মায়ের অসুখ দেখে নাই। সেদিনে ত ভেবাচেকা। তয় ডাক্তার হেই আনল।'

'আমাকে বলেনি দাদা, যে...'

বললেই বা কি হত? বিজিত আর আমার বিয়ে তো শর্তের বিয়ে। হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করব, কিন্তু সুকুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না শ্রীলা।

শর্ত করেই বিয়ে হয়। আমার যখন বলা উচিত ছিল, এমন শর্ত করে আমি বিয়ে করব না--আমি বললাম, 'ঠিক আছে'

এমন নয় আমার অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছিল। ছাব্বিশটা কোন বয়স নয়। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আট বছর এমনভাবে কাটিয়েছি যে বলতে পারি না। দিন নেই, রাত নেই, শুনতে হত মায়ের কথা, 'তোকে বাঁচাতে গিয়ে সুকু...তোকে বাঁচাতে গিয়ে...'

'দিদি, কি ভাবছিস?

'পিসির ঘরে চল সুকু।'

'আমি আর তুই...ও ঘরে যাব?'

'তোর সঙ্গে কথা বলব।'

বিজিতদা পছন্দ করবে না।'

'বল...তোর বলার অধিকার আছে...আমার জন্যে তোর...'

'দিদি, তুই কি জন্য আমাকে চিঠি লিখতে পারতিস না, কেন এতদিন আসতে পারিসনি, আমি বুঝি। শুধু একটা কথা বলব, সেদিন যা করেছিলাম, তার জন্য আমি অনুতপ্ত নই। নিজেকে আমি খুনী মনে করি না। চোদ্দটা বছর ধরে আমি ভেবেছি আর ভেবেছি। আমি মনে করি, একটা চেনা কুকুর যদি পাগল ও হিংস্র হয়ে ওঠে, তাকে মারা উচিত। আমি একটা কুত্তাকে মেরেছিলাম।'

'সুকু...একবার চল, বসে কথা বলি।'

'কিন্তু এসে দেখছি মা, বাবা আর পিসি ছাড়া তোরা আমাকে খুনী মনে মনে করিস। ভয় পাস।'

'আমি·· ভয়···পাইনা...'

'দাদা, বউদি, বাচ্চারা তো বটেই · আমি এলাম, প্রত্যেকে শিউরে উঠেছে, সিঁটিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমি এখানে ফিরছি, আপনজনদের মধ্যে ফিরছি, এই মনে করে...ফেরা এত কঠিন।'

'আমি তোকে ভয় পেয়ে সরে থাকিনি।'

'জানি। বিয়ে বাঁচাচ্ছিস। বাঁচা, তাই বাঁচা। বিজিতদা, 'দাদা' কেন বলছি, যাকে আমি চিনি না...বিজিতদার সঙ্গে তো তোর শর্তসাপেক্ষ বিয়ে। শর্তগুলো রাখ। কেন না আমি তোর কোন কাজে লাগব না। তোর বাড়িতে আমার কোন পরিচয় নেই। ধরে নিতে পারি, তোর মেয়েরা হয় জানে তাদের একটাই মামা—নইলে জানে তাদের ছোট মামা এমন কোন পাপ করেছে, যে তার নাম উচ্চারণও নিষেধ। কোনটা সত্যি?'

'আমি বলতে পারব না।'

'ভালই তো আছিস। তোর তো আমাকে বাদ দিয়ে চলতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। দাদারও মা'দের একটা ঘরে ঠেলে দিয়ে প্রায় সবটা দখল করে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তাই...ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই তোর।'

'কার কাছে চাইব? হাসছিস?'

'হাসব না? কার কাছে ক্ষমা চাইবি, আমি কি করে জানব? আমার কোন স্টেটাসই নেই। আমি তো তোদের জগতের লোকই নই। তবে বাইরেটা এত হিংস্র হয়ে গেছে আমি জানতাম না।'

'তুই আর পিসি থাকিস।'

'ওই লোকটাই কেমন করে যেন বদলায়নি। ফালতু লোক! আদ্যিকেলে মূল্যবোধ। বলে, ভাল কাজ করেছিলি, এমন ক'জন করে?'

'বাবা? মা?'

'বাবাও বিব্রত এবং অসহায়। মা অত্যন্ত কাতর, কিন্তু কী করবে। শরীরটা কেউ দেখিসনি ও'দের, তোরা...আচ্ছা! আমি তো জেলেই ছিলাম। মা, বাবা আর পিসিকে দেখার কর্তব্যটুকুও না করার শর্ত কি বউদি আর বিজিতদার?'

'থাক সুকু। আমি যাচ্ছি।'

'মাকে দেখতে আসিস মাঝে মধ্যে!'

'মা তোকে পেয়েছে···'

'না, প্রথমটায় বোধহয় মাকেও কেউ শর্ত দিয়ে থাকবে। না দিলেই

পারত। সেই টেনশানেই মা অসুস্থ হল। যাকগে, মাকে এ সময়ে দেখতে আসা ...আমি যখন থাকব...বুঝি না।'

'আমি...চলি...

'মা অসুস্থ হয়েই আমাকে '

'কি, বেঁধে ফেলল ?'

'ভাবিয়ে তো তুলল।'

'তুই থাকবি, ওদের দেখবি, এ বাড়িতে...'

'আমি কতটা পারব দিদি ? আমি তো কাজও করি না কিছু...'

'করবি...সময় কি চলে গেছে ?'

'তুই বল্...আমার সময় কি আছে ?'

সুকু কাছে এসে হাতে হাত বুলিয়ে সস্নেহ গলায় বলল, 'একটা কথাও আমি রাগ করে বলিনি, বুঝলি ? বিজিতদাকে বুঝিয়ে বলিস, মা বড় অসুস্থ ...নিশ্চয় বুঝবে।'

শ্রীলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সুকু অপ্রস্তুত। শ্রীলাকে জড়িয়ে পিসির ঘরেই নিয়ে এল।

'কি হচ্ছে। দিদি ! এই দিদি ! কাঁদে না। বাবা এখনি এসে যাবে... এই।'

'আমাকে ...অনেক...'

'বুঝেছি, বুঝেছি। চোখ মোছ।'

'তোর সঙ্গে চিঠির সম্পর্ক রাখাও...'

'জানি ! দেয় না, বিজিতদা তো ভাল লোক...সব জেনেশুনে তোকে বিয়ে করেছে...সম্মানে রেখেছে...নিজেও ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে...'

'শুধু তোর ব্যাপারে এত...'

'এটাই স্বাভাবিক দিদি। মধ্যবিত্ত মানুষকে অনেক মেনে মেনে চলতে হয় ...ধর না কেন, মিলনদা'র সঙ্গে যে ঘুরত...মতীন সে হরি সাউকে খুন করেছিল...কিছু হয়নি অবশ্য...মতীনকে পুজো প্যান্ডেলে দেখে আমরা কি ভয় পেয়েছিলাম ? এমন তো হয়ই...'

'জানি না। বউদির কেমন দাদা, তার বিরুদ্ধে তো বউ পুড়িয়ে মারার কেস কিছু জেল খাটল ! দিব্যি আসে যায়। শুনি জামিনে বেরিয়েছে...কেস চলছে...'

'ওদের হিসেবে সেটা হয়তো অন্যরকম ব্যাপার।'

'তুই তো বউদির মতই কথা বলছিস। বউদিও বলে, প্রমাণ করতে তো পারছে না। কেসও চলছে ...আমরা মনে করি ওটা দুর্ঘটনা।'

'যাদের একেবারে জানি না, তাদের নিয়ে আমি কথা বলব না।'

'বউদির ব্যাপারটা বলছি।'

'সে হয়তো মনে করে আমার ব্যাপারটা অন্যরকম...'

'সরি! তোর কেস নিয়ে বার বার উল্লেখ...'

'না না···তুই যাবি না এখন?'

'যাব। মা-র সঙ্গে একটু কথা বললে কি মা-র কষ্ট হবে?'

'কথা তো কমই বলছে। ডাক্তারের মতে মা আগের চেয়ে ভাল আছে। প্রেসারটা কেন্ট্রোলে রাখলে...'

'থাক! যাব না। ঘরটা রং করলে...এমন ম্যাড়মেড়ে দেখায় না, তোরও ভাল লাগত।'

'মা ভাল হোক। তুই—তোরা ভাল থাকিস।'

'তুইও।'

শ্রীলা চুল আঁচড়ে নিল, মুখ মুছল। বলল, 'আবার আসব একদিন।'

সুকু নীরব।

'পিসিকে বলে যাই।'

'পিসি মা-র ঘরে বসে আছে।'

'ফল-টলগুলো দিস।'

'দাদাও আনছে ফল। এত দরকার ছিল না।'

মেনকা বলল, 'চা খেয়ে যাবে না? চা তো করছি।'

'না, থাক—'

শ্রীলা উঠে পড়ল।

বিজিত বলল, 'ও বাড়ি গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।'

'তোমার ভাই এসেছে, তারপরেও?'

'হ্যাঁ। কেননা মা যথেষ্ট অসুস্থ। আর মা যে এতটা অসুস্থ, তা তুমি বলনি আমাকে।

'তোমার দাদাই বলতে বারণ করেছিল।'

'কেন?'

'তুমি বিচলিত হবে—হিস্টিরিয়া করবে—'

বিজিত নিরুত্তাপ গলাতেই বলল সহজভাবে। শ্রীলা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'ও ভাবে তাকিয়ে আছ যে?'

'ভাবছি ১৯৮২ সালে বিয়ে, এটা ১৯৯৪—এত বছরে হিস্টিরিয়া আমি কতবার করেছি।'

বিজিত জামা ছাড়ছিল। বলল, 'ভাইকে চিঠি লেখা নিয়ে—'

'হ্যাঁ—সেই একবার। কিন্তু আমার প্রসঙ্গে হিস্টিরিয়া কথাটা তুমি প্রায়ই বলে থাক।'

'আজকের কথাটা অন্য শ্রীলা।'

'কী কথা ?'

'থাক পরে হবে।'

'না। এখনি হবে।'

'মেয়েরা এসে পড়বে।'

'তুমি ভাল করেই জান ওদের নিয়ে যাবে ওদের পিসি।'

'হ্যাঁ, আমাদেরও তো যাবার কথা—'

'কথাটা কি, এখন বলতে হবে।'

'সহজ কথা। বিয়ের আগেই বলেছিলাম, ওই ভাইয়ের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ রাখতেও পারবে না। সে ক্ষেত্রে তুমি আজ গেলে—কাল সে আসবে—না শ্রীলা, না !'

শ্রীলা তিক্ত হেসে বলল, সন্তু এ বাড়িতে কোনদিন আসবে না। নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'সেটা সে জানে ?

'এটা তারই কথা।'

'মনে থাকলে ভাল।'

'আর আমার মা অসুস্থ হলে আমি দেখতে যাব বিজিত। তোমার অনুমতি নিতে পারব না।'

'আবির থাকার সময়ে না গেলেই নয় ?'

'সে তার বাবা মা-র কাছে এসেছে। আমি আমার মাকে দেখতে যাব।'

'যেও, তাই যেও। আশ্চর্য একটা বাড়িতে বিয়ে করেছিলাম বটে—.

'সেও আগ্রহ করে। নিজেই গিয়েছিলে বাবাকে মাকে বলতে।

'সে জন্যে কি কিছু বলেছি আমি কখনো ?'

'না, "আশ্চর্য বাড়ি" বললে তো।'

'তোমার দাদা ছাড়া কার সঙ্গে কথা বলা যায় ?'

'বাবা মা-র কাছে তো তুমি যাও না।'

'সম্ভব নয় শ্রীলা, বিশ্বাস করো। ও'রা শুধু ওঁদের ছোট ছেলের কথা ছাড়া…'

'এমন একটা ঘটনা ও'দের জীবনে কি ভয়ংকর অবস্থা ঘটিয়েছে, আর কি বলবেন ?'

'আরেক ছেলেও তো আছে।'

'তোমার মা-বাবার তো আরও দুটি ছেলে আছে। তারা তোমার চেয়ে অনেক সচ্ছল। তোমাকেই বা তাঁদের সব কাজ করতে হয় কেন?'

'সব ছেলে কি সমান হয়?'

'নিজেই উত্তর দিলে। তোমার দাদারা—তোমার মা-বাবার প্রতি কোন কর্তব্য করে না বলেই তোমার ওপর চাপ। তাঁদের তুমি আছ।'

'না না, তুমিও যথেষ্ট···'

'থাক্ বিজিত, থাক। যথেষ্ট হয়েছে। এত বছর বাদে তোমাদের জন্যে আমি কিছু করেছি জানলে—তোমাদের মুখে শুনলে···বলা যায় না, আমি পাগলও হয়ে যেতে পারি।'

'তুমি এত রিঅ্যাক্ট করবে জানলে—'

'কথা ঘুরিও না। আমার দাদা যদি মা-বাবাকে দেখত—ওরা ছোট ছেলের কথা এত বলত না—তুমি বোঝ না, না বুঝতে চাও না?'

'যে ছেলে লাইফার—'

'ওই যে বললাম, নিজের বাইরে বোঝ না কিছুই—না বুঝেই কি চমৎকার চলে গেল—আমার বাবা-মা-র এক ছেলে তথাকথিত কৃতী সন্তান—সে বাপ মাকে দেখে না—আরেক ছেলে জেলে—বাবা-মা-র অবস্থা বুঝতে পার?'

'না না এ আমি মানতে পারি না। তপতীর জনাই তোমার দাদা—হাসছ?'

'বড় দুঃখে হাসছি। ছেলে অকর্তব্য তো বউয়ের দোষ, এ তো সবাই বলে। ছেলে কর্তব্য করে চলে, তাতে বউয়েরও সহযোগিতা থাকে, এ কেউ বলে না।'

শ্রীলা হেঁটে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে—ব্যাগটা রাখল,—চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'ছেলে বাবা-মাকে টানলে—তবে তো বউ সহযোগিতা করবে। দাদার কোন—থাকগে।'

'যাক—সুকুর সঙ্গে—'

'মা-র কাছেও যাব, ওর সঙ্গেও দেখা হবে। সে এখানে আসবে না।'

'যাক—তাহলেই নিশ্চিন্ত।'

'সুকু—আমাদের—দাদাদের—টি ভি বিজ্ঞাপনের দম্পতি মনে করে! যা তার কাছে মূল্যবোধহীনতার পরিচয়।'

'এ ওর ঈর্ষার কথা। একটা খুনের আসামী—'

'মনে রেখো, ওই খুনটা ও আমার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে করে। না কি বলবে, গেলে যেত ইজ্জত, খুন করল কেন?'

শ্রীলার চোখে চ্যালেঞ্জ।

বিজিতের মনে অস্বস্তি।

'তা বলবে না ?'

'না। গেট রেডি শ্রীলা। মিতারা অপেক্ষা করবে। বুলটির জন্মদিন—প্রেজেন্টও কিনতে হবে...'

'ও রাজস্থানী পোশাক চেয়েছিল, কিনে এনেছি। তুমিই যাও।'

তুমি যাবে না ?'

'না। একটা বছর নাই বা গেলাম...অর্ণবের টাকার দম্ভ আর ইডিয়টের মতো কথাবার্তার রং তরং নাই শুনলাম···গেলে তোমার দাদাদের, বউদিদের, মিতার সঙ্গে সাজানো সাজানো কথা নাই শুনলাম...জুরাসিক পার্কের ক্যাসেট নাই দেখলাম···আমার ভাল লাগছে না।'

বিজিতের মুখ প্রায় হাঁ হয়ে গেল। আসলে সে শান্তিপ্রিয়, পরিবার কেন্দ্রিক, আত্মতুষ্ট লোক—খুব রাগ বা অসভ্যতা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এত বছরের মধ্যে একবারও শ্রীলাকে সে 'না' বলতে শোনেনি। এই প্রথম।

'তুমি...কি করবে ?'

'স্নান করব।'

'এমন অবেলায় ?'

'আমার তো ঠাণ্ডা-গরম জলের ব্যবস্থা আছে, হেয়ার ড্রায়ার আছে, স্নান করতে অসুবিধে কি ? স্নান করব, শুয়ে থাকব, বই পড়ব, যা ইচ্ছে করে করব।'

'শিউলিও নেই···'

'তাকে তো ছুটিই দিয়েছি। কেউ খাবে না। তাকে আটকে রাখি কেন ?'

'তোমার জন্যে কিছু নিয়ে আসব ?'

'কিছুই করবে না বিজিত। তুমি যাও, আমি স্নান করতে যাচ্ছি।'

'কি আর বলব...সাবধানে থেকো···'

'বাড়ি তো গ্রীলে ঢাকা···কোলাপসিবল গেট···সব সুরক্ষিত···বিপদ হবে কেন ?'

'যা হোক, দোকানে রজতকে বলে যাব।'

'তাই বলে যেও।'

'জানি না মিতাকে কি বলব।'

'যেতে ইচ্ছে করছে না তো বলতে পারবে না। বল, মাথা ধরেছে।'

শ্রীলা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। টি ভি পরিবারই বটে। মেয়েরা শালিনী ও মালিনী ছিল—রিচা আর রিয়া হয়ে গেছে। সুকু বলল, টি ভি পরিবার। কিন্তু বিজিত শিলিগুড়িতেও 'সুখশয্যা'র শাখা-দোকান খোলার পর—'কৃত্তিকা' হোটেলের চেইনের অর্ডার পাবার পর—ঘর, বসার ও খাওয়ার ঘর, দুটি বাথরুমে, রান্নাঘর, সব তো 'ডিজাইনার' পত্রিকার ছবি

দেখে বানানো হয়েছে।

বানাতেই হয় সুকু—মাঠে নেমে গেলে দৌড়ে চলতে হয়। গাড়ি একটাই—আমি মা-বাবার কাছে যাইও কম—গেলেও নিই না। কিন্তু আর কোনদিকেই ত্রুটি নেই।

এখনও দোকানে গিয়ে, চুল বাঁধা বা সাজগোজ করা, বা শরীর মাসাজ করা রপ্ত হয়নি। মিতা তো করে।

বিশ্বাস কর, বিয়ের সময়ে বিজিতের এত রমরমা ছিল না। দিনে দিনে বেড়েছে। যে জন্য বিজিত ও ওদের পরিবারের ধারণা, আমি খুব পয়মন্ত মেয়ে।

তোর দিদি। আবার পয়মন্তও! আমিও তো তাই বিশ্বাস করেছি। নিশ্চয় তাই হবে।

আসলে আমিও খুব অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম তার পরে পরে।

সেদিন...তুই বাড়িতে না থাকলে আমাকে হয়তো আত্মহত্যাই করতে হত, জানি না। মিলনদা তো ছেড়ে দিত না। আর যে মেয়েরা রেপ হয়, তাদের নিয়ে তো সকলের বিপদ।

মিলনদা মাঝে মাঝেই পথেঘাটে গায়ে পড়তে চেষ্টা করেছে,—জোরে হেঁটে চলে এসেছি বাড়ি। আবার নিজেকেই বলেছি, ছোটবেলা থেকে দেখছে আমাকে, নিশ্চয় অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই, আমি নিজেই ভয় পাচ্ছি।

তুই ছোট, আমি বড়। কিন্তু খুব ধারালো তো কোনদিনই নই। খুব আত্মসচেতনও নই। তবে ক্লাস নাইনেই বুঝেছিলাম, বয়স আন্দাজে আমার শরীর বড় বেশি ভরন্ত পুরন্ত। যে জন্যে বিয়ে বাড়ি গেলে বড় বেশি নজর কাড়তাম। সুন্দরী ছিলাম না, হয়তো তেমন ফর্সাও নয়, কিন্তু মেয়েরা বলত, অ্যাট্রাকটিভ।

ওই আকর্ষণ করার ক্ষমতা থেকেই তো আমাদের বাড়িতে সর্বনাশ শুরু।

তোকে ধরে নিয়ে যাবার পর কতকাল মুহ্যমান হয়ে থাকতাম। কতকাল!

কেননা, 'এক হাতে তালি বাজেনি'—'ওর দোষ কি নেই?'—এ সব কথা শুরু হয়ে যায় কিছুকাল বাদেই।

দেবী বউদি তো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে জঘন্য সব ভাষায় গাল পাড়ত।

সেশান কোর্টের রায় শুনে মা কি কাঁদতে কাঁদতে বলেনি, 'কী সর্বনাশ না হল তোর জন্যে...'

ভাবতাম কোথায় যাই, কোথায় লুকাই, কি করি। পিসিকে বলেছিলাম, 'সহ্য হয় না পিসি। বি এ পাশ করে কোথাও কাজ পেলে চলে যেতাম।'

পিসি বলেছিল, 'সুকুর জন্যেই সবাই পাগল পাগল—তোদের দাদা তো বরাবরই এড়ো এড়ো, ছাড়া ছাড়া—তুইও চলে গেলে আমরা কি করব?'

পিসি বলত, 'উলটা পুরাণ হইয়া গেল। মিলনের এত বড় পাপটা দেখে না কেউ—আমাদেরই গালায়। ঘোর কলি, বুঝছস খুকি?'

পিসি তো মন্দিরে যেত, দোকানেও যেত, সন্ধ্যায় বেরোত ঠাকুরের ফুল কিনতে। বলত, 'বউ বা মুখ লুকায় ক্যান? তর বা মুখ কালাবন্ন ক্যান? আমি মাথা উচা কইরা বেরাই, বেরামু। আমাগো পোলা দোষ করে নাই। পাপীরে শাস্তি দিছে।'

সুকু, ঠিকই বলেছিস তুই। পিসির মূল্যবোধ আদ্যিকেলে, পিসি একটা ফালতু।

সত্যি, পিসির মতো কে বা আছে।

আমার অবস্থা তো অন্যরকম ছিল সুকু। তুই যা করেছিস, তাকে অন্যায় সেদিনও ভাবিনি। আজও ভাবি না। তোর জন্যে আমি বেঁচে আছি, অনেক দাম দিয়ে অনেক কিছু পেয়েছি—এ জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা বলতে তুই দিবি না।

তুই ঠিক বুঝেছিস, আমি আমার বিয়েকে বাঁচাচ্ছি অনেক আপস করে! সে সময়ে বি এ পাশ করলাম, চাকরি পেলাম না। বাবা-মা-র অবস্থা দেখছি। দাদা কাজ পেল। যেন আরও সরিয়ে নিল নিজেকে। আমাদের অবস্থাটা বোঝ্।

তুই যে কাজ করেছিলি, সেটা তোর দিদির ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে, এ কথা দোলনবাবুরা লোককে ভুলিয়ে দিতে থাকল।

মানুষ, এখনকার মানুষ তো যা বোঝাবে তাই বোঝে।

আমরাই বা কি ব্যতিক্রম বল? বিজ্ঞাপন যা বলে তাই করি, সেই শ্যাম্পু-সাবান-পাউডার-শাড়ি-চটি কিনি—সেই বাসনকোসন সংসারের জিনিস! খবরের কাগজ যা ভাবায় তাই ভাবি। মাথা খাটাতে ভুলে গেছি অনেককাল।

তোর ব্যাপারটাতেও কি জন্য'টা এ ভাবেই ভুলিয়ে দেওয়া গেল—রয়ে গেল একটা বীভৎস হত্যার কথা। তুই একবার মারতেই মিলনদা পড়ে যায়। প্রথম চোটেই কপাল বসে যায়। তারপর তুই কয়েক সেকেণ্ড যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলি - আমি চেঁচাচ্ছি, তোর হাত ধরে টানছি—কিচ্ছু ছোঁয়নি তোকে।

ওই বারবার মারাটাই তো তোর বিপক্ষে গেল। কিন্তু আমি জানি, তুই তোর মধ্যে ছিলি না অথবা নিজের হাতকে থামাতে পারছিলি না।

এই তো হল সুকু। না চাকরি, না বন্ধুদের কাছে প্রিয় থাকলাম, না মামাবাড়িতে কেউ পছন্দ করে—তোর মতো আমিও তখন ভীষণ অবাঞ্ছিত সকলের কাছে! গানের স্কুলে যেতাম, খুব জোর করেই। কিন্তু সে জন্যেও মনে খুব জোর করতে হয়েছিল। মা একদিন বলল, 'খুকিকে বিয়ে দাও।'

দাদাকে বলল, 'তুইও একটু দেখ।'

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সুকু। কিছু কিছু যোগাযোগও এসেছিল, কিন্তু কিছুই হচ্ছিল না। এমনি করতে করতে বয়স ছাব্বিশ হতে চলল।

দাদাও দেখলাম, বিয়ে করল।

মা বলল, 'বোনটার গতি করে তবে যদি...'

দাদা বলল, 'কে এগোবে, মা?'

আমি দাদার বউভাতের দিন বাথরুমে গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম সুকু। মনের জোর থাকলে কিছু একটা করতাম হয়তো। সে জোর থাকলে কিছু একটা করতাম হয়তো। সে জোর তো ছিল না।

বাবাকে বলেছিলাম, 'আমাকে কোন আশ্রমে পাঠিয়ে দাও না বাবা।'

গানের স্কুলে মিতাকে পেঁছে দিত, নিয়ে যেত বিজিত। তুই তো জানিস, ও আমার চেয়ে নয় বছরের বড়। কোনদিন মুখ তুলে দেখিওনি ওকে।

মিতা একদিন বলল, 'আমার ছোড়দা তোকে যদি বিয়ে করে, তুই বিয়ে করবি? দেখ, এ কথাটা আমি বলতে চাইনি, কিন্তু ছোড়দা ছাড়ছে না।'

মিতা আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। খুব কটকটে মেয়ে। আমি বললাম, 'আমাকে? তিনি জানেন না?'

'জানে। জেনেই বলছে।'

'ঠাট্টা করেছেন মিতা।'

বিজিত ঠাট্টা করেনি। ও একদিন ক্লাসের পর যেচে এসে আলাপ করল। কয়েকদিন বাদে বললাম, 'আমাদের বাড়ি যাবেন, বাবাকে বলবেন।'

'আপনার মতটা জানলে হত।'

আমি বললাম, বাবার মতই আমার মত। তবে আমার বাবা পয়সা খরচ করতে পারবে না। আর, আমার ভাইয়ের কথা তো জানেন।'

বিজিতের টাকার দাবিও ছিল না, তোর কথাও জানত। ও বাবাকে বলে. কাজকারবার করতে করতে আর দুবোনের বিয়ে দিতে বয়স হয়ে গেছে। আমাকে দেখে ওর পছন্দ হয়েছে খুব। ও নাকি ঘরোয়া, সভ্য, শান্ত মেয়ে খুঁজছিল।

না, দাবিদাওয়া করেনি। বরযাত্রীদের খাওয়াতে বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, বাড়িতেই আমি কথা বলে নিতে চাই।

কথাবার্তা বাড়িতেই হয় সুকু।

আমি বলেছিলাম, 'মিতা তো খুশি নয়। বাড়িতে বা কেউ খুশি হবে কেন?'

বিজিত বলেছিল, 'আমাকে সময়ে বিয়ে দেয়নি, পরে ঘাড়ে দায়-দায়িত্ব চাপল। এখন আমি যাকে বিয়ে করব, ওরা মেনে নেবে।'

'ওঁদের সঙ্গে থাকতে হবে ?'

'আমাদের বাড়িতে কেউ কারো সঙ্গে থাকে না। দাদা ছোড়দা সব পাশাপাশি, আলাদা। বাবা, মা আর মিতা, তা মিতার বিয়ে হয়ে যাবে। আমি দোকানের উপরে থাকি। সাইকেলের দোকানে চোট খেয়েছি শাড়ির কারবারে চোট খেয়েছি। এখন এই কারবারটা চলছে...দাঁড়িয়ে গেছে।'

'আমার বয়স...'

'আমার প'য়ত্রিশ···এ বয়সে কি খ'ুকি বিয়ে করব, না দোকানের ডামি ? আমি ভাল তো ভাল, বেয়াড়া তো বেয়াড়া...অনেকদিন ভাল হয়ে থেকেছি এখন নিজের কথা ভাবছি।'

'বেশ !'

খ‍ুব, খ‍ুব কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম আমি।

'তোমাকে আমার বাপ-মা-র সঙ্গে থাকতে হবে না। তাঁরা যেমন আছেন, ভাল থাকেন। কাউকে নিয়ে বসবাস করার লোক তাঁরা নন। তবে আমারও শর্ত আছে একটা।

'কি ?'

'তোমার ভাই আবিরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখা চলবে না, কোনদিন না।

আমি বলেছিলাম, 'রাখব না।'

'তার কোন উল্লেখ অবধি চাই না।'

'করব না।'

আমি শ‍ুধ‍ু আমার কথা ভেবেছিলাম স‍ুকু, শ‍ুধ‍ু আমার কথা।

বারো বছর কম সময় নয়। দিনে দিনে ব‍ুঝেছি, বিজিত এমন কাউকে খ'ুজছিল, যে বাধ্য থাকতে বাধ্য।

বাধ্য থাকতে বাধ্য স‍ুকু—কেননা সে অনন্যোপায়, অনন্যগতি। আমি মেনে নিয়েই আছি।

তোকে চিঠিতে বিজয়ার ভালবাসা জানাতে গিয়ে যে কাণ্ড হয়—তখনি বাবাকে বলি, আমি চিঠিপত্র লিখতে পারব না।

বিজিত তার কথা রেখেছে। আমি আলাদা থাকি, কখনও সামাজিক অন‍ুষ্ঠানে দেখা হলে দ‍ু'পক্ষই ভদ্র ও শিষ্ট থাকি। ওর মা-বাবা কিছ‍ু অসচ্ছল নন। নিজের বাড়িতে থাকেন, ভাড়া পান একতলা থেকে—বাবা পেনশান পান--এ সব আছে। কিন্তু দমকা খরচে হাত পাততে হয় বিজিতের কাছে। অবএব ছোটছেলেকে ওঁরা অসন্তুষ্ট করেন না।

বিজিত, ওর মাপমতো হয়তো ভালওবাসে আমাকে। এবং, ওর স্থির বিশ্বাস, আমার জন্য ওর ব্যবসা বাড়ছে।

ও আমাকে জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সবই দিয়ে চলে। পুজোয় বাবা, মা দাদা, বউদি, দাদার মেয়েরা, পিসি, সকলকে যাতে দামি কাপড় জামা দিই, সেদিকে খেয়াল রাখে। টাকাও যথেষ্ট দেয়।

আমাদের দুটি মেয়ে, স্কুলে পড়ে। শর্তাধীন বিয়ে হিসেবে দু'জনেই শর্ত রেখে চলতে চেষ্টা করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে।

বারো বছরের সম্পর্ক, আমারও ওর প্রতি কোন বৈরিভাব নেই।

কিন্তু বারো বছর ধরেই তুই আমার মনে থাকিস, স্বপ্নে কাছে আসিস, ক্লাবের জার্সি পরা তোর ছবিটা কাছে থাকে, কেউ জানে না।

এই আমার বিয়ে সুকু। একেই আমি বাঁচাচ্ছি।

ভীষণ জলের শব্দ কেন

শ্রীলা নিজের মধ্যে ফিরে এল। শাওয়ার খোলা, জল বয়ে যাচ্ছে কতক্ষণ ধরে?

শ্রীলা তো জলের নিচেও দাঁড়িয়ে নেই—একটু দূরে।

জানালার কাচের বাইরে আলো। রাস্তার আলো। অর্থাৎ সন্ধ্যা হয়েছে।

শ্রীলা শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। এত বছর বাদে সুকুর জন্যে কাঁদতে লাগল।

আবির

দাদা কোন যেন রং কোম্পানির নানা রঙের নমুনা ছাপা কাগজ দিয়ে বলেছিল, 'আগে তোর ঘরটা হবে, পরে মা'দের ঘর।'

আমি বললাম, 'একেবারে সাদা চুনকাম, দাদা। তাতে আলোও উজ্জ্বল দেখায়, পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।'

এখন আমাদের ঘরটা ঝকঝকে সাদা, দরজা জানালা হলদেটে সবুজ। দু'দিকে দুটো টিউব আলো, পাখাটায় নতুন রং। খাট আলমারি সব পালিশ, ঝকঝকে।

যে ঘড়িগুলো সময় জানত না, ক্ষমাপ্রার্থীর মতো চেয়ে থাকত, তারা নির্বাসিত।

একটি ব্যাটারিচালিত বড় দেয়াল ঘড়ি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একরকম বাজনাও বাজায় সময়ও ঘোষণা করে।

সবচেয়ে বদলে গেছে বাথরুমটা। দেয়াল ঝকঝকে সাদা, নতুন কল, মেঝেটা খরখরে যাতে পিসির পা পিছলে না যায়।

মা দেখে ভীষণ খুশি।

হ্যাঁ, মা হেঁটে এসে ঘর দেখেছে। মা এখন অনেক ভাল। একা বাথরুমে যায়, মাথা ঘুরে যায় না। উঠে মাটিতে বসে খায়। দিদি আর একদিন দেখেও গেছে মাকে।

মাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম আমাদের ঘরে। বললাম, 'সব সাদা করে দিয়েছে মা।'

'ভাল। খুব ভাল।'

এখন এ ঘরে বসে থাকলে মনেই হয় না, কোনওদিন এখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছিল।

আলমারির গায়ে লাগানো আয়নাটা যখন ঝাপসা ছিল, মনে হতো যে কোনও সময়ে দেখা যাবে চৌদ্দ বছরের সুকুকে।

এখন আয়না ঝকঝকে। মাঝে মাঝে তাতে আমাকে দেখতে পাই। মাংসপেশী সবল, চামড়া টান টান, ছাঁটা চুল, খদ্দরের পাঞ্জাবি, আর পাজামা পরা এক অন্য সুকু, চোখের চাহনি যার দুর্বোধ্য।

মিস্ত্রিরিরা ঝপাঝপ কাজ করে দিয়ে চলে গেল। আলমারিটা টেনে সামনে এনে দিয়েছিলাম। একজন বলল, 'দারুণ শক্তি তো আপনার। কি চওড়া কবজি!'

দাদা পরে বলল, 'টানাটানি করিস না। হঠাৎ লেগে যাবে?'

'না, লাগবে কেন?'

'কি দেখিস অত? এরা পাকা লোক। বড় বড় কাজ ধরে। নেহাৎ চেনাশোনা বলে...'

মা ভাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির জীবনটা একেবারে আবার রুটিনে ফিরে যায়নি। এখনও দাদা আর আমি একসঙ্গে খাচ্ছি, বুঝতে পারছি মা'র এটা ভাল লাগছে।

বউদি রোজ একবার মাকে জিজ্ঞেস করছেই, 'কেমন আছেন আজ?'

কিন্তু কয়েকদিন হল মেয়েদের রেখে এসেছে বাপের বাড়ি।

দাদার মেয়ে দুটোর সঙ্গে ভাব করবার একটুও চেষ্টা আমি করিনি। বউদি তাহলে আঁতকে উঠত। আমার ডান হাতটা সম্পর্কে বউদি অত্যন্ত শঙ্কিত। বেচারা! দাদা কেন ওকে নিয়ে চলে যায় না?

দাদার মেয়েরা এত একরকম দেখতে (বয়সে দু'বছরের তফাৎ আছে। যে আমি চিনতে পারি না কে পিয়া, কে পিউ।

এমন আশ্চর্য বাচ্চা আমি দেখিনি।

একে তো একরকম জামা, জুতো পরে, ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যায়, মনে হয় দুটো দম দেওয়া পুতুল চলে গেল। হাসতে, লাফাতে, খেলতে দেখি না কখনো। দু'জনের মুখভাবই ভীষণ অসন্তুষ্ট। ওদের মা'র মেজাজ অনুগত।

দশ আর আট বছরের দুটি মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে তিনটেয়। চারটেয় একজন ঝলমলে মহিলা আসেন, ওদের পড়ান। মহিলা চলে গেলে বউদি ওদের নিয়ে বসে। সাতটা থেকে ন'টা ওরা খেতে খেতে টি ভি দেখে। তারপর ঘুমোয়।

বউদি আর দাদা ওদের ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে বসে। রাত অবধি কাজ করে।

বলেছিলাম, 'দাদা। তুই তো যাস পার্ক স্ট্রিট। এখানে নিচের অফিসটা কিসের?'

'বিল্ডিং আর কনস্ট্রাকশানের কাজ তো? সবটা অফিসে হয় না।'

'তুই বউদিকে এখানে এনে তুললি।'

'বাড়ি ভাড়াটা বেঁচে গেছে। বাচ্চাদের বড় করে নেয়া গেল। এখন অবশ্য...'

'ওরা খেলে না?'

'স্কুলে খেলে বই কি।'

ফ্ল্যাটটার কথা আমি জেনে গেছি বলে দাদা বলে, 'ওখানে গেলে তো লা মার্টিনিয়েরে পড়বে। সে জন্যে তৈরি করতেই হবে! আসলে শিক্ষাই সব। এডুকেশনে খরচ করাটা ইনভেস্টমেণ্ট।'

এই চিন্তাভাবনাকে এখন বলা হচ্ছে আজকের যুগের ভাবনা, স্বার্থপর ভাবনা।

কিন্তু এটা তো চিরকালই ছিল। অন্য মলাটে পরিবেশিত হতো, অন্য রকম শব্দে লেখা হতো, অন্য রকম কাগজে মুদ্রিত হতো।

আমার ঠাকুরদাদাদের সমকালে যৌথ পরিবারে একজন রোজগার করত, সবাই ঘাড়ে বসে খেত। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে তো তাই পড়ি।

আমার বাবাকে তা করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর সময়েও যে লেখাপড়া শিখে কাজকর্ম করবে, সে আয়টা যৌথ পরিবারার্থেও খরচ করবে এটা ধরে নেয়া হতো!

বাবা যখন দাদাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায়, তখন হরদম বলত, 'আমি যা পারলাম, করলাম। সুবু দাঁড়ালে সে-ই ভাইকে টেনে উঠাবে।'

'বোনকে' বলত না। বাবা, এখনকার বাবাদের মতই বিশ্বাস করত, কন্যাকে বিবাহ-ই দিতে হয়।

দাদা মেয়েদের কেমন এডুকেশন দেবে শেষ অবধি, তা জানি না। তবে

বুঝি, এখন বাপ-মা সন্তানের শিক্ষার কথা বেশি ভাবে। মায়েরা তো অসম্ভব পরিশ্রম করে। মায়ের ঘরের জানালা দিয়ে বা ছাতে দাঁড়ালেই দেখা যায় ইউনিফর্ম পরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে আকুল জননীরা, স্কুল-বাস, চার্টার্ড বাস ইত্যাদিতে তুলে দিতে ব্যস্ত। পাড়াতে ছবি আঁকার, নাচ-গান শেখার স্কুলেও বেজায় ভিড়! স্কুলের পরেও পড়া, পড়ার পরেও ছবি আঁকা--ছবি আঁকার পরে নাচ-গান শেখা—এদের শৈশবে ছুটি বলে কিছু নেই।

সম্ভবত দিদির মেয়েরাও এ ভাবেই তৈরি হচ্ছে। কত কিছু না জেনে, প্রত্যক্ষ না-দেখে কতগুলো বছর কেটে গেল। এমন কতগুলো বছর যাবে কে জানে। মাঝখানের ফাঁকটা বড়ই লম্বা। সব শূন্যস্থান পূর্ণ করা যায় না।

মা'কে আমিই বললাম, 'ছাতে যাবে একটু? খোলা বাতাসে হাঁটবে?'

'উটব কি করে?'

'আমি নিয়ে যাব।'

'কেউ উঠে না ছাতে···নোংরা হয়ে আছে···'

'আমি পরিষ্কার করে ফেলেছি সব।'

আগে রেখে এলাম মাদুর। তারপর মাকে সযত্নে ধরে ধরে ছাতে নিয়ে এলাম।

'কতকাল পরে উঠলাম!'

'উঠলেই পারতে। হাঁটতেও পারতে। বেরোনো কেন ছেড়ে দিয়েছ জানি না। কতজনের ছেলে কতরকম হয়। তাদের মা-বাবা কি বাইরে বেরোনো ছেড়ে দেয়?'

'সর্বদা মনে হত···'

'কাজটা তো আমি করেছিলাম মা। এটা তো আমাদের জীবন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। এটা নিয়েই বসবাস করতে হবে। কারো হাত বা পা কাটা যায়, তা নিয়েই বসবাস করে।'

'তুই এত বুঝাস, যেন কতই বড় বয়সে।'

'পিসিকে দেখতে পাও না? বলে দু'দিনের জীবন কাঁদব কত? কেন বা কাঁদব?'

'হ্যাঁ· দিদির মনের জোর খুব। দেখলও তো অনেক। যত বাঁচো, তত দেখ।'

'আর মা! দাদার বিষয়ে তুমি মনকে এত শক্ত করেছ কেন? দাদা তো সব করে দিল, তুমি যা যা বলেছিলে।'

'এখন তোর একটা ব্যবস্থা করে···?'

'কি ব্যবস্থা করবে?'

'এত চিনা জানা···কোন একটা কাজ···'

'কেমন করে, মা ? সবাই জানে তার একটাই ভাই, সেও একটা লাইফার।'

'যত জনা ছিলি, সকলেই কি ?

'একেকজন একেকরকম পরিবারের তো। যে যার মতো আছে, থাকবে।'

'আমার মন বলে তুই এখানেই থাক···কিছু একটা কর···মন তো বলে সংসার কর···'

'এই বয়সে ? না মা, তা হয় না।'

'তোর জীবনটা কাটবে কি ভাবে ?'

'কেটে যাবে। টবগুলো সব ফেলে দাওনি দেখছি।'

'ওই আছে কয়টা। কে গাছ লাগায়, কে জল দেয়···তোর দিদিরই শখ··'

ছিল। দিদির খুব শখ ছিল। জল টেনে টেনে দিতে হতো আমাকেই। শখ ছিল, গাছ ছিল, ফুল ফুটত অনেক।

অনেক, অনেক কাল আগে।

'কাল একটু বেরোব মা।'

'কোথায় যাবি ?'

'বাড়িতেই তো সবসময় থাকি···পাড়াতেই বেরোব। তোবুলেও বলছিল. বাড়িতে বসে গেলি কেন ? তোবুলে দোকান দিল কবে ?'

'অনেক দিন। চাকরি, চাকরি, চাকরি···কোথাও কিছু পেল না, বাসার নিচে দোকানই দিল।'

'ভাল চলে তো ?'

'খুব চলে। চাকরির চেয়ে ভালই হয়েছে। তুই বাসার নিচে একটা দোকান দিতে পারিস না ?'

'দেখি। কিছু তো করব। এখন যা করবে তাতেই পুঁজি দরকার।'

'শান্তবাবুই তোর কথা খুব বলত। আসতও।'

'আর আসে না ?'

'সিঁড়ি উঠতে পারে না, পায়ের হাড়ে জানি কি হয়েছিল···পার্কে আসে ···থাকে তো তিন নম্বর বস্তিতে···'

শান্তকাকার বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ও'র একতলা বাড়িটা একরকমই আছে। বাড়ির পাশের মাঠটা এখনও আছে, আশ্চর্য।

শান্তকাকা বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রণাম করতেই বললেন, 'এতদিনে সময় হল ?'

'বলেন কেন ! মা এমন এক...'

'শুনলাম তোমার বাবার কাছে।'

'আপনার পায়ে কি হল ? মা বলল, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারেন না ?'

'আমার পা।'

শান্তকাকা ঈষৎ হাসলেন। আশ্চর্য, বয়স বাড়েনি শান্তকাকার। সেই অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল—পরিষ্কার কামানো মুখ—পরিষ্কার, ঘরে কাচা লুঙ্গি ও গেঞ্জি, পায়ে রবারের চটি। মুখের ভাবও একই রকম।

'ঘরে চলো সুকু, ঘরে বসি।'

আমরা ঘরে এলাম।

দেয়ালে কাকিমার ছবি, ছবির গলায় শোলার মালা। শান্তকাকা সব কথাই হেসে বলেন। তেমনি ঈষৎ হেসেই বললেন, 'আজ দশ বছর...'

'কি হয়েছিল?'

'বড়লোকের অসুখ। ক্যানসার...তবে সতীলক্ষ্মী মানুষ ছিল, বেশি কষ্ট দিল না আমাকে, হাসপাতালে একমাসও থাকেনি।'

'আপনি একাই?'

'মেয়ে আসত। তবে জামাই তো এখন পাটনায়। এখন আর আসতে পারে না।'

'আপনি হেঁটে ঢুকলেন, হাঁটা দেখে তো...'

'উঁচুতে উঠতে লাগে।'

'কি হয়েছিল?'

'ওই ক্লাবের নাম বদল নিয়ে আপত্তি করলাম। মিলন মেমোরিয়াল ক্লাব কেন হবে...ক্লাবের জনক বলতে গেলে শান্ত নন্দী। দোলনের ব্ল্যাক বুকে চলে গেলাম। একদিন কে বা কারা চাকু ছুঁড়েও মারল। আন্দাজ করে ছিটকে সরে যাই তো...পায়ে গেঁথে গেল...মনে হয় শিরাই জখম। ভেব না সুকু। আমি ভাল আছি।'

'এক রকমই আছেন।'

'জীবন সংক্ষিপ্ত সুকু, নানা রকম হই কি করে? চা খাবি?'

'কে করবে?'

'আমিই করব। দেখ্, কেমন কিচেন আমার। দাঁড়া, দাঁড়া তো!'

দাঁড়ালাম। শান্ত কাকা 'তুই' বলেছেন, কৃতজ্ঞতায় কান্না পাচ্ছিল।

'না, বডিটা রেখেছিস। সে সময়ে তো তোব্‌লেরও ভাল বডি ছিল...'

'ভেবুলেরও ছিল...'

'ভেবুলেরও নাম করিস না। দোলনকে তেল মেরে...'

'ভেবুল!'

'হ্যাঁ, একা সেই বদলে গেছে। তোব্‌লে, বাঁশি, নন্দ...মানে তোদের ব্যাচটা ঠিকই আছে। কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'তোব্‌লে। একই রকম আছে। মানে ব্যবহারে...'

'দোলন তো সকলকেই খেতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। নন্দর তো কথাই ওঠে না। সে আনন্দর ভাই।'

'নন্দ কি করে?'

'কলেজে টাইপিস্ট বা কেরানি। কাগজ বের করে, আমার সঙ্গে যোগ রাখে।'

'আর বাঁশি?'

'ওষুধের দোকানে ওষুধ বেচে।'

ঘরের সঙ্গে একটা ছোট ঘর...কাকিমার যেটা ঠাকুরঘর ছিল, সেখানেই শান্তকাকার কিচেন। ঝকঝকে পরিষ্কার।

চা করলেন সযত্নে, বয়াম খুলে চিঁড়ের নাড়ু দিলেন। বললেন, নাড়ুটা কেমন?'

'ভালই তো।'

'এখানেই কয়েকটা মেয়ে চিড়ে মুড়ির নাড়ু, ছোট মোয়া তৈরি করে দোকানে দেয়।'

'আপনি কি করেন শান্তকাকা?'

'চাড্ডা কোম্পানির গ্যারেজে হিসাব রাখতাম, আর জীবনবীমার এজেন্সি। চলে যায়—তোর কাকিমা খুবই বিবেচক ছিল। যুক্ত বীমায় তার টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে কিছু সুদ আসে...'

'কি করছেন...মানে...'

'যা করতাম।'

নির্মল ও শুভ্র হেসে বললেন, 'তিন নম্বরের ছেলেদের খেলাধুলো শেখাই —আমরা তো ক্লাবও করেছি এখানে। এবার তোর কথা বল্।'

'বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্য বলবি। জানিস, ছেলেদের বলি, মেয়েছেলের অসম্মান বেড়ে গেছে। কিন্তু আরেকটা সুকু এল না যে পাপীকে শাস্তি দেয়।'

'শান্তকাকা...'

'জানি সুকু। মানুষ 'কেন'টা ভুলে গেছে, খুনটাই জানে। কি বলবি বল্? দিনকাল এখন এ রকমই। চারদিকে দোলনরা সব খেয়ে নিচ্ছে তো! আর দোলন এখন সব দলেই। তারা অনেক।'

'এই বস্তির সমর্থন পান?'

'আরে! এ জমি তো বাহাত্তর কাঠা। দাম বিস্তর। দোলন তো কম চেষ্টা করেনি এ বস্তি উচ্ছেদ করতে। কিন্তু পারেনি। নন্দর যোগাযোগ লেখালেখি, লোকজন যাওয়া আসা...দুটো সংগঠন এল···হেন-তেন···বস্তির লোকজন বা ছাড়বে কেন? সরকার প্রাইমারি স্কুল দিয়েছে...সুলভ শৌচালয় করেছে···

জলও বসেছে টিউবওয়েল···স্থানীয় লোকাল কমিটিও জড়িত···মোট কথা এরা দোলনের বিরোধী। আমি এদের সঙ্গে বহুকাল আছি না?'

'বাড়ি তো আপনার নিজের···'

'কি দাম ছিল সুকু? চুয়ান্ন সালে বাড়ি করি · কি দাম ছিল? প্রথমে একটা ঘর · ক্রমে ক্রমে...তোর কাকিমা···জানিস তো সবই।'

'ভাসা ভাসা···যাগ গে।'

ভাসা ভাসা নয়। আমরা···পুরনো এলাকার লোকরা, মোটামুটি সকলে সকলের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানি। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। কাকিমা শান্তকাকাদের জ্ঞাতির জ্ঞাতি। বিধবা হয়ে শান্তকাকাদের 'নন্দী ভবন' বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। তরুণী, নিঃসন্তান বিধবার অবস্থা খুব নিরাপদ ছিল না। কে না কি করতে চেষ্টা করে—শান্তকাকা তাঁর সেই দাদা বা কাকাকে পেটান—কাকিমাকে নিয়ে চলে আসেন ভবানীপুর থেকে অনেক দূরে। বাড়িতে ত্যাজ্যপুত্র হন—লেখাপড়া ম্যাট্রিক অবধি—খেলাধুলা, ব্যায়াম নিয়েই থাকতেন।

'কাকিমা কখনো বিরক্ত হতেন না, আমরা যা জ্বালিয়ে যেতাম ও'কে।'

'বিরক্তি সে জানতই না। দেখ্ না, এত ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস, উপোস, হেন-তেন · সে লোকই গলব্লাডারে ক্যানসার হয়ে এমন করে মরল।'

'কাকিমার পুজোপাটে আমরা খুব উৎসাহ দিতাম।'

'খাওয়াত যে!'

'তাঁরা গেলেন কোথায়?'

'মেয়ে নিয়ে গেছে।'

'যাক। দিন কত বদলে যায়, তাই না?'

'তার নামই তো জীবন।'

'আমাদের বাড়িতেই জীবনটা আমি পর্যন্ত এসে আটকে গেছে।'

'স্বাভাবিক।'

'এসে থেকেই মনে হচ্ছে সকলকে বিপদে ফেলেছি। কি করবে আমাকে নিয়ে, তাই নিয়ে—'

'হ্যাঁ, সুবু—শ্রীলা—ওদের তো আলাদা জীবন হয়েছে। তোর পিসি?'

'পিসি—আপনার মতই—একরকমই আছে।'

'মোহনবাবু আর তোর মা বিশেষ ভাবিত?'

'সে তো বটেই। তাঁরা চান, আমার জীবনে কোন ভাল পরিণতি হোক।'

'সে তো হবেই। তুই তো কোন ভুল করবি না, সে আমি জানি। আমার আর তোর ভাল পরিণতি আটকাবে কে? আমি ক্লাবে নেই, কিন্তু পরিণামটা কি খারাপ হয়েছে?'

'না শান্তকাকা, না। খুব ভাল হয়েছে।'

নন্দ, বাঁশি, ভেবুল—না ভেবুল না, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বললে—'

'এই কথা ? আমি জানিয়ে দেব তোকে—'

'কি, শান্তকাকা ?'

'অনেকদিন আনন্দ করি না সুকু—ওদের জোটাতে পারি তো এখানে এক রবিবার ফিস্‌ট করা যাবে। তোরাই রাঁধবি, তোরাই খাবি, আরে, হিরোর তো একটা ওয়েলকাম দরকার !'

'ওরা আসবে ?'

'নিশ্চয় আসবে।'

'তাহলে উঠি আজ ?'

'চল্, তোকে আমার পাড়া দেখাই ! এখন অবশ্য ঘরে নেই কেউই। কাজে বেরিয়েছে—বিকেলে সব জমজমাট।'

'বিকেলেই আসব একদিন।'

'হ্যাঁ—তা তো পারিসই—চল, তোকে এগিয়ে দিই।'

'না না, আগাবেন কেন ?'

'তবে—দাঁড়া।'

শান্তকাকা আন্তরিক উদ্বেগে বললেন, 'তোর আসার ফলে বন্ধ জলে ঢিল পড়েছে তো।'

'কি রকম ?'

'দোলন—সাপের মতো লোক—সে এটা ভাল চোখে দেখছে না।'

'কিছু বলছে।'

'অস্বস্তিতে পড়েছে।'

'পড়ুক না।'

'অনিষ্ট করতে পারে।'

'আপনার যেমন করেছে ?'

'সে রকম—তার চেয়ে বেশি—হয়তো কিছুই করবে না—তবু !'

'বুঝলাম।'

'তুই কি থানায় গিয়েছিলি ?'

'না শান্তকাকা।'

'যা, বাড়ি যা। ভাবিস না। আমরা আছি। আর বাবাকে বলবি, যে বিকেলে যেন পার্কে আসে।'

'আপনি এখনো যান ?'

'নিশ্চয় যতদিন পারব, যাব।'

'সেটা নিরাপদ আপনার পক্ষে ?'

'একলা যাই না সুকু, ছেলেরা যায়। বস্তির ওপর হামলা ঠেকাতে ঠেকাতে ছেলে কিছু তৈরি হয়েছে। সর্বদা সতর্ক। মার খেতেও পারে, দিতেও পারে। জেলে ছিলিস, অনেক কিছু জানিস না।'

'কিন্তু জানতে তো হবে। না জানলে টিকব কী করে? বাইরেই তো বাঁচতে হবে, জেলে তো নয়।'

'দ্যাট্স দি স্পিরিট।'

আমি চলে এলাম।

ফেরার সময়ে ইচ্ছে করে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এলাম। না, পাড়া চেনার কোন উপায়ই নেই। ক্লাবের জায়গাটা শুধু অপরিবর্তিত আছে। খানিকটা মাঠ, পাঁচিল ঘেরা এখন—ঘরটার চাল বাংলো প্যাটার্নের। গেটে তোরণের ওপর লোহার অক্ষরে লেখা, 'মিলন মেমোরিয়াল ক্লাব।'

তোবুলের দোকানে দাঁড়ালাম।

'কিছু নিবি, সুকু?'

'পয়সা নিয়েই বেরোইনি।'

'পিসিমার জন্যে মোয়া নিয়ে যা।'

'পয়সা আনিনি রে।'

'পরে দিস, নিয়ে যা। মাসিমা কেমন?'

'অনেক ভাল।'

'তোকে পেয়েই—'

'চলি রে। ব্যস্ত দোকানীর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।'

'তোকেও দোকান-টোকান করতে হবে। গ্রাজুয়েট তো। আমি যেমন গ্রাজুয়েট! গ্রাজুয়েট হয়েছ, কি চকরি নেই।'

'ছেলে কি পড়ছে!'

'এখন তো ক্লাস ফোর। ওই একটিই ভাই। বড় হলেই কোন টেকনিকাল স্কুলে দেব।'

'বউ রাজি হবে?'

'হ্যা হ্যাঁ—বুঝদার মেয়ে—'

খুব গুছিয়ে দোকান করেছে তোবুলে। স্টেশনারি। শুকনো খাবার-দাবার, বিস্কুট, কেক—ওপাশে সিগারেটের দোকান, বোর্ড ঝুলছে, 'পান চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' ইত্যাদি।

বাড়ি চলে এলাম।

মা, বাবা, পিসি যেন উৎকণ্ঠায় অধীর।

'সুকু এলি?

'কেন, কী হয়েছে?'

'কখন বেরোলি, কখন ফিরছিস—'

'ওঃ! শান্তকাকার বাড়ি যাব তো বলেই ছিলাম। শান্তকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে—'

বাবা বলল, 'যাক! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

খেতে বসে বললাম, 'তোমরা ভাব কি? রাতদিন বাড়িতে বসে থাকলে চলবে? তোবুলে দেখ, গ্রাজুয়েট—সে দোকান দিয়েছে। কাজকর্ম অত সহজে মিলবে না মা!'

'ভয় হয় সুকু।'

'ভয় না পেতে চেষ্টা কর। আমি কারো সঙ্গে মারদাঙ্গা করছি না, আমাকেও কেউ মারছে না।'

'ঠিক আছে, যা দেখি!'

'তুমি ঠিক সময়ে খেয়েছ? ওষুধ খেয়েছ?'

'স—ব খেয়েছি।'

'টেনশান কোর না—ভাল থাকবে।'

পিসি বলল, 'ল', এট্টু ঘুমা!'

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বললাম, কি ঝপাঝপ কাজ করল দেখেছ? যদি রাজামিস্ত্রীর কাজটাও শেখাত জেলে।

'ওখানে তো কামও শিখায়।'

'শেখায়।'

'হেই সকল কাম করন যায় না।'

'না পিপি আদ্যিকেলে যন্ত্রপাতি সব—'

'তর বাপ মা ডরায়, বুঝি বা দোলন কিছু কইরা বসে।'

'আমি তো তার কিছু করিনি। বরঞ্চ, তোমার কাছে যা শুনি,—তার পথের কাঁটাই সরিয়ে দিয়েছি।'

'অরা ডরায়, আমি ডরাই না। অহন হেই মাথার ঘায়ে পাগল পাগল... মিলনের বউরেই ডরায়...হেয় তো বর্ষার ধুলধুলি লতার নাখাল ফনফনাইয়া উঠত্যাছে···অহনে লীডার। বাসা হাঁকাইছে কি। সিনিমায় বারি যেমুন ··

'পিসি! এত খবরও রাখো।'

'ক্যান রাখুম না? নিচের ভারাইটা বউ—অহন আসে না তোরে দেইখা—'

কি সুনাম তোমার সুকুর। ভয় খায়?'

'কে জানে! তয় ভারাইটার তো সন্দ বাতিক। সোন্দর বউ! বিশ্বাস পায় না।'

'খুব সুন্দরী বুঝি ?'

'ওই আছে যেমুন তেমুন। সে আছিল তর জ্যেঠি। হাইটা গেলে পদ্দ ফুটত।'

'সে তো পাঁচ সন্তানের মায়ের ছবি।'

'কি বলল ভাড়াটে বউ।'

'কিসের ছার্টিফিকট লইতে অর বারি গিছিল,—সে কি ঠাট বাট···সে কি বসাইয়া রাখো···মুটকী ঘরে বইয়া ঘন্টা বাজায়, তারপর আইয়া একজন বলে, নাম ল্যাখেন···কি কামে আইছেন তা ল্যাখেন···ইনির সময় কই, বরো কম··· বাপুরে। ধ্যান গরমেন হইয়া বসছে।'

'তোমার ঘুম পায় না।'

'এই তগো বরো দোষ। রাতে অহন পাখা ঘুরে। কাথা জরাইয়া ঘুমাই ···আবার দিনে ঘুম ?'

'আমাকে ঘুমোতে বললে তো।'

'পুলিশের নাখাল জিরা করস যে।' বলেই পিসি ঘুমিয়ে পড়ে। মুখে পরম সন্তোষ। তার মহন, মহনের বউ, তাদের ছেলে মেয়ে, সবাই ভাল আছে · সুকু ফিরে এসেছে···বুড়ি মহা খুশি। পিসি না থাকলে কি করতাম ?'

"পুলিশের নাখাল জিরা করস যে।" বলল পিসি। শান্তকাকাও পুলিশের কথা বলছিল। থানার ব্যাপারটা শানুদারা বুঝিয়ে দিয়েছে।

বাইরে লাইফারের অনেক শত্রু। নিজের ডাঁটে না থেকেও তো, নানাজনা জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে।

রাজনীতিক দলরা চাইবে, তুমি তাদের হয়ে মস্তানী করো। লাইফার মানেই সমাজবিরোধী বানিয়ে ফেলার সুযোগ। এখন তো নিচের পর্যায়ে কে সমাজ-বিরোধী, কে রাজনীতিক, সব সময়ে সর্বত্র তফাৎ থাকে না।

খাতায় নাম না লেখালে, অর্থাৎ দলে সামিল না হলে তুমি শত্রু হয়ে গেলে।

থানা চায়, তুমি অপরাধে ছিলে, অপরাধেই থাকো। নইলে তুমি সন্দেহ-ভাজন।

শানুদারা নিশ্চয় থানায় যাচ্ছে না।

আমি তো যাবই না, যাবার কথাই ওঠে না।

আমার কাছে কোনও অ্যাপ্রোচ আসেনি। কোনওদিক থেকেই নয়।

শান্তকাকা বলল, 'আসবে না ঝপ করে। তোর বাবা, মা, দাদা, দিদি, মুখ লুকিয়ে বেড়িয়েছে। তুই তো মাথা তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছিস। এরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।'

'বোঝাটা সহজ হত কী করে ?'

'যদি এ দোরে ও দোরে দৌড়াতিস। আর···তোদের বাড়ির একটা সুনাম আছে। এখনকার মানুষ বোঝে টাকা। সে বিজিতেরও আছে, সুবুরও আছে। তা ছাড়া সকলকে চাঁদা দিয়ে টিয়ে সুবু ব্যাপারটা বেশ সহজ করে নিয়েছে।'

'হ্যাঁ···মানুষ টাকা বোঝে।'

'সুবুর ব্যবসা, ওর বউয়ের ভাই 'ব্যানার্জি কনসালটেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার'—এসবের ওজন নেই? সুকু এলে কাজ দেবে তো। ও বলল, এদের তো পুলিশ রেকর্ড নেই।'

'এ কথাটা সত্যিও বটে।'

'দূর দূর। সুবু হয়তো তার দিক থেকে ঠিকই বলছে। কিন্তু লাইন থাকলে জেল খাটা আসামী হরদম কাজ পায়ও, করেও।'

'সবই প্রায় অজানা। জেল থেকে বেরোব বলে পাগল হয়ে উঠেছিলাম··· জেল একটা আলাদা পৃথিবী···সেখানকার সব কিছুই আলাদা···আবার জেলে থাকলে বাইরের জগতের এত পরিবর্তন জানা যায় না। কাগজ পড়ে বা টিভি দেখে কতটা জানা যায় বলুন? যাক গে। আমাকে কেউ ঘাঁটাচ্ছে না।'

'মুখে মুখে এটা তো খুব রটেছে যে তুই দানবীয় শক্তি ধরিস—তোর রাগ বিপজ্জনক—হাতের জোর সাংঘাতিক—সেই টেবিল ফাটাবার গল্পটা হরদম করি তো।'

'এসব বলে টলে—তুই সেদিন এলি—তা বাদে থানাবাবুর কাছেও গেলাম—না না, ভদ্র ছেলে···'

'বললাম, আমাদের হিরো ফিরে এসেছে।'

'ও সি ভির্মি খেল।'

'একদম নয়। বলল, কেসটাই তো অন্যরকম—আগেকার কোন ক্রাইম রেকর্ড নেই—আমি বললাম অমন বংশের ছেলে——ক্লাবের জুয়েল—ক'টা ছেলেকে জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছে—বস্তিতে আগুন নেভাতে তো আগে ছুটত—এটা একটা—হয়ে গেছে—খুকির ব্যাপারটা বললাম।'

'জানত না?'

'কি জানবে? জেনে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এখন কি করছে? বললাম, কিছু করবে। বলল, দোলনবাবুদের বাড়ি যাচ্ছে না তো? বললাম, কথাই ওঠে না। সে আমার কাছেই আসে। ব্যাপারটা বুঝলি।'

'বুঝলাম।'

'দোলন ছুতো খুঁজছে, সে সামান্য অছিলা পেলেও থানাতে জানাবে তুই সন্ত্রাস দেখাচ্ছিস—তারপর—?'

'আমাকে কেলিয়ে দেবে।'

'অত জোর তার নেই। এখন মিলনের বউ অনেক ক্ষমতাশালী। পিছনে বড় বড় লোক। তাছাড়া দোলন আর শক্তি তো খুনটুন করায়নি—সে ছিল মিলন।'

'আপনার ঠ্যাংটা।'

'শিক্ষা দিচ্ছিল। শিক্ষা তো নিলাম না। ইদানীং নেমন্তন্ন করছে নানা ফাংশানে—যাইনি। তোকে কেন ঘাঁটাচ্ছে না বল তো?'

'জানি শান্ত কাকা।'

'কি যে ব্যবস্থা করি তোর।'

'জেল থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছি। এ পুঁজিতে বাদাম তো বেচা যায়—'

'অবশ্য যায়। তোর কাকিমাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে যখন বেরোই, আমাদের কাছে ন'টাকা চোদ্দ আনা ছিল। বেঁচে তো আছি। তবে—দোলনরা নজর রেখে যাবে, এটা জানিস।'

'আজ চলি।'

'পরের রবিবার এখানে—দুপুরে...'

'ওরা আসবে?'

'তুই আয় তো। এখন তেমন রাক্ষুসে খাস না তো?'

'না—এখন একেবারে—'

ভাবতে ভাবতে ফিরলাম। মা যতই হাহাকর করুক, আমি এখানে থাকলে ওরা কোন বিপদে না পড়ে।

মা-বাবা-সুবীর-আবির-শ্রীলা

শ্রীলা বলল, 'পারিবারিক সম্মেলন কেন?'

সুবু ঈষৎ শুকনো গলায় বলল, 'বাবা জানে।'

বাবা বললেন, 'কথাগুলি আমারই। তোমাদের মা আর আমি অনেক ভেবে—'

শ্রীলা বলল, 'বউদি কোথায়?'

'তপতী বলেছে, তোমাদের ব্যাপারে তোমরা কথা বলো। আমি এতে থাকতে চাই না।'

'আর পিসি?'

'পিসি বলেছে, তোদের ব্যাপার তোরা ঠিক করবি। আমি তো মহনকে ছাড়তে পারব না।'

'তিন বুড়োবুড়ি এক জায়গাতেই থাকব।'

শ্রীলা বলল, 'বৈষয়িক আলোচনা। তাতেই বিজিত বলল, যাও যাও।'

সুকু ঈষৎ হেসে দেওয়ালে হেলান দিল। বলল, 'বলেছিলাম, এ সব আলোচনায় আমাকে বাইরে রেখো।—'

বাবা রাগতস্বরে বললেন, 'তোমাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। আমার কাছে তো নয়। সারা জীবনে একটা কাজই করেছি, যথাসাধ্য চেষ্টায় এই বাড়িটুকু। এর বাইরে কি বা আছে আমার—পেনশন ছাড়া ?'

সুবু বলল, 'অন্তত পি এফ থাকত—ফিক্‌স্‌চ ডিপোজিটও—'

সুকু তেমনি হেসেই বলল, 'কেমন করে থাকত দাদা ? আমি তো সব ধ্বংসের কারণ হয়ে গেলাম—'

বাবা বললেন, 'কি বল তোমরা ? ছেলের জন্য উকিল দিব না। চেষ্টা করব না।'

সুবু বলল, 'করেছ, করেছ। হ্যাঁ—প্রোভোকেশন যতই থাক, মার্ডার কেস যখন—'

শ্রীলা তীক্ষ্মস্বরে বলল, 'তবু 'প্রভোকেশন' যা বললি। হ্যাঁ, সুকু মেরেই ফেলে তাকে—কিন্তু কেস লড়তে গিয়ে বাবা কোন অন্যায়টা করেছে ?'

'যা বলি নি, তা বলিস না খুকি।'অন্যায়' বলেছি ?'

'না, ঘটনা বলেছিস। ঘটনাটা আমাদের সবার জানা। আর, বাবা তোকেও পড়িয়েছে। আমাকেও বিয়ে দিয়েছে। আর কি করবে বাবা ?'

মা বললেন, 'খুকি। চুপ কর।'

সুকু চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিল। দিদি আজকে প্রায় আগেকার দিদির মতো বিনা সাজে এসেছে দেখেই ভাল লেগেছিল। দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও অন্য রকম বলছে। বাবা ভুলতে পারেননি। 'তোমার ফ্ল্যাট হয়েছে—খুকির নিজের বাড়ি—আমার কাছে এ বাড়িটা বড় প্রিয়—বড় দামি। দিদির শেষ সম্বল এ বাড়িতেই লাগাই।'

'থাক গে বাবা। কি বলবে বল।'

'সেই প্রসঙ্গে—সুকুর কথা—উকিলের কথা—আমার অবর্তমানে এ বাড়ি চার ভাগ হয়। তোমাদের মায়ের—আর তোমাদের তিনোজনের।'

'ধরলাম, তাই। কি ভাবছ সুকুর জন্যে ?'

সুকু বা অন্য কেউ যেন ঘরে নেই। আছে শুধু বাবা আর দাদা।

'আমি বর্তমানেও ধরলাম চার ভাগ।'

'হ্যাঁ বাবা—বুঝেছি সেটা—'

'এই বাড়ি পার্টিশান তো অসম্ভবই। তুমি···সুবু নিচটা অফিস করেছ···কিন্তু ভাড়া তো দেও না—বড় দুঃখে বললাম—এসব কথা বলতে আমার···বুক ফেটে যাচ্ছে।

'ইলেকট্রিক বিল দিই—মেনকা, জমাদার আর ঠিকে ঝি'র মাইনে দিই বাবা।'

শ্রীলা ঈষৎ হেসে বলল, 'দাদা তুইও জানিস, অমন দুটো ঘরের জন্যে বাবা সেলামিও পেত, ভাড়া হাজার টাকাও পেত। থাক গে।'

'আমি বাবাকে ঠকিয়ে চলেছি?'

সুকু হঠাৎ বলল, 'তোমরা বড্ড বকছ সকলে। বাবা কি বলতে চায়, বলতে দাও। এত কথা শুনলে আমার—'

ঘর নিঃশব্দ, শ্বাসরুদ্ধ।

সুকু চোখ বুজে বলল, 'বলো বাবা।'

'আমার প্রস্তাব এটা···সুকু আর আমাদের অংশটা তোমরা কিনে নাও।'

'তারপর।'

'সুবু! এইখানে সুকুর থাকা নিরাপদ নয়। না ওর পক্ষে, না আমাদের।'

'তা সত্যি।'

'কিনে নাও···টাকা দাও···আশ্রমে টাকা দিলে ওরা আমাদের দিদিরে যত্নে রাখবে—আমাদের কিছু টাকা রাখতাম—আর সুকুর ভাগ তারে দিতাম,—সে কিছু একটা করত—এখানে না—অন্য কোথাও—'

'ধরো তা করা গেল। কিন্তু এ বাড়ির আধা দামও কোন না দশ লাখ হবে—'

'আধা নয় দাদা—তিন ভাগ—আমি কোনও অংশ নেব না। ওটা সুকুর থাকল—'

'তুই কি পাগল, খুকি?'

'কেন রে দাদা? জীবনে একটা কাজ করছি সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা করে—পাগল বলে দিলি?'

'বিজিতকে একবার—'

'এটা তো বিজিতের কোন ব্যাপার নয়? তার টাকা-পয়সা, বাপ-মা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমি তো কিছু বলিনি।'

'সে রাগ করতেই পারে দিদি।'

'সে আমি বুঝব সুকু—আর বিজিত কোন কোন ব্যাপারে একগুঁয়ে হলেও—মনটা ওর বোধহয় সংকীর্ণ নয়।'

সুবু বলল, 'আমি পনের লাখ দিয়ে তিনটে অংশ কিনব? তোমরা কি

ভেবেছ আমি ওই টাকা বের করতে পারি—'

শ্রীলা বলল, 'যতটা পারিস ওদের দে। বিজিত বলে, টাকা পয়সার কথা লেখাপড়াই হওয়া ভাল। আর, তখন বাড়ি রাখবি বা কেন ? হাইরাজই করবি এ বাড়ি ভেঙে। তাতে ইনভেস্ট করার লোক পেয়েই যাবি।'

সুকু দেখতে পাচ্ছে বাবার মুখ কি পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা বাবা বড় কষ্টে করেছিল। বাবার প্রাণ এই খাপছাড়া বাড়িটা, যার চেহারাটাই ক্ষমা-প্রার্থী। অনেক ঝকঝকে বাড়ির মধ্যে অত্যন্ত বেমানান একটা বাড়ি।

নিশ্বাস ফেলে বাবা বলে, 'তাই হোক।'

সুবু বলল, 'বাড়ির ব্যবস্থা একটা করতেই হতো। ফ্ল্যাটের কথা আমি বলতাম—জেনেই ফেলেছ যখন—সত্যিই—'

মা বলল, 'চলে তো যেতিসই সুবু।'

সুকু বলল, 'আমার বলা হয়তো সাজে না। কিন্তু বাবা। তুমি আমাদের কথা ভেবে এ বাড়ি করেছিলে—দাদা তার স্ত্রী, মেয়েদের নিয়ে একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে যখন, সেখানে চলে যাক না। তোমরা দেখে খুশি হও, দাদা ভাল থাকুক—দাদা যদি স্বার্থপর হতো, অনেক আগেই চলে যেতে পারত, তাই না ?'

সুবু বলল, 'থাক সুকু।'

'যা মনে করি, তা বলব না কেন ? তোর ফ্ল্যাটে···নয় বাবা-মাকে দেখিয়ে নিয়ে আয়।'

শ্রীলা আবার বলল, 'বিজিতও বলে—এ বাড়ি ভাঙলে চমৎকার ফ্ল্যাট বাড়ি হতে পারে।'

সুকু বলল, 'আমিই সব চেয়ে লাভবান হচ্ছি, তাই না ?'

সুবু বলল, 'দাঁড়াচ্ছে তাই।'

শ্রীলা হেসে বলল, 'নতুন বাড়ি করলে টাকা উঠে আসবে।'

'ভাবি—এত ক্যাশ টাকা তো—'

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'সবই বললাম। উইলে নানা ঝামেলা। তার চেয়ে জানা দরকার, এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত কি না।'

সুবু বলল, 'আইডিয়া সেনসিবল। ভাবা যেতে পারে। এ তো প্রোমোটার-ডেভলপাররা বুঝবে।'

মা ক্ষীণ গলায় বলল, 'ভাবতে বেশি সময় নিস না বাবা। আমার দেহ এ রকম—ও'রও বয়স হচ্ছে—সুকুকেও একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হয়।'

বাবা বললেন, 'বিশ্বাস কি দোলনদের। সুকুর উপর আক্রোশে যদি কিছু করে বসে ?'

সুকু বলল, 'আমি রাজি। খুকিকে অবশ্য আরেকবার ভাবতে বলব।'

শ্রীলা বলল, 'বিয়ের সময়ে শর্ত তো ওর একটা, আমার একটা। আমি বলেছিলাম, বাবা কোন টাকা খরচ করতে পারবে না। ও বলল, সুকুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। আমার শর্ত আমি মেনে চলেছি। এখন বাবার বাড়ি বেচে ভাগের টাকা আমি নিতে পারব না। সুকু তোর তো অনেক হবে। টাকা দিয়ে করবি কি?'

'আরেকটা টি ভি সংসার বানাব।'

তারপর সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলল, 'আমার কথা কেউ জানতে চেও না। এটা তো পরিষ্কার, যে আমাকে নিয়ে বসবাস করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে আমার কোন অভিযোগ নেই, একটুও না। আমারই কি ভাল লাগে, বউদি ভয় পায়? দাদাও শঙ্কিত, কখন সেই ক্ষ্যাপা রাগ পেয়ে বসে আমাকে—বাচ্চারা যখনি তাকায়, ওদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়—কথা তো হল? আমি একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবি ভর দুপুরে?'

'ভিক্টোরিয়া, ময়দান, চৌরঙ্গী, গঙ্গার ধার কিছু দেখি না কতকাল। নন্দন দেখিনি, রবীন্দ্রসদন দেখিনি, সল্টলেক স্টেডিয়াম, ঢাকুরিয়া লেক, কিছু দেখিনি।

'ট্রাম-বাস-গাড়ি-ঘোড়া পথঘাট যা হয়েছে...'

'মা আর পিসিমাকে দক্ষিণেশ্বর দেখাব কথা দিয়েছি।'

সুবু বলল, 'পরে গাড়ি কিনতে পারবি।'

'খুবই সম্ভব...বলা যায় না...'

শ্রীলা বলল, 'আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিস।'

বাবা বললেন, 'তবে উকিল ধরা সুবু। লেখাপড়া থাক একটা।'

'দেখব, দেখব।'

'দিদিকে বলা হল না কিছু।'

'আমি বুঝিয়ে দেব পিসিকে।'

সুবু বলল, 'দোলন তো দেখে যাচ্ছিল। কিছু বলেনি। সেদিন বলল, শান্তবাবু সুকুকে দলে টানছে। সুকুর ওই সব লোকজন থেকে দূরে থাকাই উচিত।'

'আগে বললি না দাদা? পরশু তো শান্তকাকার বাড়িতে নন্দরা আসছে, আমরা দুপুরে খাব।'

'তাই? বেশ। বাবা! আমি ঝটপট ব্যবস্থা করে ফেলছি। আমাদের সকলেরই পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া নিরাপদ।'

শ্রীলা বলল, হ্যাঁ। সুকু একটা ক্ষ্যাপা কুকুর মেরেছিল বলে।'

'খুকি!'

'এটাই তো অবাক কাণ্ড। ওই লোকটার জন্যে আমাদের মুখে চুনকালি লেপে যেতে পারত। সেটা আমরা কেউ মনে করি না। সুকুই সবচেয়ে লজ্জা আর ভয়েরও কারণ হল।'

সুকু বলল, 'যাবি দিদি?'

চল। তোমরা কাগজপত্র তৈরি করে ডেকো। আমি সই করে দিয়ে যাব।'

মা র চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সুবু বলল, 'মা, কাঁদছ কেন? তুমি তো এই চেয়েছিলে মা।'

'আমি আর কতদিন। সকলে ভাল থাকলেই—'

বাবা বললেন, শান্ত হও, শান্ত হও। তোমার ছেলেমেয়েরা—বুঝদার—সবই বুঝে—'

সুবু বলল, 'সময় লাগবে বাবা…এক বড় কাজ…'

শ্রীলা বলল, 'কেন ডেভেলপার নিয়ে নিলে ঠিক করে ফেলবে কোন ম্যাজিক …চল্ সুকু।'

আবির বেরিয়ে এল। শ্রীলা বলল, 'চল একটু হাঁটি।'

'বাড়িতে বলে বেরিয়েছিস?'

'হ্যাঁ…জানে!'

'বিজিতদা খুশি হবে না। তুই বা বোকার মতো ত্যাগ দেখাতে গেলি কেন?'

'আমি আর বুদ্ধিমান ছিলাম কবে।'

'দাদা… রেগে গেছে!'

'উচিত নয়। কেননা বাড়িটা ভাঙা, ওঁদের কিছু টাকা দিয়ে দাও—আরেকটা বাড়ি তোল, অন্তত চারতলা…বউদি দীর্ঘকাল বলে আসছে। সে বাড়ির প্ল্যান কি হবে, তাও আলোচনা হয়।'

'কোথায়?'

শ্রীলা ঝরঝর করে হেসে বলল, 'আমার বাড়িতে? বিজিত তো দাদাকে খুব …জ্ঞানীগুণী মনে করে। বরাবরই।'

'নে, ট্যাক্সি ধর।'

'দুঃখ পাচ্ছে বাবা! আর বাড়িটা থাকবে না ভেবে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কাঁদবি না আশা করি।'

'টি ভি পরিবারের বউরা কখনো কাঁদে না। ট্যাক্সি ধর।'

ট্যাক্সিতে উঠেই শ্রীলা বলল, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চলুন।'

দিদি।'

'কথা বলিস না। এতগুলো বছর তো আমাকেই দিয়েছিস...একটা দিন

আমাকে দে !'

'অনেক ভাড়া নেবে কিন্তু।'

'নিক।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল. রেস কোর্স, ময়দান চক্কর মেরে রবীন্দ্রসদনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নন্দন, অ্যাকাডেমিতে ঢুকে আবার ঘুরে গিয়ে শিশির মঞ্চ। পেছনের দোকানে চা খাওয়া।

'তুই সিগারেট খাস না।'

'না, অভ্যাসটা করতে পারিনি।'

'তোর—টাকা লাগবে সুকু ?'

'একদম না। আমি তো যত টাকা নিয়ে বেরিয়েছি, সব পিসির কাছে আছে।'

'পিসি একই রকম রয়ে গেল।'

'অনেকেই তাই রইল দিদি। শান্তকাকা, তোবলে, নন্দ . '

'আমি কি খুব বদলে গেছি ?'

'প্রয়োজনে বদলাতে হয় তো।'

'বাবা···মা...পিসি···সকলের পক্ষেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া···'

'তা · ছোট ছেলের জন্যে এ কষ্ট স্বীকার করতে না পারলেও তো মা কাউকে শাস্তি দিচ্ছে না। নিজেও জ্বলে মরছে।'

'তুই খুশি তো ?' ·

খু—ব খুব খুশি। এখন ওঠ্। এর পরে কি ভিড় বাড়বে না ?'

'হ্যাঁ···ভিড় বাড়বে ··

'তুই ভাল থাক দিদি...আমার জন্য একটুও ভাবিস না ?'

'ভাবি না তো।'

'গাদাগুচ্ছের টাকা খরচ করলি।'

'মেয়েদের স্কুলের ফ্যেটে এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়। দাদার মেয়েদের, আমার শ্বশুরবাড়ির বাচ্চাদের জন্মদিনে, পুজোর উপহার দিতে অনেক খরচ হয়।'

'যখনকার যা নিয়ম—যারা পারে তারা করে।'

'কিছু খাবি, সুকু ?'

'না রে! আমি কি এখনো সেই সুকু আছি, যে কাটলেট খাওয়াব বললে বিশ বালতি জল তুলে দেব ?'

'হ্যাঁ···আমার বাগান...'

'দিদি। দিনটাকে আর টানা যাবে না।'

'না। ফুরিয়ে গেল।'

ট্যাক্সিতে বসে শ্রীলা চুপ। সকুকে নামিয়ে দিল আগে। সকুর হাতটা খুব জোর দিয়ে চেপে ধরে ছেড়ে দিল।

বলল, 'সন্ধ্যার মুখে হেঁটে ফিরিস না।'

'ভাল থাকিস দিদি।'

'থাকব, থাকব, থাকব।'

সকু মনে মনে হাত নাড়ল। যে টি ভি পরিবারের বউ হতে চেষ্টা করছে, হয়তো পারছিলও, সকু এসে পড়ার ফলে তার মনেও ওলটপালট। সকু কি করবে?

তোবলের দোকান থেকে লজেন্‌স কিনবে একটা। টক টক, মিষ্টি মিষ্টি —যেমন লজেন্‌স ছোটবেলা চারটে করে 'সান্ত্বনা পুরস্কার' পেত। তাতেই ভেবুল মহা খুশি। হোক না লজেন্স—প্রাইজ তো!

প্রায় নিঃশব্দে একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল।

'তোবলে। একটা ইণ্ডিয়া কিং ভাই!' চেনা, ধাতব গলা।

সকু ঘুরে দাঁড়াল।

দোলনবাবু আর সকু পরস্পরকে দেখছে। দোলনবাবুর মুখ আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে। পাশের যুবকটিও কৌতূহলী।

'কে। আবির? ভাল তো?'

'খুবই ভাল।'

'বেশ বেশ...'

আবির লজেন্সটা গালে ফেলল। বলল, 'তোবলে, আরো দুটো দে।'

গাড়ি চলে গেল।

তোবলে বলল, 'ঘাবড়ে গেছে।'

'সঙ্গে ছেলেটা কে?'

'জামাই! ঘরজামাই এখন! এক ছেলের কি ছাতার রোগ ধরল...ঘাড় লটকে গেল...'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ...বেলভিউয়ে আর ছোট ছেলে তো টাকাকড়ি ঝেঁকে হাওয়া। মেয়েটারই এক পা খুঁতো ছিল, মনে নেই?'

'কি যেন নাম...পর্ণা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ...বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছে। বউটা খারাপ ছিল না রে—তখন কেস করতে নিষেধ করেছিল...ক্যানসারে ভুগে ভুগে...'

'মারা গেছে?'

'কবে। এর এখন তেমন দবদবা নেই। শক্তিদা তো সল্টলেকে উঠে গেছে। বাড়ির ভাগ নিয়ে মামলা চলছে...'

'এখন দারোগারই রবরবা।'

'দারোগা ?'

'মিলনের বউ। একেবারে দারোগা। তুই আসতে ওরা সব ঘাবড়ে গেছে।'

'ভাল। রোববার আসছিস তো ?'

'নিশ্চয়। না গেলে হয় ?'

মনটা ভাল হয়ে গেল আবিরের।

বাড়িতে পিসি বলল, 'এত দেরি করে ?'

'ললাম তো বেড়িয়ে ফিরব।'

'খুব ঘুইরা আইলি সুকু ?'

'অনে...ক।'

'যাউক! হকল বেবস্তাই অইল!'

'তোমাকে আর মাকে দক্ষিণেশ্বরটা ঘুরিয়ে আনি।

পিসি কুলকুল করে হেসে বলল, 'আশ্চর্য কথা বটে। সুবু কয় গাড়ি ঠিক করব, হেরাও যাইব।'

'দক্ষিণেশ্বর ?'

'হ রে হ! পূজা টুজা দিয়া দিন দেইখা নতুন বাড়িতে যাইব।'

'মা...খুশি তো ?'

'নিশ্চিন্ত অইছে। মহনেরই বুক পুরায়..কিন্তু আর তো উপায় নাই।'

রাতে পিসি বলল, 'সুকু এট্টা কথা আছিল।'

'তুমি দশটা কথা বললেও শুনব।'

পিসি শীর্ণ আঙুল সস্নেহে বোলাতে বোলাতে বলল, আছুম। কেমুন বা অইব। যে টাকা পাইবি, একখান ছোট বাড়ি বানাইয়া আমাগো লইয়া থাকতে পারিস না ?'

'খুব ভাল বলেছ পিসি। নিশ্চয় পারি।'

বউ কয়, অনে···ক টাকা। তা বাড়িও বানাইলি, আমরাও থাকলাম, তুইও থাকলি···বিয়াসাদি কইরা নিলে তরে দ্যাখনের মানুষও অইল।'

'হ্যাঁ পিসি। তবে দক্ষিণেশ্বরটা হল না ?'

'ক্যান ? তুইও যাবি। বউ তো পূজা মানসা কইরাই থুইছে তর লিগ্যা।'

'বাড়িটা কেমন হবে বল তো ?'

'এমুন বরোসরো তো অইব না। এই একতলাই ভাল। বুরা বয়সে আর সিরি ভাঙতে অয় না।'

'কটা ঘর হবে ?'

'ক্যান, আমাগো এট্টা···মহনদের এট্টা।'

'বাঃ, আমি বিয়ে করলে ?'

'তাও বটে। আবার ম্যানকা কয়, বউরে ছাইরা যাইব না।'

'তবে চারটে ঘর।'

'তাই ভাল। এহানে থাগলে তরা নিমতলায় নিতিস...যেখানেই যাই, শ্মশান তো থাকব।'

'যেখানে শ্মশান নেই, এমন জায়গায় যাব। তাহলে তুমি মরতেও পারবে না।'

'দুর বোকা! মরলেও আবার জন্ম আছে না ?'

নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এমুন পারা হইব না। কিন্তু উপায় বা কি আর।'

'না পিসি উপায় নেই কোন। আমি সকলকে নিরুপায় করে দিয়েছি।'

শান্তকাকার বাড়ি

সবচেয়ে আগে পৌঁছেও দেখলাম, আগেই শান্ত কাকা কাজ শুরু করেছেন।

'রান্না বান্না শুরু করে দিলেন ?'

'তুই একটা হোপলেস সুকু। এত দেরি করে ?'

মোটে তো নটা বাজে শান্ত কাকা। বাজার করে আনব ?'

'না, খাবি শুধু। এই দেখ।'

শান্তকাকার ভেতর বাড়ির বারান্দায় একজন হট্টাকট্টা চেহারার যুবক হাফপ্যান্ট পরে পেঁয়াজ কেটে যাচ্ছে। আমরা ঢুকতে ও মুখ তুলে একটু হাসল, আবার কাজে মন দিল।

শান্তকাকা বললেন, 'দিলীপ পাসোয়ান। আমাদের স্কুলে নতুন শিক্ষক।

'তাকে রান্নার কাজে লাগিয়েছেন ?'

'আরে ওর বাবার রিকশা চেপে তোর কাকিমা ঘুরত। দিলীপ ছোটবেলা থেকে...এখন তো ও আমার দেহরক্ষীও বটে।'

'তার মানে ?'

'দিলীপ বিয়ে করেছে, বাড়িতে থাকার জায়গা নেই। মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছিল বস্তি ছেড়ে। এখন এখানে থাকছে। বউ নিয়েও এখানে থাকবে। তাছাড়া বাড়িটা তো দেখলি...ক্যান্টিনে কাজ করে নাইট কলেজে পড়েছে। ওর নিজস্ব একটা রান্নার...যাকে বলে · '

'ক্ষমতা আছে।'

'দারুণ ক্ষমতা। ও থাকলে আমারও...এমনিতেই তো রাতে এ ঘরে মেঝেতে আরও দুটো ছেলে শোয়। আমার...দেহরক্ষী বলতে পারিস।'

'ইশ। এ কাজের জন্য দরখাস্ত করব ভাবছিলাম।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'যাঃ। মোহনবাবু বলল, তোদের বাড়ির খুব সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয়েছে। সুবুই সব···ও মাড়োয়াড়ি ঢুকিয়ে দেবে নির্ঘাত...'

'যা হয় করবে।'

'তোর যে একটা ব্যবস্থা হচ্ছে...'

'কি রাঁধছে বলুন তো?'

'দিলীপের ফর্মুলায় মাংসের রেজালা...সাদা ভাত...ডাল...মাছ ভাজা... চাটনি···'

'সে তো অনেক খরচ।'

'সবাই মিলে করা হচ্ছে।'

'অর্থাৎ চাঁদা তুলে।'

'অবশ্যই। এবং তুমি তাতে বাদ।'

'কেন? চাঁদা দেবার টাকা আমার জেলার্জিত। জেল তো বেরোবার সময়ে...'

'ইডিয়ট! তুই আজকের সম্মানিত অতিথি, আজকের হিরো।'

'পরশু দোলন গাড়ি থামিয়ে কথা বলল।'

'টেরর! ভয়ে কাঁপছে।'

'শুনলাম, ওর পরিবারে না কি...'

'বড় ছেলেটার এনকেফালাইটিস হল। আগে পাড়ায় নার্সিংহোমে ছিল... ডাক্তার বসু যখন বলল এ তার সাধ্য নয়, তখন বেলভিউ...আর ছোটছেলের ব্যাপার তো রহস্যময়। সে সম্ভবত কয়েক লাখ টাকা নিয়ে সরে পড়ে। এরা বলে বম্বেতে ছিল···বিদেশে গেছে···কিন্তু দোলন লালবাজারে অনেক দৌড়ত সেদিনও। খারাপ কিছু লোকের খপ্পরে পড়েছিল...আজ সাত বা আট বছর নিরুদ্দেশ। বউটাও দেখ, ক্যানসারে ভুগে ভুগে—বম্বেতে টাটা হাসপাতালে নিয়েছিল—ওখানেই।'

'সঙ্গে জামাই ছিল।'

'জামাই নয়, ঘর জামাই। এবং ওদের পেটেই যাবে সব।'

'তোবলে বলল, বাড়ি নিয়ে মামলা?'

'শক্তি সল্টলেকে বাড়ি হাঁকিয়েছে—সরকারি লোন বের করে বাদায় চিংড়ির

চাষ করছে—এখন যা হয়! সম্পত্তির মামলা হাইকোর্টে ঝুলছে।'

'মিলনের বউও আছে তাতে?'

'সেও আছে। তার অবস্থা সবচেয়ে শাঁসালো। বহু কাজকারবার—কাউন্সিলার আছেই—মন্ত্রী টন্ত্রী হাতে রাখে—যে লোকটা ওর সেক্রেটারি, সে তো একটা ডন বললে হয়। ওদের সম্পর্ক নিয়েও নানা কথা—'

'পরিবারটা জলে গেল।'

'এর চেয়ে ভাল কি হত? তুই আমি অনেক ভাল আছি। যেমন, আজকে মাংস খাচ্ছি।'

নন্দ আমাকে বকতে বকতেই ঢুকল। 'সুকু খাবে বলে চাঁদা দাও, রাবড়ি আনা, এ কি ইয়ার্কি সুকু?'

'তোকে আনতে বলেছি?'

'না, কিন্তু তুমি তো ফুলনদেবীকে বিয়ে করনি। দীপলেখা একটি ফুলন-দেবী। সেই আমাকে উত্যক্ত করে করে—আমিও সেন্টু-মেন্টু হয়ে গেলাম। নিন শান্তকাকা। দই বাঁশি আনবে।'

'তোরা করেছিস কী?'

'কী করব বল? স্ত্রী লজিক পড়ান, আমি কলেজে কেরানি। দুজনেই বিপ্লবের কথা বলি, এবং ভেতরে ভেতরে বিশাল সেন্টু-মেন্টু। হিরোর জন্যে যা করা যাবে, কোনটাই যথেষ্ট নয়। পরের ফিস্টটা আমার বাড়ি।'

বাঁশি দইয়ের ভাঁড় হাতে ঢুকল। বলল, 'আমার বাড়ি! আমার নাম 'বি' দিয়ে, তোর নাম 'এন' দিয়ে।' তারপর বলল, 'কেন মানে হয়? খুনের দায়ে জেল খেটে বেরোল হতভাগা! তার জন্যে গাঙ্গুরামের দই আনতে হবে?'

'তোদের চিঠিগুলো আমি রেখে দিয়েছি সব।'

'রাখা উচিত। নিজে যা লিখতিস, সে তো কহতব্য নয়। বানান ভুল, যা তা। বাংলায় তুই চিরকাল—'

নন্দ বলল, 'সুকুর সাহস ছিল। 'তোমার দেখা মনে রাখার মত মানুষ' বলতে 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ' লিখেছিল। অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্র-নাথ' তথ্যচিত্রের কথা!'

'তাই তো!'

'স্কুলের এ সব কথা জেলে বসে মনে করতাম, আর মুখ লুকিয়ে কাঁদতাম অনেক, অনেক দিন কেঁদেছি। তারপর শামুদারা যখন বহরমপুর জেল থেকে বদলি হয়ে এল—'

'তোবুলে কি আনছে তবে?'

'সকলকে ইন্ডিয়া কিং দেবে। আমরা শান্তকাকার সামনে খাব না।

কিন্তু পকেটে পুরব। তারপর বল্ সুকু, কেমন আছিস?'

'খুব ভাল।'

'তোর এত বছর লেগে গেল কেন?'

'চৌদ্দ বছরেই বেরোবার কথা। কিন্তু পুলকদা'র।—আমিও—বন্দিদের ওপর দুর্ব্যবহার নিয়ে একটা ওয়ার্ডারকে—'

'পিটিয়েছিলি?'

'আমি মারিনি। তবে অনশন, ধর্মঘট ইত্যাদি করেছিলাম—এগুলো তো আদর্শ আচরণ নয়। আর জেলে থেকে সুপারিশ না করলে—সে জন্যেই—আমি মারিনি। মারতে আমি ভয় পাই। আমার ডানহাতটাকে এখনো ভয় পাই।'

'সে সময়ে তোদের বাড়ি বার বার গেছি। তারপর দেখলাম, আমাদের দেখলে মেসোমশাই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন—'

তোবলে ঢুকল, কাঁধে একটা ব্যাগ। বলল, 'সিগারেট খাওয়া কত খারাপ, বাতদিন শুনছিস, দেখছিস—তবু খাওয়া চাই। নে—সুকুকে দেখ তো?'

'ছি ছি, সুকু!'

শান্তকাকা বললেন, 'ছি ছি কিসে?'

নন্দ, বাঁশি আর তোবলে শুরু করল।

'সুকু সিগারেট খায় না। ভাবা যায়?'

'শোনা যাবে চা-ও খায় না।'

'সিগারেট খায় না সেটা ভাল। বিড়ি তো খেতে পারিস।'

আমি হাত তুললাম, 'বন্ধুগণ! সিগারেটের নেশা ধরার মুখে মুখেই আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি—ত্রুটি মার্জনীয়।'

নন্দ চোখ বুজে হাত তুলে বলল, 'মার্জনা করলাম। কিন্তু শান্তকাকা ভাত খাব বলে কি চা খাব না?'

দিলীপ হেঁকে বলল, 'চা নিয়ে যান।'

'যা যা তোবলে! বসে থাকিস না। দোকানদারি করে তোর বেজায় বসে থাকা অভ্যেস হয়েছে।'

তোবলেকে যেতে হল না। দিলীপ নিজেই হাজির। মাটির গেলাসে চা, গরম পকোড়া। বলল, 'আর চা হবে না। আর যেতে হলে দোকানে যাবেন।'

আমার আনন্দে কান্না পাচ্ছিল।

'নন্দ বলল, 'সুকু! দিদি কেমন আছে রে? অনেক দিন দেখিনি।'

'ভালই আছে।'

'সে সময়ে—দিদি যখন থেকে বেরোতে শুরু করে—আমরা সবসময়ে গার্ড দিয়েছি।'

'ভাল করেছিস। দিদি তো ভিতু।

শান্তকাকা বললেন, 'সে সময়ে যে উলটোপালটা কথা বলেছে, সেই এদের হাতে ঘুষি খেয়েছে।'

নন্দ বলল, 'দাদার কি দুঃখ! বলে মিলনকে মারব তো আমি। সুকুটা মেরে বসল?'

খুব, খুব সহজ লাগছে আমার। বাড়িতে এসেও যেন ফিরে আসিনি। প্রত্যেকের মধ্যে এতরকম টেনশান···মনে হয় এটা ফিরে আসা নয়, চলে যাওয়া। কিন্তু এদের তো দেখার চোখটা অন্যরকম।

'পুলকদা বলেছিল—'

'পুলক ধর?'

'চিনিস নন্দ?'

'নাম শুনেছি। কি বলেছিল?'

'যারা সামাজিক ইস্যু হিসেবে তোর কাজটাকে দেখবে, তাদের কাছে গেলে শান্তি পাবি। বাড়ির লোকরা তো অন্যভাবে দেখবে...'

'হ্যাঁ···পুলক ধর তা বলতে পারে।'

'ও চলে গেছে জানিস?'

'কোথায় গেল?'

'অনেক দূরে। থাকত তো মাসির কাছে। সেখান থেকেও...'

'ওরা একটা গ্রুপ...একটা সমাজবিরোধী পুলিশের খোঁচরকে মানে ইনফর্মারকে খুন করে...'

'শুনেছিলাম।'

'তুইও তাই করেছিস।'

'আমি মনে করি...সকলের পক্ষে বিপজ্জনক একটা হিংস্র খ্যাপা কুত্তাকে মেরেছিলাম...দরকার পড়লে আবার মারব।'

'ঠিক আছে। তবে এখন সুকু...সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোকরা বুলেটপ্রুফ নিরাপত্তা নিয়ে ঘোরে। সিস্টেমই তাদের রক্ষা করে।'

'আন্দাজ করছি কিছু কিছু।'

নন্দ ভীষণ উদ্বেগে বলল, 'বুদ্ধির প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভীষণ দরকার এখন।'

'অ্যাকশান নয়?'

শান্তকাকা বললেন, 'অ্যাকশানও যে যা পারে। সুকুর পিসি মাথা তুলে চলাফেলা করেন—পুজামণ্ডপ, হরিসভা, দোকান বাজার, কোথায় যান না সে সময় থেকেই?'

সানন্দে বাঁশি বলল, 'দ্যাট ইজ অ্যাকশান!'

'আমি যদি পিসিকে বলি...পিসি বলবে, দূরে ছেমরা, মস্করা করস?'

শান্তকাকা বললেন, 'আসল কাজটা কি ভুলে যাচ্ছ না তোমরা ?'

'একদম না।'

'কি কাজ শান্তকাকা ?'

'সুকু। একদম চুপ।'

আমাকে ওরা বসিয়ে দিল চেয়ারে। তারপর সবাই মিলে, থ্রি চিয়ার্স' ফর সুকু। সুকু ! যুগ যুগ জীও ! হিপ্ হিপ্ হুররে !' বলে এমন চেঁচাল না !

আর আমি ?

আমি কেঁদেই ফেললাম।

তোবলে বলল, 'যা বাবা ! কান্নার কি আছে ?'

'আজকের দিনটা...'

নন্দ বলল, 'এ রকম দিন আরও অনেক আসবে।'

শান্তকাকা বললেন, 'এখানেই আসবে তোমরা। দেখ। আমাদের বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আছে, একটা সংগঠন এখানে বিধিমুক্ত শিক্ষার কেন্দ্রও করতে চায়, আর খেলাধুলো তো আছেই। তোমাদের কিছু সাহায্য পেলে তো ভালই।'

'আপনি বলবেন, আমরা আছি।'

'তোমরা শোননি বোধহয়...সুকুরা কিছুকাল বাদে চলে যাচ্ছে।'

'সে কি শান্তকাকা !'

'ওর দাদা ফ্ল্যাট কিনেছে...চলে যাবে...এখন...ওর বাবার তো এমন পুঁজি নেই যে সুকুকে কিছু করে দেন। আর চাকরির আশা দুরাশা। খোলাখুলিই বলি, সুকু কিছু করবে না। তার কাছে কিছু আশা...এখন সে যদি নিজ অংশ বাদে বাকিটা কিনে নেয়, তাহলে ওর বাবা, মা, পিসিমা কোনও আশ্রমে যাবেন। সুকু কিছু একটা করবে স্বচেষ্টায়। দোকানপাতি...কোন ব্যবসা...'

নন্দ বলল, 'প্রেস কিনিয়ে দেব ছোটখাট—জব কাজ করেও দিব্যি চলে যাবে।'

বাঁশি বলল, 'আশ্রম আবার কি ? বাড়ি ভাড়া করে দেব, সবাই থাকবি।'

তোবলে বলল, 'দোকান-টোকান দিস না।'

তিনজনই বলল, 'আমরা আছি—হয়ে যাবে।'

শান্তকাকা বললেন, 'যেখানেই থাক—সেটা তো দূর হবে না আমাদের কাছ থেকে।'

'না শান্তকাকা, কোনদিন না। কিন্তু তোমাদের ফ্যামিলি—মানে—কারো সঙ্গেই তো—'

বাঁশি বলল, 'একেকদিন একেকবাড়ি ফিস্ট, আর গ্র্যান্ড রি-ইউনিয়ান।'

'আর না, এবার খাওয়া যাক। দিলীপের বিয়েও তো একটা অকেশান হবে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

ডাল মুখে দিয়েই তোবলে বলল, 'মাস্টারি ছাড় দিলীপ, হোটেল দে।'

দিলীপ সহাস্য মুখে বলল, 'রোববার দেখে যে যার বাড়িতে খাওয়াবেন, রেঁধে দিয়ে আসব।'

বাঁশি বলল, 'দেখিয়ে দে সুকু, খাওরা কাকে বলে!'

'যাঃ, এখন ওরকম খাই না।'

'কিন্তু ওরকম আনন্দের ফিস্ট, ভাবা যায় না। দিলীপ সত্যিই অসাধারণ রাঁধে।'

শান্তকাকা বললেন, সুকু কি লজ্জা পাচ্ছিস?'

'অর্ধেক মাংস একা খেলাম শান্তকাকা।'

'তোদের কাকিমার মৃত্যুর পর, এ বাড়িতে এত আনন্দ আগে হয়নি।'

মহানন্দে একটা চমৎকার দিন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল।

সবাই চলে গেলে শান্তকাকাকে জিগ্যেস করলাম, 'খুব ভোরে ওঠেন?'

'পাঁচটায়! চিরকাল।'

'খুব আনন্দ হল শান্তকাকা।'

'সকলেই খুশি আজ।'

ফিরে আসা

পিসি, বাবা, মা—এ চিঠিটা তোমাদের সকলের। দাদা আর দিদিও। খুব ঠাণ্ডা মাথায় লিখছি চিঠিটা—একটুও মাথা গরম না করে। তোমরা দেখেছ, আমি মাথা গরম করি না। সকল অবস্থায় শান্ত থাকি। হঠাৎ মাথায় আগুন জ্বলেছিল একদিনই। অনেক, অনেক চেষ্টায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি। জেলজীবনে এটাই আমার মস্ত বড় প্রাপ্তি।

দেখ, যেদিন বাড়ি ভাগাভাগির কথা হল, সেদিন আমি আর দিদি অনেকক্ষণ একসঙ্গে বেড়াই। আমার কাছে সেটা খুবই আনন্দের দিন ছিল। দিদিকে তোমরা এখন ঘন ঘন কাছে ডেকো। ও আসতেও পারবে, থাকতেও পারবে। আমিই তো চলে যাচ্ছি।

দাদা কবে চলে যাবে জানি না, কিন্তু এরপর দাদা যেন আসা-যাওয়া রাখে।

তোমাদের দায়িত্ব তার ওপরেই রইল। দেখো, বউদিও আসবে, মেয়েরাও আসবে—আমি না থাকলে তোমাদের জীবন খুব সহজ হয়ে যাবে। বহু বছর ধরে আমি ফিরব...আমি ফিরব—এ ব্যাপারটা তোমাদের সকলের মধ্যে নানা জট সৃষ্টি করেছিল।

একা পিসি এর বাইরে। পারলে পিসিকেও নিয়ে চলে যেতাম।

কাল শান্তকাকার বাড়িতে নন্দ, বাঁশি, তোবলে এসেছিল। খুব, খুব আনন্দে কেটেছে দিনটা। শান্তকাকাকে এ চিঠিটা দেখাতেই পার। উনি আমার মতো অনেকেরই আপন জন।

আমি চলে যাচ্ছি কেন, যখন সব কথাই পাকা হয়ে গেল, এ কথা তোমাদের সকলের মনে হবে। জানি না বুঝিয়ে লিখতে পারব কি না। মনে হয় পারব।

একটা কথা আগেই বলে নিই—এটা আমি দিদিকে আর শান্তকাকাদের বলেছি, মিলনদা-কে অনিচ্ছাতে হলেও মেরে ফেলেছি। সে জন্যে শাস্তিও ভোগ করলাম। কিন্তু এজন্য আমার কোনও অনুতাপ নেই। বেঁচে থাকলে সে অনেকের সর্বনাশ করত, সন্ত্রাস ছড়াত। দিদিকে সে কত বছর দেখেছে তাকেই ধর্ষণ করতে এসেছিল।

একবার কুকুর ক্ষেপলে রাস্তায় সেটাকে পিটিয়ে আগে কোমর ভেঙে দিই, পরে মেরেছিলাম মনে আছে? যে কুকুর ক্ষ্যাপা ও হিংস্র, যে সকলের পক্ষে বিপজ্জনক, তেমন একটা কুকুরকেই মেরেছিলাম। আমার কোনও অনুতাপ নেই।

ওকে না মারলে কি হতো? ওর জন্য দিদির জীবনটা নষ্ট হতো। সেদিন ওকে মেরে ফেলব তা ভাবিনি, কয়েক সেকেন্ড আমি আমাতে ছিলাম না। তবু বলব ঠিকই করেছি। ওটা দিদি না হয়ে অন্য মেয়ে হলেও এক কাজই করতাম হয়তো।

এটা আগেভাগেই বলে নিলাম। পরের কথাটা বলি—বাড়ি ফিরে আসব—তোমাদের কাছে আসব—এ কথা মনে মনে কত লক্ষ বার জপ করেছি, বলার কথা নয়।

আর ফিরে আসার পর? দেখি তোমরা মনের শান্তিতে মন্ত্র নিয়ে বসে আছ। দাদা-বউদি কণ্টকিত—দিদির কাছে এ বাড়ি নিষিদ্ধ। সবের মূলেই আমি। বাড়ির ছেলে বাড়িতেই ফিরবে, কিন্তু তাকে নিয়ে কী করে চলা যাবে। মা, আমার চিন্তায় পাগল পাগল হয়ে অসুখই বাধাল।

দাদা বা এক বাড়িতে থেকেও এতটা পর হয়ে গেল কেন? কারণ তো আমি। সুকু ফিরবে, সে একটা খুনী—বউদি নিশ্চয় বিয়ের আগেই বলেছিল, ওই ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। দাদা মন থেকেই 'হ্যাঁ' বলেছিল। আমি

কারও দোষ দেখি না। আমার কারণে দিদির বিয়ে দেয়া কঠিন হয়নি সে সময়ে? বিজিতদা বিয়ে না করলে দিদির কি হতো? সেও তো অনেক বার শুনেছে, 'তোর কারণেই সুকু এ কাজ করল।'

আবার তোমাদের এ ভয়ও আছে সকলের, যে আমি ফিরে এসেছি বলে দোলনবাবুরা বা কাউন্সিলর মহিলা কোনও বিপদ ঘটাবে আমাদের। সে জন্যই বাবা বাড়ি বেচে-বুচে চলে যাবার কথাটা তোলে।

আমি বুঝলাম, আমি ফিরেছি, কিন্তু পিসি ছাড়া কারও অন্তরে ঢুকতে পারিনি। একে ফিরে আসা বলে না। এই বাড়ি না থাকলে দাদার মনে লাগবে না। কিন্তু বাবার বুক ভেঙে যেত। টাকা-পয়সা দিয়ে আশ্রমে থাকব—এ তো নিরুপায়ের কথা। বাড়িটায় থাকতে পারলে মা, বাবা, পিসি তো বটেই—দিদি আর আমিও খুব খুশি হব। বাড়িটা আমাদের বড্ড ভালবাসার বাড়ি। আমি যতদূরেই থাকি, তোমরা এখানে আছ জানলে শান্তি পাব।

তোমরা নিজেদের কথা ভাবনি, আমার কথাই ভেবেছ জানি। কিন্তু তোমরা এ বয়সে, এতদিনের চেনাজানা জায়গা ছেড়ে চলে যাবে শুধু আমার কথা ভেবে, এতবড় নিষ্ঠুরতা আমি করতে পারি না। দিদি তার অংশ নেবে না বলল, 'সেও তো আমার কাছে তার ক্ষমা প্রার্থনা। আমি তো তা চাই না।

আমি খুব খোলা মনে বলছি, বাবার সত্তর, মায়ের পঁয়ষট্টি, পিসির চুয়াত্তর—এ বয়সে অন্যত্র গিয়ে অন্যের তদারকিতে বসবাস করতে হলে তোমরা পারবে না।

দাদারই এটা বুঝবার কথা যে সে তার ফ্ল্যাটে চলে গেলেও—তার অংশে মা, বাবা, পিসি থাকুক। বাকিটা দেখেশুনে ভাড়া দিলে বাবারা আরেকটা লোক রেখে ভাল থাকবে।

বাড়ির তিনভাগ আমার হাতে যাচ্ছিল, মনে মনে জানব এক ভাগ তো আছে। যদি দশ বছরে না ফিরি তখন বাবা যেমন বোঝে করবে।

একটা কথা বলব—বাড়ি ভাড়া দাও, যা করো—বাবা যেন শান্তকাকাকে বলে, বিজিতদাকে বলে, দাদাও যেন দেখে বাবা আজকের বাজারদরেই ভাড়া পায়, সেলামিও তো চলে এখন।

আমার মনে হয়নি, আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু চলে যাচ্ছি, তোমাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে, এতে যেন তোমাদের সকলকে কাছে পাচ্ছি—ফিরে আসার অনুভূতি হচ্ছে।

এখন 'সুকু' বলতে দাদা বা দিদিকে কোনও হিসেব করতে হবে না। মা'র মনে হবে না, সুকুকে দেখছে না সুবু। বাবার চোখে হতাশা থাকবে না।

একজন সুকু কেন একজন মিলনকে আকস্মিক মেরে ফেলে, সেটা সামাজিক প্রেক্ষিতে দেখতে হয়।

শান্তকাকারা যা পারে।

বাবা, মা, ভাই, বোন তা পারে না। কেমন করে পারবে? পিসি কেন পারে? সে সোজা বুঝের মানুষ। মেয়েছেলের সম্মানহানি করে যে, সে সেই ড্রাইভার হোক, বা মিলন—তারা পাতকী। এ অপরাধে মারলে দোষ নেই। এ বিশ্বাস তার আগেও ছিল, পরেও আছে।

তোমাদের পক্ষে আমি তো তোমাদের সুকু। পেটের ছেলে—মায়ের পেটের ভাই—রাখতে গেলে অনেক কিছু বিপর্যস্ত হয়—ফেলতে তো পার না।

তোমরা আমার থাকার সব ব্যবস্থা করেছ—আমি চলে যাচ্ছি। আর এটাও ভাববার কথা—লক্ষাধিক টাকা নিয়ে ব্যবসা করব, কি ব্যবসা করব? ব্যবসার আমি জানি কি? কিসের দোকান দিতাম। কোথায় দিতাম? লাইফার, যে রাজনীতি করেনি—সাধারণ খুনের কেস—তাকে শেষ অবধি কোন না কোন প্রভাবশালী দল বা মানুষ, সমাজবিরোধী কাজে নামাতে চায়। না নামলে সে বিপন্ন।

অনেক জায়গায় থানা অফিসার যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত, সেও এক জিনিসই চায়।

আমি বাড়ি থেকে বেরোইনি, কোনও সমস্যায় পড়িনি ঠিকই—বার বার মনে হচ্ছে পিসি বলে 'ঠিকোই') কিন্তু ভবিষ্যৎ? তা তো জানি না।

পুলকদা সবসময়ে বলত, 'বাস্তববুদ্ধি হারাবি না সুকু। এক পা অতীতে, আরেক পা ভবিষ্যতে রেখে চলা যায় না। বর্তমানকালটাই গুরুত্বপূর্ণ'। পুলকদা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

আমার জন্য ভেব না। জেল থেকে যা এনেছিলাম, সে দু'হাজার দু'শো চল্লিশ টাকা পিসির কাছে ছিল—এর একটা পয়সাকে এক টাকা জ্ঞানে খরচ করব। এর চেয়ে কম পুঁজি নিয়েও আজকের দিনেও মানুষ পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে।

আমি কোথাও স্থিত হতে পারলে চিঠি দেব। আমি আমার স্বার্থেই এ কাজ করছি—যে ব্যবস্থা করেছিলে, আমি পেরে উঠতাম না। শান্তকাকাকে বুঝিয়ে বলো। তাঁকেও কখনো লিখব।

আজ, চলে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে ফিরে এসেছি। কেন এ কথা লিখলাম—একটু বুঝে দেখো। তোমাদের সকলকে আমি খুব ভালবাসি। তবু ভালবাসলে চলে যেতে হয় কখনো কখনো। তাই যাচ্ছি। তোমাদের সকলের সুকু।

———